নিকুন্তিলা

নাসরীন জাহান

নিকুম্ভিলা

নাসরীন জাহান

অন্যপ্রকাশ

দ্বিতীয় প্রকাশ | মার্চ ২০০১
প্রথম প্রকাশ | একুশের বইমেলা ২০০১

© | অর্চি অতন্দ্রিলা

প্রচ্ছদ | মাসুম রহমান

কম্পিউটার গ্রাফিক্স | লিটিল এম

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৬৬৪২৬০, ৯৬৬৪৬৮০
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৬৬৪৬৮১

কম্পিউটার কম্পোজ | পজিট্রন কম্পিউটার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

ই-বুক | রাশেদ

Nikuntila | By Nasrin Jahan
Published by Mazharul Islam, Anyaprokash
Cover Design Masum Rahman
Price : Tk 120 only
ISBN : 984-8160-141-0

উৎসর্গ

ফয়জুল লতিফ চৌধুরী

শৈশব থেকে আজ অব্দি যিনি আমাকে,
আমার চাইতে সহস্রগুণ বড়ো আবিষ্কার করে করে
প্রতিনিয়ত আমার লেখক সত্তাকে সামনে এগুনোর স্বপ্ন দেখাচ্ছেন।

যে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে...

নিকুন্তিলা যেদিন প্রথম স্কুলে যাবার জন্য কিছুতেই কেড্‌সের ফোসকা গেরো লাগাতে না পারার যন্ত্রণায় ঘামছে, তখন মা ঘুমিয়ে। অন্তত প্রথম দিন তাকে মা স্কুলে নিয়ে যাক, এই নিকুন্তিলার ইচ্ছে। কিন্তু ওই রকম শিশু-ভোরে মাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা এ-ও সে কল্পনা করতে পারছে না। কী যে এক জোড়া কেড্‌স কিনে দিল বাবা, যার মধ্যে অত দুটো ক্ষুদে পা ঢোকাতে গিয়ে সে হিমশিম খাচ্ছে।

মা হলে অত বোকামি করত না, অন্তত এক বছর স্বাচ্ছন্দ্যে জুতো পরে মেয়েটা হাঁটতে পারে, তার জন্য নিশ্চিত এক সাইজ বড় জুতো কিনত। সেই গুটি গুটি বয়স থেকে, অন্তত তার স্মৃতি স্মরণ করার সময় যখন শুরু, তখন থেকেই সে দেখে এসেছে, মা তাকে অন্তত দু'সাইজ বড় ফ্রক কিনে দিয়েছে। বাবা রীতিমতো রাগ করত, কোথায় মেয়েটা হাঁটুর ওপর কুঁচি ঝুলিয়ে পুতুল পুতুল হাঁটবে, পরিয়েছ একটা আলখাল্লা!

মা'র বয়কাট চুলের মাঝখানে আদুরে শাদা মুখ... মা তার তীক্ষ্ণ গভীর চোখের বিস্তার ঘটায়, বাবাকে যেন রোমান্টিক কোনো গল্প বলছে, এমন মুডে মা জাগতিক হিসেব দেয়— আশ্চর্য বুদ্ধি তোমার, এখন মেয়েটার প্রতি মিনিটে লম্বা হওয়ার বয়স, একটা জামা তিন মাস পরবে না ? আমাদের নিজের কেনা জামা, আত্মীয়স্বজনের গিফটে ওর আলমিরাটার নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় আছে ?

সেই মা-ই, শপিংয়ে গেলে দোকানির কাছে পাওয়া খুচরো নোট না নিয়েই তড়িঘড়ি হাঁটতে থাকে। নিকুন্তিলা প্রায়ই এটা দেখেছে, দোকানি পেছনে ডাকছে, আরে! বাকি টাকা না নিয়েই যাচ্ছেন যে! কেষ্টদা বাজার নিয়ে এসে হাজার হিসেব দিতে চাইলেও মার অত ধৈর্য নেই, কত টাকায় কোন মাছ কেনা হলো তার ফিরিস্তি শোনার।

ঘাই দিয়ে দিয়ে সময় বাড়ছে। নিকুন্তিলার করতর্জনীর ভাঁজে ঘাম। শীতল বাতাসের সাথে ভোর শিশিরের তর্কযুদ্ধ। আর ফিনকি দিয়ে উঠতে থাকা সূর্য আলোর জয়োৎসব। কাঁপে ভোর, গুঁড়িয়ে যেতে থাকে চাকার সাথে নিঃশব্দ রাস্তার স্থিরতা। উড্ডয়নশীল শীত স্ফটিক রোদ্দুরের সাথে মিলেমিশে একাকার, ইথারে ইথারে কী যেন এক ভয় ভয় শব্দ। খালামণিটা

যে কেন এই সময়ে বাড়ি গেল তার বান্ধবীর ক'দিন ধরে খুব জ্বর। সেই কঠিন জ্বরের চাইতে আজ নিকুন্তিলার জীবনে প্রথম স্কুলে যাওয়া কম গুরুত্বপূর্ণ ?

বাবাতো এই নিয়ে রাতে মহাহুলোস্থুল! যেন নিকুন্তিলা প্রথম কোনো মেয়ে এই প্রথম স্কুলে যাচ্ছে। ভোরে কী আয়োজন করা যায়, কতটা নিখুঁত পরিপাটি করে নিকুন্তিলার বেণি সাজানো যায়, এ নিয়ে মায়ের সাথে সে-কী বিস্তর আলোচনা! সেই বাবা এক্কেবারে মোরগ ভোরে নিকুন্তিলার স্কুলে যাওয়ার সুবিধের জন্য নিজে স্কুটারে চেপে জরুরি কাজে বাইরে গেছে।

সারা রাত নিকুন্তিলা ঘুমায় নি। সেই এতটুকুন বয়স থেকে সে ওভারসেনসেটিভ। মা তার বন্ধুদের নিয়ে আড্ডায় যখন বুঁদ, নিকুন্তিলা নাকি একদিন কী এক অভিযোগ নিয়ে মা'র কাছে গেলে মা তাকে ছোট্ট একটা বকুনি দিয়ে ফের আড্ডায় ডুব দিয়েছিল। তখন নিকুন্তিলার বয়স দেড়। প্রায় বড় মানুষের মতো পষ্ট পষ্ট কথা বলে। যদিও নিকুন্তিলার ঠিক সেই স্মৃতিটা মনে নেই, মা পরে বলেছিল, ওমা, আমিতো কথা বলেই যাচ্ছি... বলেই যাচ্ছি— দুই ঘণ্টা পর তোর কথা মনে হলে সারা বাড়ি খুঁজে তোকে পাই না। সব শেষে কৃষ্ণচূড়া গাছের পাশের পেছন অন্ধকার বারান্দায় গিয়ে দেখি, নিঃশব্দ কান্নায় তোর মুখ ফুলে ঢোল হয়ে এক্কেবারে জাম্বুরার মতন হয়ে গেছে। আমি তোর মুখে চোখ নাক কিচ্ছু খুঁজে পাই না। শেষে তোকে বুকে নিয়ে বিছানায় শুতে যাব, দেখি রাজ্যির লাল পিঁপড়ে তোর পায়ে, ওরে আমার সোনারে, জাদুরে বলে পিঁপড়েগুলোকে কষে মেরে নিজের ওপর কী জেদ যে হচ্ছিল নিকু, আর তুইইবা একটু সরল হলি না কেন ? ভ্যাঁ করে কেঁদে দিতে পারলি না ?

শেষে আমার জাম্বুরা মুখের কী হলো ? নিকুন্তিলার এই প্রশ্নে মা বিমর্ষ— সেই ফুলো মুখ নিয়েই তুই ঘুমিয়ে পড়লি। আমি তোর ঘুমের মধ্যেও হেঁচকি দিয়ে দিয়ে ওঠা ফোঁপানি শুনছিলাম। রাতেও তোর ফুলো মুখ যায় না। আমার মনে হচ্ছিল, এ তোর বাড়াবাড়ি, কোনো কষে থাপ্পড় না, বড় কোনো বকা না, এ নিয়ে তোর এত কষ্ট পাওয়ার কী ছিল ? অবশ্য কষে একদিন চড় দিয়েছিলাম তোকে, তোর চার বছর বয়সে সেই একবার, যেদিন... মা থেমে গেলে নিকুন্তিলাও থেমে যায়। এক বছর আগের ঘটনা। নিকুন্তিলার মনে আছে। মনে হয়েছিল কঠিন অপরাধ করেছে সে। তাকে মা'র আরো মারা উচিত ছিল।

স্খলিত কুয়াশা চেটে খায় ঘাসের ডগা। ছককাটা মুহূর্তগুলোতে বরফ। ধূম্রময় অথবা আধো উজ্জ্বল অথবা জরাগ্রস্ত, অথবা মুকুরিত আজ প্রভাতের সবকিছু। মৃত্তিকা মন্থন করে যেন শিশির নয়, বৃষ্টির ফণা ঢুকছে।

নতুন কেনা হাতঘড়িতে সাতটা দশ। আটটায় ক্লাস শুরু হবে। সারারাত নির্ঘুম নিকুন্তিলা শুনেছে, বাবা ভোরে মাকে ঠেলে গেছে, সময়মতো ওঠো। আজ ভোরটা অন্তত ঘুমিয়ে

কাটিও না। মা'র কী স্পষ্ট কণ্ঠ, যেন সে-ও সারারাত ঘুমোয় নি— এইরকম ঝরঝরে গলায় বাবাকে বলে, সেই চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। আমি দশ মিনিট পরই উঠছি।

বাবা ওর ঘরে আসছে টের পেয়েই নিকুন্তিলা মটকা মেরে পড়ে থাকে। বাবা ওর কপালে চুমু খেলে ফুড়ুৎ করে চোখ মেলে সে বলে, আজ যদি ঠিক ঠিক মতোন ক্লাস করে ফিরি, কী দেবে আমাকে ?

তুই ঘুমুস নি ?

ঘুমিয়েছি। তোমার শব্দ পেয়ে উঠলাম।

যা তুই চাইবি। বলে ওকে আদরে গলিয়ে বাবা দৌড়।

যা তুই চাইবি— এ যেন অনন্ত এক মহাকাশ নিকুন্তিলার সামনে মেলে দেওয়া। সে খুঁজে হাতড়ে অন্ধ হয়ে যায়। কী চাইবে ? তারচে' বাবা যদি বলত রঙ পেন্সিল কিনে দেব, তবে সে অনেক খুশি হতো। শূন্যের মধ্যে হাতড়ে বেড়ানোর ঝক্কি থেকে—। না, অনেক হয়েছে, বাবা চলে যেতেই নিকুন্তিলা মা'র ঘরে সন্তর্পণে উঁকি দিয়েছে। দশ মিনিট— বলেই মা বালিশের তলায় একদম দলামোচড়া ঘুমে।

হায়! আমার কী হবে ? কেড্‌সের ভেতর আমার পা টাটাচ্ছে কেন ? কী ব্যথা! আমি হাঁটতে পারব তো ? সে যদি ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ক্লাসে ঢোকে ? অত স্টুডেন্ট! টিচার! স্কুলের প্রথম দিন স্কুল করা কত ভয়ঙ্কর একটা বিষয়! দুনিয়ার স্টুডেন্ট অচেনা। টিচার অচেনা। আর পিচ্চিরা কী নিষ্ঠুর হয়, তা কি সে কম জানে ? নিকুন্তিলা একটু অন্যরকম বলেই মধ্যরাতে শীতের মধ্যে কুকুর কাঁদতে থাকলে তার মনে হয়, মাকে বলে, কুকুরটার গায়ে একটা লেপ চড়িয়ে দিয়ে আসো। খালামণি বলেছিল, সে যেদিন প্রথম স্কুলে যায়, একটা কুঁজো মেয়েকে নিয়ে সারা ক্লাসের মেয়েদের মধ্যে মজার হুল্লোড় বয়ে গিয়েছিল। সেই সময় খালা ছয় বৎসর বয়সে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হয়েছিল। এখনকার মতোন অত প্লেগ্রুপ, কেজি ওয়ান, কেজি টু ছিল না। কেউ তার বিনুণি ধরে টানে, কেউ কুঁজো পিঠে টপাস থাপ্পড় কষিয়ে বলে, এইটা একটা টিলা। এই মেয়েরা চলো আমরা টিলায় উঠব।

সবার পায়ের চাপে মেয়েটা যখন চিৎকার করে কাঁদছে, তখন টিচার আসে।

খালামণির ওপর দিয়েও কম যায় নি। লাল ফিতে বেঁধে যাওয়ায় সেই প্রথম দিনই এক টিচার তাকে সারা ক্লাস কান ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। এরপর টিচার চলে গেলে মেয়েগুলো ভেংচি কেটে কেটে কান ধরার অভিনয় করে খালামণির ওপর হামলে পড়েছিল।

মাগো! ভয়ে আমার কলজে ফেটে যাচ্ছে! নিকুন্তিলা কাঁপতে কাঁপতে ফের কেড্‌সের ফিতে ঠিকমতো বাঁধতে গিয়ে শোনে সেই অপার্থিব ডাক!

যেন ভোর নাচের ঘোর কাঁপিয়ে, যেন জলের মধ্যে ভুস ভেসে ওঠা রৌদ্রোকরোজ্জ্বল তিমির মতো, যেন সূর্যোদয় বাতাসের ঘাঘরা চকমকির মতোন মা'র উজ্জ্বল কণ্ঠ শোনা যায়... নিকু... নিকুউউ...।

যাচ্ছি মা।

মুহূর্তে একেবারে বায়োনিক কায়দায় মা বিছানা থেকে উঠে সাজগোজ করতে করতে চিল্লায়... বুয়া.... বুয়া... আহ্, কুঁচির ভাঁজটা ঠিকমতো চেপে দাও না।

বুয়া কুঁচি ঠিক করছে, মা এক হাতে ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাচ্ছে, অন্য হাতে মুখে পাউডার লাগাচ্ছে!

আহ্ নিকু... কাল কতভাবে শিখালাম কী করে কেড্‌সের ফিতে বাঁধতে হয়। এখনো বসে আছো ? কেষ্ট... নাস্তাটা গাড়িতে দিয়ে দাও, বড্ড দেরি হয়ে গেছে, আমরা রাস্তায় খেতে খেতে যাব।

নিকুন্তিলার পুরো জীবিত পরিবেশ বেষ্টন করে ফেলে স্বপ্নের জগৎ। শিরশিরে একটা অজানা অনুভব শিরদাঁড়া অতিক্রম করে একদম পায়ের পাতা অব্দি চলে যায়।

ছায়ার ঘোর আবিলতা ছিঁড়ে গাড়ির গ্লাসে ঠোক্কর খাচ্ছে প্রভাতের রোদ। চামড়ার কোষে কোষে কী যেন ভয়, কী যেন শীত, কী যেন আতঙ্ক, সাথে নিকুন্তিলার কৌতূহল দুর্মর... কী হবে প্রথম ক্লাসে ? নিকুন্তিলা নাস্তা খাচ্ছে, মা চলন্ত গাড়িতে ওর বেণি বাঁধতে গিয়ে প্রায় ঘুমু ঘুমু।

তোমার ঘুম পাচ্ছে মা ?

অত ভোরে উঠে অভ্যেস নেই তো! মা সলজ্জ হাসে। কেমন যেন বমি বমি লাগছে।

নাস্তা গিলতে গিলতে নিকুন্তিলা অপরাধবোধে ভোগে— খালামণি থাকলে...।

মা ওর কপালে চুমু খেয়ে বলে, খালামণি থাকলেও তোর প্রথম ক্লাস— আমিই যেতাম।

সিগন্যালে দাঁড়িয়েছে গাড়ি। মা সূর্যের রক্ত গোলের দিকে দুর্মর টেনশন নিয়ে তাকিয়ে ঘড়ি দেখে... ওফ্ নিকু, তুই পানি এনেছিস ? টিফিন ?

কেষ্টদা সব গুছিয়ে দিয়েছে মা।

যেন গাড়িটা ডুব সাঁতারে পড়েছে... চারপাশের হাওয়া যেন জল, মানুষগুলো বিভিন্ন পোশাকের কাপড় পরে নানা মাছ হয়ে ছুটছে! কোথায় ছুটছে ? নিকুন্তিলার ভাবনা হয়, এরাও কি জীবনের প্রথম কেউ অফিসে, কেউ কলেজে, কেউ বাবার মতন বিজনেসে যাচ্ছে ? বাবা ? এত্তো সকালে ? মোরগ ডাকা ঠিক ভোরটায় মানুষের এত ব্যস্ততা ? কী করে কাঁটায় কাঁটায় ঘুম ভাঙে ? জরুরি সকালে খালামণি যেমন এলার্ম দিয়ে রাখে, এরা কি প্রতিদিন তা-ই করে ?

যানজট ছুটছে না। এ.সি. শীতেও মা'র কপালে ঘাম। চোখ অস্থির। বারবার ঘড়ি দেখে নিকুন্তিলা। তাকে এখনো গুণে গুণে সোয়া সাতটা, সাড়ে সাতটা বের করতে হয়। মানুষ যে কী ক্ষমতায় এক ঝলক দেখেই ঘড়ির সময় বলে দেয়! মা বেশি ঝক্কির সময় কিছুতেই ঘড়ি দেখে না। যেন তখন ঘড়িটা আজব এক দত্যি, মা তাকানো মাত্র তাকে হাউমাউ করে গিলে খাবে। অথবা এ মা'র অবচেতন এক আতঙ্ক... ঘুমিয়ে বিপদ পার করার চেষ্টার মতোই... ঘড়ির কাঁটা যদি আটটা ছুঁয়ে ফেলে ? জটে পড়ে মা কলজের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি খেতে চায় না। ছায়া নাচের প্রভাত কুয়াশাঘোর! এর মধ্যে উঁকি দিয়ে ওঠা সূর্যের প্রোজ্জ্বল চকমকির সাথে ঠুমকিতে মেতেছে শীত।

কেঁচোর মতোন কুঁকড়াচ্ছে নিকুন্তিলা।

এখন মা'র কথা যেন মিঠেল বাতাস, আরে প্রথম দিন! কিসসু হবে না। টিচাররা ঠিকই বোঝেন। প্রথম ক্লাস কী জিনিস বাচ্চারা বোঝে না। ওরা একটু আগে পরে আসতেই পারে। নিকুন্তিলার প্রশ্ন— যদি টিচার বলে গার্জেনরা বুঝল না কেন ?

তোকে যে কেন আমি প্লেগ্রুপে নিজের কাছে পড়িয়ে নার্সারীতে দিচ্ছি, মা রাগ চেপে বলে, এতো হতেই পারে। মা সময় মতোই গেটে নামিয়ে দিয়েছে, ভয়ে ভয়ে তুই টিচারকে বলবি, আমার মাঠ পার হতেই বেলা হয়ে গেল। প্রথম দিনই যদি টিচাররা ছাত্রীকে ভয় দেখিয়ে শাসায়, সে ছাত্রীকে সে মানুষ করবে কী করে ? যানযট ছাড়লে মা রুমাল খোঁজে। সব সময় রুমালের অনুপস্থিতি অনুভব করা মা ব্যাগে কোনোদিন রুমাল খুঁজে পায় না।

মাঠে দেরি ? তার মানে মিথ্যে ? গাড়ির পেছন থেকে মাকে টিস্যু দিয়ে নিকুন্তিলা ভাবে, এ অবশ্য নতুন নয়— ঝাঁঝালো হয়েছিল পিঠে চড় খাওয়ার দিন। দীর্ঘদিন আস্ত এক হাতের দাগ লাল হয়ে বসেছিল নিকুন্তিলার পিঠে। নিকুন্তিলা বিমূঢ়। স্তব্ধ। এখন দু'জনকেই দু'জনার লুকাতে হবে। বাবাকে মা লুকাবে নিকুন্তিলার অপরাধ, নিকুন্তিলা লুকাবে তার পিঠের দাগ। মা আর নিকুন্তিলা কেউ কাউকে জন্মের পর থেকে কিচ্ছু লুকায় নি। সেই জাম্বুরা মুখের দিন মাকে হতভম্ব করে দিয়ে নিকুন্তিলা বাবাকে বলেছিল, ওর নিঃসঙ্গ ময়নাটাকে খাঁচায় দেখে কাঁদতে কাঁদতে ওর এই দশা হয়েছে, নিকুন্তিলা ময়নাটাকে ছেড়ে দিতে চাইলে মা বাধা দিয়েছে, ব্যাস এইটুকুই। ময়নাটা আকাশে ওড়ার জন্য নিকুন্তিলার স্বপ্নের মধ্যে এসে সে কী কান্না করে! কাল রাতে নাকি বেশি কেঁদেছে। কিন্তু বাবার কেনা ময়না, বাবার অনুমতি ছাড়া ওকে কিছুতেই উড়তে দেবে না বলে মা ঘুমিয়ে পড়লে নিকুন্তিলার রাজ্যির কান্না।

নিকুন্তিলা মা'র চোখ দেখেছিল, মেয়ের গরগর মিথ্যে বলাতে, মা'র মুখ শাদাটে, মরাটে, কোথায় নিজে বাবার বকুনি থেকে বেঁচে যাওয়ায় আনন্দও। আসলে সে-ই প্রথম মিথ্যে। সিগনাল ছেড়ে গাড়ি পেরিয়ে গেলে নিকুন্তিলার ঠিক ঠিক মনে পড়ে, বাবা তো অবাক, তা-ই বলে এতো কান্না ?

যা হোক। সব স্থির হলে মা যখন দেখে বাবা ঘুমিয়ে, নিকুন্তিলার হাতে হাত ছুঁইয়ে বলে, আমি তোর অপরাধের জন্য তোকে মারি নি। মেরেছি, এই অপরাধ আমার কাছে লুকোনোর জন্য। আমিতো তোকে বলেছিই তক্কে তক্কে, সব বলবি, মৃত্যু অব্দি, খুন পর্যন্ত, আমি জানলে তোর সামনে বুক আগলে দাঁড়াব।

নিকুন্তিলা তিন থেকে চার বছর অব্দি মোটামুটি মায়ের কঠিন অথবা সরল অনুভবের কাছে পরিচিত। কিন্তু কী হয়, তার এক কাজিন, পড়ে ফাইভে, নিকুন্তিলাকে বলে হাফপ্যান্ট খুলতে, কেন ? নিকুন্তিলা হাঁ। কাজিন বলে, আমি ছেলে, তুমি মেয়ে, দু'জনের পার্থক্য দেখব।

পার্থক্য আবার কী ? মানুষ তো সবাই এক... এরকম কথা যখন, কাজিন বলে, আমার একটা পিচ্চি বোন হয়েছে, সবাই যখন তাকে ওপরে তুলল, দেখি তার নুনু নেই। তোমারও কি নেই ?

নিকুন্তিলা এই গল্প মাকে বলে দেয়। মা তাকে বোঝায়। নুনু সবারই থাকে। ছেলে আর মেয়ে দু'জনের দু'ধরনের হয়। অত কি ছাইপাশ ঢোকে মাথায়! মা তারপরও বলে যায়, এ ফ্রয়েডের দোষ, নুনু দিয়ে পুরুষকে মহান করে এক ভোঁতা যুক্তি তৈরি করেছে, মেয়েরা বেড়ে ওঠার সময় ছেলেদের নুনু আছে, আমাদের নেই, এই হীনমন্যতা নিয়ে বেড়ে ওঠে, কী জঘন্য থিওরি! তাহলে তো নিজেদের দুটি স্ফীত বড় স্তন নেই বলে ছেলেরাও নিজেদের অসম্পূর্ণ মনে করত। মা অক্ষম জেদে বলে— যত্তোসব ভোঁতা যুক্তি! ফ্যালফ্যাল চেয়ে থাকে নিকুন্তিলা... শোনো, মা বলে, তুমি ওর সামনে হাফপ্যান্ট খুলেছ ? নিকুন্তিলা জ্বরতপ্ত— না।

কখনো খুলবে না, ঠিক আছে ?

আচ্ছা।

সেই মা-ই চমক ভাঙা দুপুরে, ছায়া সিঁড়ি পেরিয়ে যখন দেখে, সেই একই কোণার বারান্দায় কাজিনের চাপের মুখে নিকুন্তিলা হাফপ্যান্ট খুলছে...।

এরপর মিথ্যে।

নিকুন্তিলার পিঠে বাবাকে লুকোনো সশব্দ মায়ের চড়। এবং সেই কঠিন চড় উপেক্ষা করে ওর সরল চাহনি— মা, আমার হাত মুখ সব দেখা যাচ্ছে, ওইসব জায়গাগুলো কেন এত গোপন ? মা শান্ত হলে সে সেই প্রশ্নও করেছে। মা এই প্রথম তার প্রশ্নে থেমে গিয়ে বলেছে, আরেকটু বড় হলে জানবে।

কিন্তু সেদিন নিকুন্তিলা এই প্রশ্নে থেমে থাকলেও তার মাথায় ঢং ঢং ঘণ্টা বেজেছে— আরেকটু বড় হলে কি সেই রহস্যময় অপার্থিব পৃথিবীর খবর জানা যায় ? নীল কার নয়, যেন চক্রযান.. ড্রাইভার যে কোন ফাঁকে ফুড়ুৎ করে সব গাড়ি পেছনে ফেলে সামনে চলে যেতে থাকে! মা'র ভঙ্গি এমন— যেন মৃত্যুময়, শীতার্ত, বলে, আমার ঘুমই আমাকে কালসাপ হয়ে গিলে খাবে। এই সময় অন্তত যার বুকের মানিক প্রথম ক্লাসে যাবে, তার অত মরণ ঘুম হয় ? নিকু, লক্ষ্মী সোনা, সারারাত টেনশনে আমার ঘুম হয় নি... আধঘণ্টা পরপর ঘুম ভেঙে গেছে, বারবার মনে হয়েছে, বুঝি অনেক দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু যখনই চোখ মেলেছি, ওমা! হয় তিনটা দশ, নয় পৌনে চারটা। কিন্তু আমার রোগ তো একটাই, সকালে ঘুম ঝাঁকিয়ে বসে। তুই তো তা জানিস, আচ্ছা, কেমন মেয়ে তুই বাবা, ক্যাডসের ফিতে লাগাতে হিমশিম খাচ্ছিস, আমাকে একবার নক করলেই—।

মা, তুমি অত ভোরে—।

ধুর, ঘোড়ার ডিমের কথা সব; আমি তোকে প্লেগ্রুপে দিই নি। সেই পড়াটা আমিই তোকে শিখিয়েছি। কী শিখলি তুই ? বাড়িতে আগুন লাগবে, আর যার ঘুমকাতুরে স্বভাব, সে পুড়ে মরবে ?

মা বড় অদ্ভুত! একদিন ওকে রাঙামাটির প্রচুর গাছের নিচে বসে বলছিল, নিকু, নিঃশ্বাস টেনে দেখতো! দুর্গা পূজার ঘ্রাণ পাচ্ছিস কি-না ? এরপর ঠিক মনে নেই, কোন জঙ্গলে নিয়ে দেখিয়েছিল শিবলিঙ্গ। কী ভয়ানক! মিশকালো! এটা কী মা ?

বড় হলে জানবে।

কী রকম চক্কর খাচ্ছে শীতছায়া!

নিকুন্তিলা দেখে, রাজধানীতে প্রচুর ভিড়! পোকার মতন গিজগিজ করছে হাজার মানুষ। আর সবারই প্রাণান্তকর চেষ্টা, কীভাবে গন্তব্যে আগে পৌঁছানো যায়।

নিকুন্তিলার চোখে সেই কুঁজো মেয়ে... কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়ে— সে কুঁকড়ে যায়। ভেতরে ভেতরে কাঁপতে থাকে। কিন্তু সে ভয় পাচ্ছে— এই কম্পন মা'কে দেখানো যাবে না। সে প্রথম দিন বীরত্বের সাথে ক্লাসটা করে এসে দেখাবে সে মোটেও অন্য মেয়েদের মতো নয়। মা'র সে কথা কানে বাজে— নিকু, বুঝেছি অব্দি আমি সবার চাইতে আলাদা হতে চেয়েছি। সে আলাদার রূপ কী ? মাকে জিজ্ঞেস করা হয় নি। মনে হয়েছে মা'র সব কথা সে বুঝবে না। আরেকটু বড় হলে সে এই বিষয়ে মা'র কাছে বিস্তারিত জানতে চাইবে। তবে মা-তো আলাদাই। রাত জেগে কী সব মোটা মোটা বই নিয়ে ইংরেজি থেকে বাংলা করে করে ক্লান্ত হয়ে ভোরে ঘুমায়। বাবাকে সে বলতে শুনেছে, তুমি এসব পত্রিকায় দাও না কেন ? এখানে অনুবাদের কী ক্রাইসিস তুমি জানো ?

মা কেমন কুঁকড়ে উঠেছে, এসব পত্রিকায় দেওয়ার জন্য তো লিখি না।

তবে এত ভূতের মতো খেটে কী লাভ? বাবার এই প্রশ্নে মা প্রায় কাঁচুমাচু হয়ে বলেছে, এ এক নেশা বলতে পার। চর্চার নেশা। কেউ ইংরেজি থেকে সরাসরি পড়ে, আমি রাত জেগে অনুবাদ করতে করতে পড়ি।

চর্চার নেশা? এর অর্থ বোঝে নিকুন্তিলার সাধ্য কী? যতই সে সবার চাইতে আলাদা হওয়ার জন্য বয়সের চাইতে কয়েক ধাপ এগিয়ে কথা বলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিক না কেন।

সবুজ বাতি জ্বলবে জ্বলবে, তখন এক বুড়ো ভিখিরি, পিঠে বড়ো কুঁজ— গাড়ির বন্ধ জানালায় নক করতে থাকে। আজ স্কুলের প্রথম দিনেই রাস্তায় কুঁজ— চমকে উঠে বিহ্বল নিকুন্তিলা মাকে বলে... বুড়োটাকে কিছু পয়সা দাও... মা... মা...।

তক্ষুণি গাড়িটা চলতে শুরু করে। বুড়োর হাত অদৃশ্য হয়ে যায়। মা একটু অবাক হয়ে কিছু না বলে নিকুন্তিলাকে বুকে জড়িয়ে ধরে— ভয় করছে?

একটু একটু!

কিচ্ছু হবে না দেখিস। প্রথম ক্লাস। পড়াশোনার ঝক্কি নেই— মা বলে, টিচাররা আনন্দ করবে। এর মধ্যে কেউ কেউ তোর বন্ধু হয়ে উঠবে।

এক্কেবারে আটটা পাঁচে স্কুলের সামনে গাড়ি থামে। গার্জেনরা ভিড় করে আছে স্কুলের গেটে। ভিড়ের মধ্যে ফাঁক গলিয়ে ভেতরে ঢুকতে নিকুন্তিলা ওস্তাদ। যখন থেকে সে হাঁটতে পারে, তখন থেকে মা তাকে কোনোদিন কোলে নিয়ে শিশু পার্কের ঘোড়ায় চড়ে নি। নিকুন্তিলা বিশাল লাইনের পেছনে না দাঁড়িয়ে মাকে অবাক করে দিয়ে দৌড়ে একদম সবার সামনে টিকিট নিয়ে দাঁড়িয়েছে। ওইটুকুন পুঁচকে মেয়ে... আবার... একা... কেউ কিছু বলে নি, বরং অন্য গার্জেনরা ওকে হাত ধরে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিয়েছে। সব বাচ্চার সাথে গার্জেন। নিকুন্তিলা একা শক্ত করে ধরে রেখেছে সামনের লোহার ডাঁটা। আহা! সাবলম্বী হওয়ার কী আনন্দ! ঘোড়া চক্কর খাচ্ছে। মা হাত নেড়ে নেড়ে নিকুকে ফ্লাই কিস করছে।

কিন্তু এখানে কাণ্ড অন্যরকম। লাল হলুদ রোদ্দুরের মিশেলে ঝাঁক ঝাঁক ছাত্রীর আকাশী ড্রেস। বেশির ভাগ বাচ্চাই এমন উচ্চ স্বরে কাঁদছে, যেন তাদের গারদে ঢোকানো হচ্ছে। অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে যখন কোনো কোনো গার্জেন বাচ্চাদের মাঠ পেরিয়ে ক্লাসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আসছে, ভ্যাঁ চিৎকার করে সেইসব বাচ্চা ছুটতে ছুটতে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এইতো নিকুন্তিলার সময়! মা'র দিকে স্মার্ট চোখে তাকায়। মা'র মুখেও মৃদু হাসির অহঙ্কারী তরঙ্গ, মানে কৃতিত্বটা যেন তারই... তোকে আমি ভ্যাঁ মার্কা বাচ্চা বানাই নি। ভিড়ের ফোঁকর গলিয়ে অর্ধেক মাঠ অব্দি হেঁটে নিকুন্তিলা পেছনে তাকায়। ভিড় উপচে মা হাত নাড়ছে। ক্লাসের দরজা অব্দি গিয়ে পেছন ফিরে নিকুন্তিলার প্রাণ শুকিয়ে যায়।

মা চলে গেছে।

অভিমান ওঠে বুকে। এক্ষণ গিয়ে মা ঘুমুবে। মেয়ের প্রতি মায়ের এত বেশি আস্থা ওর বুক শূন্য করে দেয়। নিজেকে সামলে সে ফার্স্ট বেঞ্চে গিয়ে বসে।

মা'র সাথে গ্রামে গিয়ে অনেক বক পাখি দেখেছিল নিকুন্তিলা। গাঙের ওপর ঝাঁক ঝাঁক, মা'র কী-যে কথা— সব কয়টা মাছ ধরার ধ্যানে বসেছে। মনে হচ্ছিল সব যমজ। এখানে ক্লাসেও একরকম ফিতে, জুতা মোজা... কাউকে আলাদা করা যাচ্ছে না। টিচার এসে দেখেন, অনেক বাচ্চা কাঁদছে। কী সুন্দর কুঁচি দিয়ে শাড়ি পরেছেন টিচার। মা মোটেই অত সুন্দর পরতে জানে না। তিনি এসেই বলেন, সব ছাত্রী দাঁড়াও। টিচার ক্লাসে ঢুকলে সবাইকে দাঁড়াতে হয়।

নিকুন্তিলার পাশের বেঞ্চে বসা মেয়েটা একটানা ফোঁপাচ্ছিল। নিকুন্তিলা এই প্রথম গার্জেন হওয়ার সুযোগ পায়। সে মেয়েটার মাথায় হাত রেখে বলে, আরে কাঁদছ কেন ? একটু পরেই ছুটি হয়ে যাবে। তক্ষণ বাবা মা'র কাছে আবার ফিরে যাবে।

জড়সড় হয়ে মেয়েটিও দাঁড়ায় সবার সাথে। টিচারকে দেখে সবার শব্দ করে কান্না বন্ধ। চোখের জল গিলে কেউ কেউ হেঁচকি তুলছে। টিচার যেন পতাকা ওড়াচ্ছেন, এরকম কায়দায় হাত তুলে হাসতে হাসতে ক্রন্দনরত মেয়েদের বলেন, একদম বোকা মেয়েরা ক্লাসে এসে কাঁদে। স্কুল মোটেই কোনো ভয়ের জায়গা নয়। বাসায় এতদিন সবাই ভাইবোন বাবা-মা'র সাথে থেকেছ। এখানে চারপাশে তাকিয়ে দেখ, কত বন্ধু তোমাদের... নিকুন্তিলার চোখ চলে যায় জানালার বাইরে। গুচ্ছ গুচ্ছ শীতরোদের মিহি মিউজিক... আরেকটু দূরের দেয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে বাতাস... তারও ওপারে মুখ বাড়িয়েছে লতানো ফুলের ফণা... নিকুন্তিলার কানে বাজে বাঁশির সুর, মা'র সাথে এক গাছের নিচে বসে দেখছিল, তামাটে এক যুবক স্তব্ধ দুপুরে ঘামতে ঘামতে টানা বাজিয়ে যাচ্ছে... কিচ্ছু দিকে তার হুঁশ নেই। বাবার আদুরে গলা.. নিকু... নিকু জাদু সোনা...!

যাচ্ছি!

টিচারের সঙ্গে ফের ক্লাসে... কারা কারা সাহসী হতে চাও! হাত তোল। কেউ হাত তোলে না। নিকুন্তিলা কিছু না বুঝেই হাত তোলে। টিচার ওকে বলেন, তাহলে আমার কাছে এসে সবাইকে তোমার জানা সবচাইতে মজার গল্পটা বল।

কুঁজো পিঠ... ধেৎ! ভেতরে ভেতরে ভয় আগুনে ফেটে পড়লেও নিকুন্তিলা স্মার্টলি এগিয়ে যাওয়ার ভান করে। কিন্তু মজার গল্প ? মজার গল্প তো সে জানে না। ডিজনীর কোনো

কাহিনী বলে দেবে ? অথবা মা'র বলা নস্টালজিয়া রূপকথার কোনো একটি ? কিন্তু এখন তো তার তোতলালে চলবে না। সে গটগট হেঁটে বাবা যেরকম মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে অনর্গল বলে যায়, সেই কায়দায় টিচারকে সালাম দিয়ে ছাত্রীদের উদ্দেশে শুরু করে, আমার সুপ্রিয় বন্ধুরা, যারা ক্লাসে এসে কাঁদছ তাদের উদ্দেশে আজ আমি...।

একটা মেয়ে কান্না থামিয়ে ফিকফিক হাসতে শুরু করে। তার দেখাদেখি আরো ক'জন। তারা আঙুল দিয়ে নিকুন্তিলার কেড্‌সের দিকে ইঙ্গিত করে কিছু বলছে। নিকুন্তিলা হতচকিত হয়ে পড়ে। টিচার সবাইকে সজোরে থামিয়ে নিকুন্তিলার জুতোর দিকে তাকিয়ে নিজেও হাসি চেপে বলেন, তুমি উল্টো জুতো পরেছ কেন ? ক্লাসে হাসির হুল্লোড় বয়ে যায়।

তোমাকে কে জুতো পরিয়ে দিয়েছে ?

নিকুন্তিলা রক্তাভ— আমি, নিজে...

জুতোর ফিতের ফোস্‌কা গেড়ো তুমিই লাগিয়েছ ?

প্রায় বিষকান্না গিলে নিকুন্তিলা যেন দেখে, কুঁজো পিঠ... চমক ভাঙা স্বরে সে উচ্চারণ করে, আমিই চেষ্টা করছিলাম। পারি নি, শেষে মা—!

মা ? এইবার টিচার অবাক। তোমার মা ফিতে বেঁধে দিয়েছে। উল্টো জুতো দেখে নি ?

কান্না ভেজা মেয়েরা আরো একচোট হাসে। টিচার তাদেরকে কড়া স্বরে থামিয়ে ফের নিকুন্তিলার মুখোমুখি যখন, তখন নিকুন্তিলা বলে, মা ভোরে খুব ঘুমায়। একটু দেরিতে উঠে অত তাড়াহুড়ো করছিল—।

তাই বলে জুতো উল্টো চোখে পড়বে না ?

নিকুন্তিলা কিছুতেই চোখে জল আনবে না ব্রত নিয়েছে। সে দৃঢ় স্বরে উচ্চারণ করে, মাকে দোষ দিচ্ছেন কেন ? আমি নিজে লক্ষ করি নি, দোষটা তো আমার।

টিচার জড়িয়ে ধরেন নিকুন্তিলাকে। যেন তার চোখেই জল আসছে এমন স্বরে সব ছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, শুনছ, আজ মেয়েটা প্রথম ক্লাসে এসে কী বলছে ? তোমরা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদছ, তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। আজ ও সবচাইতে সত্য এবং মজার গল্পটা করেছে। ওহে আত্মবিশ্বাসী সাবলম্বী মেয়ে, তোমার নাম কী গো ?

নিকুন্তিলা!

ক্লাস হয় না। নিকুন্তিলার জুতো ঠিক করে টিচারই ফিতে বেঁধে দেন। সব গার্জেন বাইরে হয় মাদুর পেতে, কিংবা ঘাসে বসে আড্ডা দিচ্ছে। এখন ছুটি হবে, প্রথম দিন বলে কথা, ঠিক নেই, যদিও কথা ছিল দুপুর বারোটায়, কিন্তু ছুটি হয়ে যায় আগে। নিকুন্তিলা জানে,

মা বারোটা বাজার সময়ই আসবে। সব মেয়ে চলে যাবে। সে এই এক ঘণ্টা কী করবে ? নিকুন্তিলা বিমর্ষ বোধ করে। সে কল্পনায় দেখে, সব ছাত্রী চলে গেছে। সারা স্কুল ফাঁকা। ওর কর তর্জনীর ভাঁজে দুপুরের মিহি রোদ্দুর। সমস্ত নিঃসঙ্গ মাঠ ধরে সে একাকী হাঁটছে, চক্কর খাচ্ছে, কান্না পাচ্ছে... কিন্তু সেই তেতো জল গিলে সে তাকাচ্ছে বাইরে— যেখানে আচারওয়ালা। বাবার কঠিন নিষেধ, ওইসব ছাই পাশ না খাওয়ার। ওর মাথার ওপর মস্ত এক আসমান, যেখান দিয়ে পাখির মতো উড়ে যাচ্ছে কোনো ডানাওয়ালা প্লেন... সব শব্দ থেমে গেছে... ঘণ্টার শব্দ পর্যন্ত... প্রভাত পিয়াসী রোদ ক্রমশ তেজস্বী। নিকুন্তিলা ক্ষুধার্ত... ক্লান্ত দেহে শুয়ে পড়েছে মাঠে... আকাশের রোদ্দুর এসে বলছে, চল উড়ি।

হায়! আমার ওড়ার ডানা নেই। কেবল হাত। হুড়মুড় করে সব ছাত্রী ক্লাস থেকে বেরিয়ে পড়েছে। নিকুন্তিলার যোজনব্যাপী আঁধার, এই শীত আলোতেও। পায়ে খুব ব্যথা হচ্ছে। নিজেকে টেনে হিঁচড়ে বের করেই তুমুল সারপ্রাইজ। সব গার্জেনকে পেছনে হটিয়ে সামনে বাবা।

বাবা ? এত ব্যস্ততার মাঝখানেও নিকুন্তিলার কখন ছুটি হবে সেই হিসেব বাদ দিয়ে আজ ওকে নিতে এসেছে ? বাবার কপালে ঘাম। নিকুন্তিলার ইচ্ছে হয়, জিভ দিয়ে সব ঘাম খেয়ে ফেলে। সে ছুটতে ছুটতে বাবার বুকে হামলে পড়ে। বাবা ওকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে প্রায় কোলে নিয়ে ওকে গাড়িতে নিয়ে বসায়।

বাবাকে কী বলবে সে ? নিকুন্তিলা বাকরুদ্ধ। বাবা বলে, তোর মা'র হিসেবে কি জীবন চলে ? স্কুলের প্রথম দিন তোর, ভাবলাম, কখন ছুটি হয়, সেইজন্য এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

বাবা! আই লাভ ইয়্যু।

আই লাভ য়্যু টু থ্রি ফোর। এখন বল কোন আইসক্রিম খাবি ? আমার সোনা জাদুর আজ প্রথম ইসকুল বলে কথা।

এইরকম দিন যায়। নিকুন্তিলার কাছে ইসকুলটা অনেক সহজ হয়ে এসেছে। কেষ্টদা ওকে গাড়িতে করে ক্লাসে পৌঁছে দেয়। ফার্স্ট বেঞ্চে বসার জন্য সে বেশ সক্কাল সক্কাল ঘুম থেকে উঠে আগে বেরিয়ে পড়ে। এর মধ্যে সমস্যা একটাই, পাঁচ বছরে পড়েছে সে, এর পরেও সে রাতে দু'তিনবার বিছানা ভিজিয়ে ফেলে। খালামণি থাকতে অসুবিধা ছিল না, ঘুম জড়ানো চোখে ওকে বকাঝকা না করেই ওর কাপড় পাল্টে দিত। কিন্তু মা একেবারে রেগে যায়, বলে, তোকে বিয়ে দিলে তোর বরের শরীরও তুই ভিজিয়ে ফেলবি। এরপর বর তোকে এক্কেবারে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে...। ফুঁপিয়ে কাঁদে নিকুন্তিলা— আমি ককখনো বিয়ে করব না।

করবি করবি... যখন সময় হবে তখন—।

মা'র এই কথায় কাঁথা ভেজানো অপরাধী প্রায় গর্জে ওঠে, তুমি ফের এই কথা বললে আমি গলায় দড়ি দেব।

সে-কী কথারে নিকু ? মা নিকুন্তিলার হাফপ্যান্ট পাল্টাতে ভুলে যায়। গলায় দড়ি ? এটা তুই কোত্থেকে শিখলি ?

বা-রে, আমি বুঝি পেপার পড়ি না ? মুখে এসিড, গলায় দড়ি, খুন— সবই তো ওতে লেখা থাকে।

তুই তো খালি পচা পচা জিনিসই পড়বি। মা'র হাত সচল হয়। একটু ঘুরে বোস, গন্ধে টেকা যাচ্ছে না...।

ভালো কিছু পড়ি না বুঝি ? একটা কুকুর, খরগোশকে বাচ্চা বানিয়ে আদুরে আদুরে বসে আছে, পেপারে সেই ছবি তোমাকে দেখাই নি ?

এই মধ্য রাতে তর্ক বন্ধ কর। কাল ভোরে তোকে হিসুর মধ্যে লবণ দিয়ে জিভ দিয়ে খাওয়াব।

প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে নিকুন্তিলা, এটা আবার কী নিয়ম ?

আমার ছেলেবেলায় বিছানা ভিজিয়ে ফেললে মা এটা করে আমার এই কাণ্ড বন্ধ করেছিল।

এটা করলেই বন্ধ হয়ে যায় ?

আমার তো হয়েছিল।

তোমার মনে আছে সেই স্মৃতি ?

থাকবে না ? কী ভয়ঙ্কর! শীত ভোরে কাঁপতে কাঁপতে কিছুতেই নাকটা বিছানায় নিতে পারতাম না। বমি ঠেলে উঠত। কিন্তু মা তখন খড়্গ হাতে দাঁড়িয়ে আছে, কী করা।

তার মানে তুমিও তোমার স্মৃতি মনে রাখা বয়সে এই কাণ্ড করতে! আমি করলে অত চেঁচাও কেন ?

যুক্তিতো খুব ভালো দিতে পারিস। বললাম তো সকালে তোকে খাওয়াব।

তুমি এইসব ফালতু বিষয় বিশ্বাস কর ? ওতেই বন্ধ হবে ? বাবা তো ফুটানো জল ছাড়া কিছু খেতে দেয় না। তুমি হিসুর মতো একটা জার্মের মধ্যে আমাকে মুখ দিতে বলছ ? আমি বাবাকে বলে দেব।

ব্লেকমেইল করছিস ?

বা-রে! তুমি না সেদিন আমাকে লম্বা করে শেখালে, কুসংস্কার কী জিনিস। হিসুর মধ্যে লবণ কেন ? এটাও তো—।

তবে কি চটপটি দিলে তোর সুবিধে হয় ? আরে, এর একটা সাইন্টিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড আছে— মা বলে, ছেলেবেলায় মাকে আমিও ভুল বুঝেছি। মনে হতো সৎমা। কিন্তু বড় হলে

চিন্তা করে দেখি, ভোরে ওই লবণ খাওয়ার ভয়ে ঘুমের মধ্যেও অবচেতনে কাজটা করতে পারতাম না। অবশ্য আমার মা এমনিতেই খুব নিষ্ঠুর ছিল— বলতে বলতে মা বিমর্ষ হয়ে ওঠে।

ভয়ে ভাবনায় নিকুন্তিলা কুঁকড়ে ওঠে, সে মুখে হাত চেপে কাঁদতে থাকে— মা আমি কাল থেকে সারারাত জেগে থাকব, তুমি এই শাস্তি আমাকে দিও না।

মা'র ঘুম কেটে গেছে। সে নিকুন্তিলার সব ঠিকঠাক করে দিয়ে ওপর আলো আঁধারির দিকে তাকায়... যেন তাকে স্মৃতি মৃত্যু বাঁশরী ডাকছে এমন স্বরে বলে, আমার মা'র পেটে বাচ্চা হলেই হয় দু'মাস, নয় মাস, নয় জন্মের কিছু দিন পর সব বাচ্চা মারা যেত। আমি সেই মৃত সন্তানের সাতজনের পরে জন্ম নিয়েছি। মা-তো প্রথম দিকে আমাকে নিয়ে সারাক্ষণ আতঙ্কে ভুগত। আমিও বলতে গেলে একটা ভয়াবহ আতঙ্কের মাঝখান দিয়ে বড় হয়েছি। আমি আসলে ছোটবেলা থেকেই ভয়ে ভয়ে বেড়ে উঠেছি। আমার পরেও মা'র আরো তিন বাচ্চা মরে গেছে।

নানু এত বাচ্চা নিত কেন ?

বাচ্চা ছিল তার অবসেশন... তার নেশা... সারা ঘরময় তাকে ঘিরে সব বাচ্চারা ঘুরবে— এটাই ছিল তার সেরা স্বপ্ন। আমারও তাই...। বলে মা বিমর্ষ হয়ে নিকুন্তিলার ঠোঁটে চুমো খায়... তোকে লবণ খেতে হবে না।

আমার তাহলে আর ভাইবোন নেই কেন ?

নিকু সোনা... মা প্রায় আধছায়া ভেঙে ভুতুড়ে গলায় বলে, এই তো আমার পেটে তোর এক ভাই... দেখ দেখ নড়ছে। নিকুন্তিলা মা'র পেটে কান রেখে লাফিয়ে ওঠে, সত্যি বলছ মা ? সত্যি ?

ধুর বোকা! তুই আমার সেই বারোটা বাচ্চার সব নিয়ে জন্মেছিস। তোর ভাগ অন্য কেউ নেবে, সেটা আমি চাই না।

মা, আমি চাই! নিকুন্তিলা ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, একটা পুতুলের মতো মেয়ে, ওকে বুকে চেপে হাঁটব— না মা, ছেলে না। ছেলেরা ভারি দুষ্ট হয়।

সেই ভয়েই তো আর বাচ্চা চাই না। যদি ছেলে হয় ?

ও-তাই তো! তুমি আল্লাহকে বল...।

তুমি এখন ঘুমাও নিকুন্তিলা। পৃথিবীতে আল্লাহর অনেক কাজ। আমি বললেই—।

মা! শুভ রাত্রি!

একটু পরেই তো ভেজাবি। শুভ আর কী করে হবে!

মা! মা! আজ ভেজাব না। তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে থাক।

ইতোমধ্যে খালামণি এসে গেছে। এই খালামণিটা আবার মায়ের আপন খালার মেয়ে। বেচারির অনেক দুঃখ। মাত্র দু'বছর আগে কার এক্সিডেন্টে ওর বাবা মা আর পুঁচকে দু'ভাই মরে গেছে। খালা নিজে অলৌকিকভাবে বেঁচে গেলেও দীর্ঘদিন অপ্রকৃতিস্থ ছিল। বি.এ পরীক্ষা চলছিল তখন তার। এরপর আর পড়ায় মন দিতে পারে নি। অক্ষরগুলোকে ওর নাকি রক্তের ছোপের মতো লাগে। মাথাটা টাল খেয়ে সব আঁধার হয়ে আসে। এখানে আসার পর সে তার মনপ্রাণ অস্তিত্বের এক বিশাল অংশ করে ফেলেছে নিকুন্তিলাকে। নিকুন্তিলা বিছানা ভেজালে, দুষ্টুমি করতে গিয়ে কিছু ভেঙে ফেললে প্রাণের সমস্ত মমতা দিয়ে সবকিছু সে ম্যানেজ করে নেয়। নিকুন্তিলা বেশির ভাগ সময়ই গড়াতে গড়াতে খালামণির একেবারে বুকের ওপর উঠে হিসু করে দেয়। কাপড় চেঞ্জ করতে করতে ঘুমজাগা খালামণি বলে, নিকু... কাণ্ডটা কী বলত ? আমার শরীরের ওপর তোর কী মনে হয় টয়লেটে এসে বসেছিস!

বিষয়টা তা-না... নিকুন্তিলা দিনের ভাবনায় গভীরভাবে বুঁদ হয়ে বলে, ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখি, বুঝছ খালামণি, প্রায়ই, আমি যেন ঘাসের মধ্যে গড়াচ্ছি, তোমার বুকে এসে শরীরে এত আরাম হয়... মনে হয় শরীরের সব ছেড়ে হালকা হয়ে যাই।

বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখতে এবং তার অদ্ভুত বর্ণনা করতে নিকুন্তিলা ওস্তাদ।

খুব ভোরে উঠে সে টিমটিমে চোখে খালামণিকে ডেকে তোলে, জোরালো কোনো স্বপ্ন দেখলে। খালা... খালামণি— বাবাকে বোয়াল মাছ গিলে ফেলছে। অথবা, খালামণি আমার কান কামড়ে দেবে একটা বিচ্ছুর মতো ফড়িং— আমি দৌড়াচ্ছি কিন্তু খালি পড়ে যাচ্ছি। দিনে তো খালামণি ভালো দৌড়াই, স্বপ্নের মধ্যে দৌড়াতে পারি না কেন ? মাঝে মধ্যে কী ভেবে হেসে কুটিকুটি হয়।

কীরে ? একা একা হাসছিস ?

ওমা! স্বপ্নে যে দেখলাম একটা ইয়া বড় বাঘ খিকখিক করে হাসছে! বলতে বলতে খালামণি মরাজলে ডুব সাঁতার দেয়— আমি চোখ বুজলেই কী দেখি জানিস, মর্গের মধ্যে ঢুকেছি। কালো কালো শুটকির মতোন লাশ... অথবা রক্ত... পেট ফুলে ঢোল হয়ে আছে, অথবা মাছি উড়ছে গুনগুন!

মর্গ কী খালামণি ?

কিসসু না। বাবাকে এই গল্প বলিস না। তার চাইতে চল আমরা স্বর্গের গল্প করি।

স্বর্গের গল্প ? মা যে কী অদ্ভুত ভাষায় সেদিন স্বর্গউদ্যানের কথা বলেছিল... জামরুদ পাথর... নীল জল... ডানাওয়ালা হুরী... কচি কচি বালকের হাতে আঙুরের রস... অত লম্বা

করে কী আর মনে পড়ে ? মা যেন স্বর্গ নয়, কোনো রূপকথা শোনাচ্ছে... যেখানে আলাদীনপ্রদীপ ঘর্ষণ মানেই সোনালি দৈত্য... স্বর্ণ মোহর... টিচার বলেছে, আমি ভাবুক... নিকুন্তিলা আকুল... আচ্ছা! ভাবুক কী ? মা কী সব ইংলিশ থেকে বাংলা করে নিজের মধ্যে আত্মবুঁদ হয়ে থাকে, বাবাতো মাকে বলে, তোমাকে দিয়ে ড্রাইভিং শেখা হবে না। তুমি যা ভাবুক, পাঁচ মিনিটের মাথায় স্ট্রিয়ারিং ঘুরিয়ে ভাবতে ভাবতে এক্কেবারে ট্রাকের তলায়। এর চাইতে নিকুন্তিলা সো প্র্যাকটিক্যাল। ওকে ক্লাস সেভেনে কম্পিউটার... ক্লাস টেনে ড্রাইভিং—। টিচার বলছে ভাবুক... মানে যাতে গাড়ি চালানো চলে না। বাবা বলছে সো প্র্যাকটিক্যাল... আসলে নিকুন্তিলা কী ? তবে সে এখন লজ্জা স্থানগুলো ঢেকে রাখার কিছু কিছু অর্থ বোঝে। সেটা ঠিক ঠিক এক্কেবারে যুক্তি দিয়ে নয়— সে বিদেশী ফিল্মেও দেখেছে, সব খোলা থাকলেও ছেলেমেয়েদের কয়েকটা অংশ ঢাকা থাকে। মা-ই তাকে দেখিয়েছে, বলেছে, আর একটুখানি বড় হলে এ সম্পর্কে তাকে বিস্তারিত বলবে।

এইভাবে একটুখানি করে বেড়ে উঠছে সে। কেষ্টদা যেন মা আর নিকুন্তিলার সব সমাধানের যন্ত্র। কখন মা'র চা লাগবে, নিকুন্তিলা কোন মুহূর্তে কী খাবে, মা'র ইংরেজি বইগুলো পর্যন্ত, কোথায় কোনটা রাখা— সব তার নখদর্পণে। বাবা ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। বাবার বন্ধুগুলো পর্যন্ত বাসায় বাবা আছে কী নেই তার তোয়াক্কা না করেই ওদের বাসায় আসে। বাবার বন্ধু... মারও বন্ধু। মা কখনই কোনো প্রতিবেশীর বাসায় যায় না। কিন্তু কেউ এলে এমন উদাত্ত আহ্বান করে— মাকে কেউ ভুল বোঝে না। কো-এডুকেশনে ইংরেজি সাহিত্যে পাশ করা মা পুরুষদের সাথেই সবচাইতে সহজ।

মা'র সেরা বন্ধু শান্তনু মামা। বিয়ে করে নি, যখন তখন আসে। বাবার বন্ধুর মধ্যে জহির কাকুর সাথে মা'র সখ্য বেশি। একদিন নিকুন্তিলা শোনে শান্তনু মামা মা'র সাথে তার প্রস্টিটিউটে যাওয়ার গপ্পো করছে। মা'র মুখ নির্বিকার, নিকুন্তিলা এঘর ওঘর করছে— মা'র বিকার নেই। নিকুন্তিলা অতসব বোঝে না, তারও বিকার নেই। কিন্তু শান্তনু মামা যখন বলল, মেয়েটার বুকে হাত দিতেই ওর ছিটানো দুধে আমার মুখ ভরে গেল, মেয়েটা আমার পা জড়িয়ে বলল— আমাকে ছাইড়া যাইবেন না, আমার দুধের বাচ্চা, কুনো কাস্টমার আহে না। কিনুন্তিলা থ।

মা'র সাথে বন্ধুত্বের বাইরেও শান্তনু মামার সাথে মা'র অন্য এক গভীর সম্পর্ক আছে। শান্তনু মামার কাছেই মা জীবনের সব খুলতে পারে— অপরাধ, গ্লানি। কী যেন এক গভীর ঋণে মা তার কাছে আবদ্ধ। নিকুন্তিলা এই সম্পর্কটা অত বোঝে না।

রাতে ওপরে ঘুরছে এলোকেশী ছায়া... আর জানালা গলিয়ে আসা চন্দ্র আলোর ঠুমকি... নিকুন্তিলা যেন ডুব সাঁতারে... খালামণি... প্রস্টিটিউড কী ?

কোত্থেকে শুনলি ?

শান্তনু মামা মাকে বলছিল।

মাকেই জিজ্ঞেস করিস।

মাকে নিকুন্তিলা ছুঁতে পারে না। যখন মায়ের জন্য হৃদয় আকুলি মায়ায় সে ছুঁতে চায়... মা যেন শিশির। নিজের মধ্যে নিমগ্নতায় উবে যেতে থাকে। যখন সে পড়ায় কঠিনভাবে নিবিষ্ট, মা তাকে ছোঁ মেরে কোলে নিয়ে বুকে শুইয়ে বলে— অত পড়ে কী হবে ? জানিস নিকু, তুই যখন ওইটুকুন পুঁচকে, যবে হাঁটতে শিখেছিস, আমি তোর পায়ে মল পরাতাম। আমার সবচাইতে প্রিয় ছিল ক্লান্ত হয়ে কিছুক্ষণ পরে পরেই তোকে ডাকা— নিক্কণ... নিক্কণ... তুই কোন দরজা দিয়ে ছুটে আমার কাছে আসছিস, আমি ঠিক টের পেতাম। এসেই তুই নিঃসাড় পড়ে থাকতি আমার বুকে। আমার বুক ভরে যেত। নিক্কণ কী... তোকে আমি ভণ্ডুল... পুঁচকি যাই বলে ডাকতাম... আমার কণ্ঠে তুই টের পেতি, আমি তোকেই ডাকছি। এই এখনো, তোর ফড়িংয়ের মতোন শরীরটাকে জড়িয়ে—।

মা! প্রস্টিটিউট কী ?

পতিতাপল্লী।

পতিতাপল্লী কী ?

এইতো মুশকিল হলো। শরীর বিক্রি কী, সে তো তুই বুঝবি না, এইটাও তোকে আরেকটু বড় হওয়ার জন্য জমিয়ে রাখতে হবে।

এত জমালে মাথাটাই যে আমার ভারি হয়ে যাবে... বুক তো মা লজ্জাস্থান, তুমি বলেছ তোমার বুকের দুধ খেয়েছি আমি দু'বছর অব্দি, শান্তনু মামা...। নিকু মা'র বুক শুঁকতে থাকে।

তুই আড়ি পেতে সব শুনিস নাকি ?

মা'র এই প্রশ্নে নিকুন্তিলা বলে, এই বাড়িতে আবার কারও আড়ি পাততে হয় নাকি ? তুমি যে চিৎকার করে সব গল্প করো! সেদিন বুয়া তো লজ্জায়ই মরে, তুমি নাকি আমাকে পেটে নিয়ে কী করতে সেসব জহির কাকুর সাথে গল্প করেছ। জানো মা, আমি তাকে ধমক দিয়েছি। এতে লজ্জার কী আছে ? মা, বলো না, তোমার পেটে আমি কী করতাম ?

নাচানাচি করতি।

এইটুকু না, বড় করে বলো।

তোর বাবা যেদিন আমার ইউরিন টেস্ট করে কনফার্মড নিউজটা নিয়ে এল, তার আগ পর্যন্ত আমার সাংঘাতিক ভয় হতো, আমার কোনোদিন বাচ্চা হবে না। আর মনে হতো, বাচ্চা না হলে চিরকাল যদি আমাকে নিঃসন্তান থাকতে হয়, আমি আত্মহত্যা করব। মানে, বাচ্চার প্রতি আমি সাংঘাতিক ক্রেজি ছিলাম। প্রথম বছর তোর বাবা বাচ্চা নিতে চায় নি। এ নিয়ে এক গল্প আছে, তোকে বলব পরে। সে চাইতো আমরা চার পাঁচ বছর ফ্রি থাকি, ঘুরি ফিরি— তারপর বাচ্চা। কিছুতেই যখন তাকে এই সিদ্ধান্ত থেকে টলানো যাচ্ছে না, আমি

লুকিয়ে পিল খাওয়া ছেড়ে দিলাম।

পিল খেতে কেন ?

তোকে নিয়ে এই মুশকিল, বয়সের চাইতে বেশি জানতে চাস— যা তোকে হাজার যুক্তিতেও বোঝানো যাবে না। সব বোঝার দরকার নেই। আমি বলে যাই, যতটুকু বুঝিস ততটুকুই নিজের মধ্যে গ্রহণ করিস।

ইউরিন টেস্ট করে কনফার্মড হয়ে বাবা কী করল ?

বিমর্ষ হয়ে পড়ল।

তার মানে আমি পৃথিবীতে আসি, তা বাবা চাইছিল না ?

বললাম তো— এই নিয়ে এক গল্প আছে। তোকে সে চাইছিল। কেবল চাইছিল, তুই আরেকটু পরে আয়। সবে বিয়ে করেছি। তুই আসা মানেই দু'জনের এক সঙ্গে ঘোরা, একটু দু'জন একাকী জীবন কাটানো— এইসব বন্ধ। তোর বাবা খুব রোমান্টিক। আমাকে বিয়ের পর পায়রা বলে ডাকত। বলত, আমার লক্ষ্মী সোনা শাদা পায়রা।

হিঃ হিঃ।

হিঃ হিঃ কী ?

বাবা এসব বলত শুনে খুব হাসি পাচ্ছে। অবশ্য তুমি এত্তো ফরশা... এত্তো সুন্দরী। নিতু, নিকু যেন যমজ, বাবা যখন তোমাকে ডাকে মাঝে মাঝে আমি উত্তর দিয়ে ফেলি, অবশ্য তুমি তোশাদা পায়রা।

থাক, আমাকে আর ফোলাতে হবে না। কিন্তু খবরটা পেয়ে আমার সে-কী আনন্দ! সমুদ্র থেকে ঘুরে এসে একদিন ছাদে খুব বৃষ্টি জানিস, আমি একটা শাদা পায়রার মতোনই মল পরে ছাদে নাচছিলাম। গভীর রাত্তির... চারদিকে কী চমৎকার হলুদ হলুদ বাতির ফুলকি।

তারপর ?

তার আগের কথা বলি বরং— আমরা হানিমুনে যাব ঠিক করেছি, তখন, তোর বাবা আমার জন্য একটা কাতান শাড়ি নিয়ে এল। প্রায় একেবারে মেরুন রঙের। যে-ই শাড়িটা পরেছি— অমনি শাড়ির জমকালো রঙে... বমি... বমি। এখনো আমার পিরিয়ডের ডেট আসে নি। অবশ্য পিরিয়ড কী তুই এক্ষুণি তা বুঝবি না, কিন্তু এইরকম আনকমন গন্ধের বমি আগে আমার হয় নি। কেবল মাথা ঝিমঝিম করে। নিঃসাড় পড়ে থাকি। ওই অবস্থায়ও হানিমুনে সমুদ্রে গেলাম। এরপর তোর পেটে আসার খবর। তারপর তিন মাস যে কী ভয়াবহ— তোকে কী বলব। তোর বাবার ভালো বিজনেস, টাকার অভাব তত ছিল না। কিন্তু টাকা দিয়ে কি সে আমার জিভের রুচি ফেরাতে পারে ? কিচ্ছু খেতে পারতাম না। ভাত, মাছ, মাংস... কিচ্ছু না। যে খাবার জীবনে খেতে পছন্দ করতাম না, সেই কমলার রস, আর লেবু লবণ জুস খেয়ে তিন মাস বেঁচে ছিলাম। মনে হতো, একটা বাচ্চাতে এত কষ্ট ? মা কী করে এত গণ্ডা গণ্ডা বাচ্চা পেটে পুষেছিল! সবচাইতে অবাক যা, তোর ভ্রূণ পেটে আসতেই তোকে মনে হতো জ্যান্ত এক শিশু। আমার পেট কারাগারে বন্দি আছিস।

তোর নয় মাসের জেল হয়েছে। মানে, এমন মায়া, পেটের ভ্রূণ কী করে মানুষ এক দু'মাসে নষ্ট করে এ আমি কল্পনা করতে পারতাম না। নিকু— তুই আমার সেই গর্ভের অমূল্য সম্পদ, যার গায়ের রঙ আমি রঙধনু দিয়ে তৈরি করেছি, চোখ এঁকেছি অর্জুনের তীর দিয়ে— ঠোঁট...।

মা! মা! আমার জন্মের পর মুহূর্তে বাবা কী করল ?

তোর বাবা আধুনিক মানুষ। সে সবচাইতে ভালো ক্লিনিকে ভর্তি করিয়েছিল আমাকে। দেশী বিদেশী মিলিয়ে ডাক্তার নার্স। তোর বাবা বলল, আমার স্ত্রীর বেদনার অংশীদার আমি হতে চাই...। তুই আমার কথা বুঝছিস নিকু ? একটা সন্তান হওয়া অনেক কষ্টের...।

তাতো বটেই... নিকুন্তিলা ঘামতে থাকে— কতবার বলেছ, তোমার পেট কেটে আমাকে বের করতে হয়েছে... তোমার পেটে কত কত কাটার দাগ, সেতো আমি দেখেছিই, কিন্তু বাবা কী করে তোমার বেদনার অংশীদার হলো ?

তোর বাবা বলল... বালুস্রোতে ঢেকে যায় মা'র কণ্ঠ... মা কেন থেমে গেল ? নিকুন্তিলা ভাবে, মা কি আড়ষ্ট বোধ করছে ? কিন্তু মা'র চোখ অমন ঠাণ্ডা যে ? যেন মৃত্যু বাঁশরী তাকে ডাকছে। মা স্তব্ধ! বিমূঢ়। হিম ঠাণ্ডা! নিকুন্তিলা ঝাঁকাতে থাকে, মা, আজ থাক। আমি আরেকটু বড় হলে সব বলো!

না, না, এইটুকু অন্তত শোন। মা বলে, আমার পেটের ব্যথা বাড়ছে, তোর বাবা আমার মাথার কাছে। ডাক্তার এসে পেথেড্রিন দিয়ে গেল। নিকু তুই বুঝবি না, তারপর কী হলো। মনে হলো আমি ঘাঘরা পরে নাচতে নাচতে পরীর দেশে চলে যাচ্ছি... কী নেশা... শরীরটা পাখির শরীরের মতোন হালকা হয়ে গেল। তোর বাবা আমার চুলে আঙুল বোলাচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল, ওমা! এইটুকু ব্যথা ? তাহলে সবাইকে কেন প্যাথিড্রিন দেওয়া হয় না ? সবাই কেন বলে সন্তান জন্মের সময় মৃত্যুর যন্ত্রণা হয় ? আমি যখন ঘোরের মধ্যে তোর বাবার হাত ধরে বলছি, এই তো আমরা ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যানে চলে এসেছি, চলো আমরা নাচি... নাচতে নাচতেই দেখব আমাদের কোলে অলৌকিক এক সন্তান চলে এসেছে। তোর বাবা আমার আঙুল ধরতেই ঘোর কানে শুনি— সিনিয়র ডাক্তার বলছে, মানে সবে সে কেবিনে প্রবেশ করেছে, আমার সেই ঘূর্ণায়মান অবস্থার মধ্যে সে বিষ শেলের মতো ঢুকিয়ে দিল কিছু শব্দ— আরে! এই ব্যথা তো কিচ্ছু না। প্যাথিড্রিন দিয়ে কি গর্ভযন্ত্রণা কমানো যায় ? যখন সত্যিকার ব্যথা উঠবে, তখন তো ও বাবা মা'র নাম ভুলে যাবে!

ভয়ে আমার নিঃশ্বাস আটকে গেল। নিকু... এক্কেবারে প্যাথেড্রিনের নেশা ছুটে গেল! আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম। তোর বাবা আমার ঠোঁটে কপালে চুমো খেয়ে বলল, কিচ্ছু ভয় নেই, এইতো আমি আছি। এদিকে রাত বাড়ছে আর বিষাক্ত ছুরির ঘা দিয়ে দিয়ে বাড়ছে কোমরের পেছনকার ব্যথা, উফ নিকু, কী ভয়ঙ্কর... ডাক্তার বারবার এসে আমাকে চেক করে বলছে, এখনো ওয়ান ফিঙ্গার... সময় হয় নি।

মা! ওয়ান ফিঙ্গার কী ?

চুপ নিকু! শুনে যা কেবল! আমি চিৎকার করে তোর বাবার বুকে কিল-ঘুষি বসাচ্ছি, কেন তুমি আমার পেটে সন্তান দিলে। যাও! এক্ষণ যাও! ডাক্তারকে বল আমাকে দু' টুকরো করে পেট থেকে বাচ্চা বের করে আনতে। তোর বাবা কী করল নিকু! কী ভালো... দৌড়ে তা-ই গেল। যন্ত্রণায় আধ পাগল হয়ে আমি তখন বিষ খুঁজছি, খেয়ে মরে যাই। নার্স, আত্মীয়— কিসসু আমার চোখে পড়ছিল না। স্তব্ধ কানে অপার অপেক্ষা! কখন তোর বাবা আসে! রাত বাড়ছে, সেই প্রতিটি মিনিটের বিষ যন্ত্রণা আমি হাজার দিনের সাথেও মেলাতে পারব না।

মা থেমে যায়!

নিকুন্তিলা ঘেমে একাকার! জ্বলজ্বল চোখে চেয়ে আছে মা'র দিকে। সে ওয়ানে উঠেছে। মা তাকে তালে তালে মুখস্থ করে এদ্দিন ছড়া শিখিয়েছে... কখনো আধো তন্দ্রায় তলিয়ে পড়েছে। ওর জন্মের সময় এত কেন কষ্ট হলো মা'র ? ডাক্তার আগেই কেন পেট কেটে দেখল না ? কিন্তু মা ঢুকে পড়েছে এক যোজনব্যাপী ছায়ার মধ্যে। এখন কিসসু কথা বলা মানে মা'র কথার ধ্যান ভঙ্গ। এটা নিকুন্তিলা জানে। জহির কাকু, শান্তনু মামা বা বাবার সাথে যখন মা আত্মনিমগ্ন হয়ে কথা বলে, যখন কোনো কারণে মা'র কথার সুতো ছিঁড়ে যায়— মা ছুতো ধরে অন্য কাজে চলে যায়।

সন্ধ্যা নামছে। নিকুন্তিলার টিচার আসবে এখন। কিন্তু মা'র এই কথার ঘোর কাটলে সে তো তার জন্মের ইতিহাস আর কোনোদিনও শুনতে পারবে না। অবচেতনেই সে উশখুশ করে— মা! তারপর ?

তোর বাবা এল! আমি উন্মাদের মতোন উঠে বসলাম। ডাক্তার বলছে, টু ফিঙ্গারও হচ্ছে না। আমি তোর বাবাকে আঁকড়ে বললাম! আমার পেট কখন কাটবে ? বাবা বলল, তোমার নরমাল ডেলিভারি, আমি যখন বলব তখনই তো আর প্রফেসার...।

মা ? নরমাল ডেলিভারি কী ?

মা যেন আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তার মুখ ফ্যাকাশে দেখায়। সে বিব্রত হয়ে বলে, কথার স্রোতে কী না কী বলছি! যা হোক, নার্স আমাকে বলছে, জোরে চাপ দিন! আপনার স্টুল বেরোনো দরকার। আমি নার্সের মাথায় বালিশ ছুঁড়ে মারলাম। কী করে চাপ দেব ? এত কঠিন ব্যথা! আমার চাপ দেয়ার শক্তি আছে ? তোর বাবার আদর, চুমো... সব তখন বিষাক্ত। আমি ডাক্তারকে বললাম, আমার পেট কাটা, সন্তানের জন্ম... সবটার সামনেই আমার হাজব্যান্ড থাকবে! তোর বাবার ফর্সা মুখ তখন নীল। সে প্রায় ফুঁপিয়ে উঠেছে... আমিই দায়ী... আমিই দায়ী।

শেষে খুব ভোরে আমাকে ডেলিভারি রুমে নেয়া হলো! তখন বুঝছিস নিকু... আজানের শব্দ হচ্ছিল... এরপরই তুই পৃথিবী কাঁপিয়ে কেঁদে উঠলি... রক্তমাখা তোকে ছুঁয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল তোর বাবা— নিতু, আমাদের মেয়ে হয়েছে!

নিকুন্তিলা আধমড়ার মতোন কাঁপতে থাকে— তোমার পেট কাটা, রক্ত... সব বাবা দেখল ?

দেখল!

মা, এত কষ্ট করে আমাকে জন্ম দেয়ার কী দরকার তোমার ছিল ?

নিকুন্তিলাকে সোহাগে জড়িয়ে মা বলে, সবচাইতে মজার বিষয় কী জানিস, তোর জন্মের কিছু দিন পরেই জন্মের ব্যথা কী জিনিস— আমি ভুলে গিয়েছিলাম! এরকম ভুলে যেতে পারে বলেই গ্রামে-গঞ্জে মহিলাদের গণ্ডায় গণ্ডায় বাচ্চা হয়। বড় অদ্ভুত নিকু!

কলিং বেলের শব্দ।

টিচার এসেছে।

ক্রমশ ক্রমশ নিকুন্তিলা নিজেকে বেশ সাবলম্বী মনে করছে। স্কুলের মাঠে যখন গোল হয়ে গার্জেনরা সাংঘাতিক সব পারিবারিক বিষয় নিয়ে, মানে কাজের লোকের সমস্যা, ওরা গার্মেন্টসমুখী হচ্ছে বলে কী সমস্যায় পড়ছে তারা, অথবা এর ওর বদনাম, কারো প্রশংসা অথবা বেশির ভাগটাই যার যার স্বামীদের স্বভাব নিয়ে কমপ্লেন মুখর— নিকুন্তিলার মনে হয়, এই আড্ডায় মাকে মানায় না। তাকে নিয়ে, স্কুল নিয়ে যে মা পাগল নয়, এ তাকে প্রায় অভিভূতই করে ফেলে। কত গার্জেন সারাক্ষণ টিচারদের সাথে যোগাযোগ রাখছে— তার মেয়ে কী করে। মা এসবের কোনো খোঁজ নিতেই পছন্দ করে না। এই দিক দিয়ে সেরা— বাবা। সে সব সময়ই সচেতন। যখন পেরেন্টস ডে-তে গার্জেনকে ডাকা হয়, তখন খুব কুয়াশা অথবা রক্তলাল ভোরে বাবাকে নিকুন্তিলা সাথে নিয়ে যায়। যাবতীয় নেগেটিভ পজেটিভ শুনে বাবা তাকে মোটেই মানসিক আঘাত করে না। বরং আইসক্রিম দোকানে গিয়ে তাকে আইসক্রিম খাওয়ায়। মা আবার অন্য ধাতের। সারা বছর মেয়ের খোঁজ নেই। বছরে একদিন ইশকুলে আসে। সেটাও বাবার চাপে, রেজাল্টের দিন। কেন অঙ্কে অথবা সমাজে কম নাম্বার পেয়ে নিকুন্তিলা পিছিয়ে গেল এ নিয়ে প্রায় কাঁদতে কাঁদতে ওকে অভিসম্পাত করতে করতে ঘরে ফেরে। মা বলে, আমি তোর ওপর আস্থা রেখে তোর খোঁজ নেই না, তুই আমার বিশ্বাস কেন ভাঙবি ? কেন ? নিকুন্তিলা ফোঁপাতে থাকে— আনকমন প্রশ্ন এসেছিল...। আনকমন প্রশ্ন বলে সবাই সমাজে খারাপ করেছে ? তোকে আমি স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেব বলে তুই পাঠ্য বইয়ের নিচে লুকিয়ে গল্পের বই পড়বি ? আমি তো

চাই পৃথিবীর সব সেরা বই তুই পড়, কিন্তু যখন পড়ার সময়—।

মা, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছ ?

মা তক্ষুণি গলে যায়... নিকু নিকু আমি তোকে একটা উড়তে থাকা গাঙচিল মনে করি। কিন্তু তোর কোনো ব্যর্থতা মানে তোর বাবার কাছে আমার ব্যর্থতা। তুই আমার সম্মান রাখবি না ? এই নিকু, মুখ তোল... শোন— আমি যদি কখনো সমুদ্রের জল হয়ে যাই ? নিকুন্তিলা আরো স্পষ্ট কণ্ঠে বলে— আমি হব সেই জলের মাছ!

এইভাবে নিকুন্তিলার স্কুল জীবন যায়। বাসায় এসে সে দেখে, মা প্রায়ই বিমর্ষ... কী এক কষ্টে বুঁদ হয়ে থাকে নিজের মধ্যে। তখন সে মা'র নিমগ্নতা না ভেঙে কাপড় পাল্টে একা খেতে বসে। মা'র মুড ভালো থাকলে মা তাকে নানা নামে ডাকতে থাকে। সে মা'র বুকের ওপর শুয়ে বান্ধবীদের গল্প করে— মা, ক্লাস টুয়ে উঠার পর চমৎকার এক বান্ধবী হয়েছে। ওদের অনেক ভাই-বোন, অনেক অভাব। জানো মা, সে সব সময় আমার ব্যাগ গুছিয়ে দেয়, পেনসিল শার্প করে দেয়, কিন্তু ওর সমস্যা একটাই— একদম ছাত্রী ভালো না। এই জন্য ওর সাথে কেউ মিশতে চায় না। খারাপ একটা ছাত্রী আমার বন্ধু— বাবাকে বলো না প্লিজ।

তবুও... মা বলে, ভালো ছাত্রীদের সাথে বন্ধুত্ব করা অনেক সুন্দর। তাতে একটা কম্পিটিশনের মনোভাব তৈরি হয়।

তাই বলে ওকে আমি ছেড়ে দেব মা ?

জানালায় বাতাসের সাথে বাতাসের তর্ক যুদ্ধ। মা'র শাদা মেক্‌সি উড়ছে... ঠোঁটে ছিটকিনি এঁটে নিকুন্তিলা মাথা নত করে থাকে। মা বলে, ও তোমার প্রাণের বন্ধু হয়েছে, এ বিষয়ে আমার আপত্তি নেই। তুমি ক্লাসে বন্ধুর সংখ্যা আরো বাড়াও। সব রকম মানুষের সাথেই জীবনে চলে দেখতে হয়! বুঝছো নিকু সোনা আমি কী বলছি, যেহেতু বিষয়টা স্কুল— রেজাল্টটা ভালো হওয়া জরুরি।

নিকুন্তিলা বিমর্ষ বোধ করে। মাকে সে এই জায়গাটায় এসে বুঝতে পারে না। রাত্তিরে বাবা এলে নিকুন্তিলা বাবার কোল ঘেঁষে সেই ছাত্রীর প্রসঙ্গটা নিজেই তোলে। কেন জানি ওই ছাত্রী, নাম অজন্তা, ওর মায়াবী মুখটা এবং মা'র বলা কথার খচ্ ওকে এলোমেলো করে দেয়। বাবা ওকে আনন্দে উদ্ভাসিত করে দিয়ে বলে, যেহেতু ওকে তুমি ভালোবাস, ওরও তো একজন ভালো ছাত্রীর সাথে মেশা দরকার। তুমি ওকে সাহায্য করে, বুঝিয়ে তোমার সমান করে তোল। খালামণির বুক ঘেঁষে লুকিয়ে নিকুন্তিলা ওপর দিকে চেয়ে অনুভব করে আঁধার থেকে ঝুরঝুর করে আলোর জরি পড়ছে। সাথে বিমূঢ় বিস্ময় বোধ— অথচ এই কথাটা বলা স্বাভাবিক ছিল মা'রই। মা-কেও আর এই জায়গায় এসে ছুঁতে পারে না। সে

খালামণির বুকের ওমে মুখ ঢোকায়। তার মনে পড়ছে প্লেনে চড়ে নেপালে যাওয়ার দৃশ্য। সাফারি... যেখানে স্বাধীন ঘুরে বেড়াচ্ছে বাঘ সিংহের দল। পোখরা... আহ্ ? হিমালয়ের চুঁড়ো। সূর্যের লাল ওমে যেন আইসক্রিমের মতো গলে পড়ছে বরফগুলো। মাংকিটেম্পল... গাছে গাছে অবাধ বানরের নাচানাচি... আর সিঁড়ি... যেন আকাশে উঠে গেছে। কখনো হেঁটে, কখনো বাবা অথবা শান্তনু মামার কোলে চেপে উঠছে তো উঠছেই। দু'পাশে কালো কালো ছায়ামূর্তি, ভোজালির সম্ভার। এক সিঁড়ি শেষ হয় তো আরেক সিঁড়ির দরজা খুলে যায়। মা নিকুন্তিলার হাত চেপে বলে... ক্লান্তি নেই নিকু... এই উঠায় কী নেশা...। ওরা যেন সিঁড়ি নয়, স্বর্গের পথ ধরে উঠছিল। নেশা! নিকুন্তিলা ক্লান্তিতে ঢলে পড়লে তেমনই বোধ করছিল। কেবল ভাষাটা খুঁজে পাচ্ছিল না। এই সিঁড়ির মাথায় উঠে কী দেখবে সে ? কঠিন শীত। বাবা কষে নিকুন্তিলার গলায় মাফলার বেঁধে বলছিল— চল্ একটু জিরিয়ে নেই।

সবার মুখ থেকে ক্ষীণ ধোঁয়া বের হচ্ছিল। বাবা দু'হাতে হাত ঘষে যেন আগুন বের করতে চাইছিল।

কিছুক্ষণ বসে পায়ে টাটানি ধরে গেছিল। ফের চলা। আশেপাশে অনেক টুরিস্ট নানা ভিউ থেকে ছবি তুলছে। বিস্তৃত সিঁড়িতে বসে নিকুন্তিলা, ছবির জন্য পোজ দেয়। মা ছবি তুলে দিয়ে ওর ছোট আঙুলটায় ধরে। ফের ওঠা। অনেক ওপরে উঠে দেখে ইয়াব্বাহ্ ? এ যেন রূপকথার জগৎ। স্বর্ণখচিত বিশাল বুদ্ধের মূর্তি। আর পাহাড়ের মতো মস্ত সোনালি ঘণ্টা। চারপাশটাকে মনে হচ্ছিল কুয়াশার মতো স্বপ্নপুরী। মস্ত আকাশটা মাথার কাছে চলে এসেছে।

নিকুন্তিলার চোখে ঘুম ঢুলুনি আসে, বিছানায় আজ খালার বুক খোলা মেক্সির ভেতর হাত রেখে সে অনুভব করে যেভাবে প্লেনের মাঝখান দিয়ে মেঘগুলো পিছলে যাচ্ছিল, তার হাতও পিছলে যাচ্ছে। মা'র কথা অস্পষ্ট কানে ভাসে— আমার বুক কত সুন্দর ছিল, তুই বানরের মতো ঝুলে ঝুলে দুধ খেয়ে নষ্ট করে দিয়েছিস। তোর নতুন উঠা দাঁত কামড়ে অস্থির হয়ে ক'দিন আমি তোর ন্যাংটো পাছায় থাপ্পর দিয়েছি।

মা! মা! আই লাভ য়্যু।

নিকুন্তিলা ঘুমিয়ে পড়ে।

স্কুল থেকে ফিরে নিকুন্তিলা একদিন সাংঘাতিক ভাবিত। খালামণি বলে, কী হয়েছে রে ? নিকুন্তিলা আরো গম্ভীর। শেষে বলে, খালামণি ইসকুলের গার্জেনরা বলছিল কার যেন নরমাল ডেলিভারি হয়েছে। বলছিল, ভাগ্যিস সিজারিয়ান হয় নি। নরমাল আর সিজারিয়ান কী ? খালামণি বিপাকে পড়ে, সব তোর এই বয়সেই জানতে হবে ?

সব বুঝি আমার বড় হওয়ার জন্য তোলা থাকবে ?

এই বয়সে যা বুঝবি না, তা বলে কী লাভ বল ? চল্ তোকে ভাত খাইয়ে দেই।

মা বলছিল তার অপারেশন করে আমি হয়েছি। ডাক্তাররা সেটা করেছে। বিড়াল, বাঘ, হরিণ ওদের কী করে বাচ্চা হয় ? ওদের অপারেশন কে করে ? খালামণি এইবার হতভম্ব। নিজেকে সামলে নিতেও তার সময় লাগে না। সে খানিক ভেবে বলে, ওদের যখন বাচ্চা হওয়ার সময় হয়, তখন ওদের পেট আপনা আপনি ফাঁক হয়ে বাচ্চাটা বেরিয়ে আসে। এরপর আবার পেট জোড়া লেগে যায়। জীবজন্তুর ব্যাপার তো, ওদের সব বিষয় মানুষের মতন হবে নাকি ?

নিকুন্তিলা গভীর পড়াশোনায় ডুবে যায়। বাবা রাত্তিরে ওর জন্য নানা মজার খাবার নিয়ে ফেরে। মা বাবা দু'জনের ভাব সাংঘাতিক। কিন্তু বাবার ড্রিংক করাটা মা একদম সহ্য করতে পারে না। ঢাকা ক্লাব থেকে বাবা ফিরলে নিকুন্তিলা যাতে টের না পায়, মা সেরকম ঝাঁঝে কুঁকড়ে ওঠে। কেন প্রতিদিন এসব খাও ?

আশ্চর্য! তোমার বাবাও তো প্রতিদিন খায়। ছোটবেলা থেকে তাই দেখে বড় হয়েছ তুমি।

বাবার খাওয়াটাও আমি পছন্দ করতাম না।

মদ খেয়ে আমি উল্টাপাল্টা কিছু করি ? ভদ্রলোকের মতোন ঘরে ফিরি।

তুমি মুখের কাছে এলে তোমার মুখের গন্ধটা আমি একদম নিতে পারি না।

মদ খেয়ে তোমার বাবা তোমাকে আদর করে নি ?

যুক্তি তো বেশ জানো। আমি বাবাকে তখন আদর করতে দিতাম না। বাবা তাই রাতে কখনো আমাকে আদর করত না।

যাও, কাল থেকে লাঞ্চ টাইমে এসে আমি তোমাকে আদর করে যাব। রাতে আর করব না।

অসভ্য! শয়তান!

এরপর দুজনের নিঃশব্দ হুটোছুটি। খালামণিকে জড়িয়ে অজানা লজ্জায় শিউরে উঠতে থাকে নিকুন্তলা। চরকির মতো পাক খায় রাত্রি। স্নায়ুর সাথে তরঙ্গের বিভ্রম— বাবা মা কী করছে ? এই রকম হিসহিস শব্দ হচ্ছে যে ? সে তো ভিডিওতে অথবা চ্যানেল টিপলে দেখেছে, পুরুষ মহিলার জড়াজড়ি, আদর— বাবা মা কি তাই করছে ? বাবার মায়াবী ঝাঁকড়া চুলে ঢাকা নির্মল মুখটা মনে পড়ে। ধ্যাৎ! জীবনেও বাবা ওদের মতো অত অসভ্য নয়! তবে যে আদরের কথা বলল ? অবশ্য বাবা তো মাকে আদর করেই। অফিস যাওয়ার পথে ঘুমন্ত মা'র মুখে চুমো খেয়ে যায়। কোনো গিফ্‌ট দিলে মা প্রকাশ্যেই থ্যাংকস বলে বাবার গালে চুমো খায়। তাহলে ? হয়তো বাবা-মা মজা করে দৌড়াদৌড়ি খেলছে। ছোটরা খেলতে পারলে বড়রা খেলতে পারবে না কেন ? ঝাপসা মনে পড়ে, সে যখন আরো পুঁচকে, রাতে খালামণি মার মতোন একটা গল্প ধরেছিল— এক দেশে ছিল এক রাক্ষস! সেই রাক্ষস জঙ্গলে থাকত। রাত্রে বেরিয়ে গ্রাম থেকে মানুষ ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে কুড়মুড় করে খেতো। একদিন নিকুন্তিলার বাবা গ্রামে বেড়াতে গেছে... খালামণি থেমে

যায়। নিকুন্তিলা শক্ত হয়ে ওঠে। বৃষ্টি পতন শুরু হয়। হাওয়ার ঝাপটে জানালার পাল্লা কাঁপছে। খালামণি দৌড়ে জানালা বন্ধ করতে যায়। বাবা গেছে রাক্ষসের গ্রামে ? হায়! বাবার কী হবে ? নিকুন্তিলার ওষ্ঠের ভাঁজে থরথর কম্পন। হাওয়ার বেগ বাড়ছে। নিকুন্তিলার চামড়ার ভাঁজ ভাঁজ ভয় তত গাঢ় হচ্ছে।

খালামণি এসে চুপচাপ শুয়ে পড়ে।

খালামণি ? বাবার কী হলো ?

রাক্ষস তোর বাবাকে ধরে নিয়ে গেল অন্ধকার জঙ্গলে। যখন তোর বাবা চিৎকার করে কাঁদছে— রাক্ষস আমাকে খেয়ো না, আমার মেয়ে আমাকে ছাড়া বাঁচবে না— রাক্ষস কি তার কথা শোনে ? বলে, হাঃ হাঃ, শহুরে মানুষ খেতে কেমন আজ তা টেস্ট করব। বলে রাক্ষস মস্ত হাঁ করে...।

চারপাশে বৃষ্টিপাতময় ছায়া নাচের ঢেউ। খালা হাই তুলে বলে, বাকিটা কাল বলব। আজ বড্ড ঘুম পাচ্ছে রে...।

সেই শীতের আবিলতা ছিঁড়ে নিকুন্তিলা প্রায় চিৎকার করে ওঠে— বাবাকে রাক্ষস খেয়ে ফেলল ? খালামণি বলো... বলো...।

খালামণি রসিয়ে বলে, রাক্ষস মস্ত হাত দিয়ে যেই তোর বাবাকে মুখে তুলেছে অমনি বীর নিকুন্তিলা তলোয়ার হাতে এগিয়ে এল।

নিকুন্তিলার বুকের বরফ হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

খালামণি বলে, নিকুন্তিলা চিল্লিয়ে ওঠে, তবেরে রাক্ষসের বাচ্চা, আমার বাবাকে খাবি ? দেখাচ্ছি মজা! বলে একেবারে রাক্ষসের পেটে ছুরি বসিয়ে দেয়। আকাশ ফাটা গর্জন করতে করতে রাক্ষস মরে যায়। গ্রামবাসী হৈচৈ করে বলে, ভাগ্যিস নিকু সোনা ছিল।

নিকুন্তিলা এর পরের লাইন বলে দেয়— নইলে কী যে হতো! এইরকম হাজার গল্প সে তার বুঝে উঠার বয়স থেকে শুনে এসেছে। কঠিন সব মুহূর্তে বীর নিকুন্তিলা এসে সবাইকে বাঁচিয়ে দেয়।

মা এরকম গল্প নাকি প্রায়ই বলত। নিকুন্তিলার সেই কুট্টি বয়সে। মা যখন বলত, অজগরটা তোর মাকে গিলতে আসছে— বলে খালামণির মতোই থেমে থাকত, নিকুন্তলা নাকি চিৎকার করতে থাকত, মা মা বীর নিকু সোনা কোথায় ? মা তেমনই টেনে বলত— তক্ষুণি নিকু সোনা পিস্তল নিয়ে এসে হাজির। অজগরের মাথা বরাবর গুলি ছুঁড়ে...। সব শেষে সব গল্পের এক সমাপ্তি— ভাগ্যিস নিকু সোনা ছিল, নইলে কী যে হতো! আজ খালার বলা গল্পটা ঝাপসা ঝাপসা মনে পড়ছে। আজ রাত্তিরেও বৃষ্টি হচ্ছে। অজন্তার মুখটা বেশ মনে পড়ছে। দু'জন এক কম্বলের নিচে যদি কয়েক রাত ঘুমোনো যেত ? আচ্ছা ? সাপেরও পেট ফেটে বাচ্চা হয় ? না, সাপ তো ডিম পাড়ে। মুরগি যে ওম দিয়ে বাচ্চা ফোটায় ? সেগুলো পেটের নয় ?

ধ্যাৎ! কবে যে বড় হব!

নিকুন্তিলা খালামণির সাথে ফিশিং গেইম খেলে, টিচার, ছাত্রীদের মাঝখানে খানিক খানিক অজন্তার স্পর্শ নিয়ে, মা'র আধো আদর আধো অজানা নিস্তব্ধতায়, প্রচুর ছড়াগান শুনে... বাবুরাম সাপুড়ে... কোথা যাস...। প্রচুর পড়াশোনার চাপে হাঁপিয়ে, মাঝেমধ্যে নানার বাসায় গিয়ে দু'একদিন থেকে এসে, বাবার প্রগাঢ় চুম্বনের মধ্যে বড় হতে থাকে। মা'র সেই এক রুটিন। রাত্তির জেগে হয় পড়া নয় অনুবাদ করা। সেদিন নিকুন্তিলাকে মা বলছিল, আমি মার্কেজের 'ক্রনিক্যাল অফ এ ডেথ ফোর টোল' বইটা অনুবাদ করছি। সাংঘাতিক কঠিন বুঝলি নিকু। তোকে কী করে বোঝাই, এই উপন্যাসের নায়ক সান্তিয়াগো নাসার একদিন স্বপ্নে দেখে সে ফুলের বাগান ধরে হাঁটছে। পাখিরা তার মাথায় বিষ্ঠা ফেলছে। ওর মা বলে, এটা খুব বাজে স্বপ্ন। পরবর্তীতে সে বেশ রমণীবাজ হয়ে ওঠে। একদিন এক ভদ্রলোকের সাথে এক মেয়ের বিয়ে হয়, বিয়ের রাতে লোকটা টের পায়, মেয়েটা কুমারী না। ওই লোক মেয়েটাকে ওর দু'ভাইয়ের কাছে ফেলে রেখে যায়। ভাইদের চাপের মুখে সেই মেয়ে বলে, তার সতীত্ব নষ্ট করেছে সান্তিয়াগো নাসার। বুঝলি নিকু, সারা উপন্যাসে কোথাও উল্লেখ নেই, আদৌ নাসারের সাথে মেয়েটির সম্পর্ক হয়েছিল কি না। কিন্তু সে যেহেতু মেয়ে পটাতে ওস্তাদ ছিল, সবাই তাকে দোষী ধরে নেয়। উপন্যাসের শেষটা মর্মান্তিক, ওকে দুই ভাই মিলে খুন করছে... পাড়ার লোক গোল হয়ে সেই দৃশ্য দেখছে, এই থিমের সাথে সাথে মার্কেজের জাদুকরি ভাষার বর্ণনা! কীরে নিকু, চোখ গোল কেন ? সতীত্ব, কুমারী এইসব বুঝছিস না তো ? সব না বুঝলেও আপাতত চলবে, আমি অল্প বয়সেই হলে গিয়ে সিরিয়াস ছবি দেখতাম। সব দর্শক উঠে গেলে নিজেকে নিজের কাছেই সিরিয়াস প্রমাণ করার জন্য বোর ফিল করতে করতেও শেষ পর্যন্ত বসে থাকতাম। এখন সেই সব ছবি নিয়ে ভাবতে গেলে অবাক লাগে, অজান্তে কতকিছুই যে ঢুকে গেছে বোধে, মগজে। যতটুকু বুঝলি নিকু, ততটুকুই লাভ। তারপরও অনুবাদের নেশাই আলাদা। আমাদের এখানে ক'জন ইংরেজি জানে বল ? বিশ্বসাহিত্যকে তাদের সামনে এনে দিতে হবে না ?

কিন্তু মা, তুমি তো বই করছ না।

আরে! সবে হাত পাকাচ্ছি। নিজের ওপর আস্থা এলেই বইয়ে হাত দেব। এরপর মা মার্কেজের কীসব জটিল কাহিনী বলে। মাথামুণ্ডু কিস্‌সু না বুঝে নিকুন্তিলা বিমর্ষ কণ্ঠে বলে, মা, আমার জানো অনেক দুঃখ।

সে কী রে! তোর আবার দুঃখ কী ?

আমি তোমাকে একদম বুঝি না।

মা আবার সেই আঁধারের শাখাবিশাখায় ছড়িয়ে পড়ে। নিকুন্তিলাকে কোলে নেয়, আবার

যেন মা'র কোলে কেউ নেই— এমন আবছা করে বলে— আমার ছিল এক রাজপুত্র। বিজন বনের গহনে সে হারিয়ে গেছে। মা'র চোখ জলে ভরে ওঠে। তক্ষুণি ফোন বেজে ওঠে। নিকুন্তিলাকে কোল থেকে প্রায় ফেলে দিয়ে মা প্রতিদিনের মতনই ফোন রিসিভ করতে যায়। এবং সব দিনের মতনই হতাশায় ঢলে পড়তে পড়তে একদিন একে একদিন ওকে বলে— ও, আপনি ? কেমন আছেন ?

নিকুন্তিলা ফের মাকে ছুঁতে চায়, তোমার রাজপুত্র তো আছেই, আমার বাবা।

ও-তো যুধিষ্ঠির। আমাকে ছেড়ে অর্জুন চলে গেছে।

নাহ্! মাকে বোঝে অত সাধ্য নিকুন্তিলার নেই। তার চাইতে অজন্তার সাথে ফোনে কথা বলা যাক। ক্লাসে কোন টিচার কী ভঙ্গিতে কথা বলছে এ নিয়ে যখন দু'বান্ধবী হেসে কুটিকুটি, মা গম্ভীর কণ্ঠে বলে, ফোন অত বিজি রেখো না। আমার ফোন আসবে। মা দিনের পর দিন কার ফোনের অপেক্ষা করে ? কখনো নির্জনে কাঁদে। বাবা এলে চোখে কাজল মেখে ফের ডুবে যায় হাসির গড্ডালিকায়, আজকেও শু মুত খেয়ে এসেছ ?

মহান অ্যালকোহলকে কেউ শু মুত বললে আমি তার...।

কী ?

কিচ্ছু না! বাবা সিগ্রেটে রিং তৈরি করে। বুঝলে নিতু, নিকুকে আমি বিয়ে দেব না।

লকেট বানিয়ে গলায় বেঁধে রাখবে ?

একটাই সন্তান, তা-ই রাখব।

দীর্ঘনিঃশ্বাসের অতলে মা তলিয়ে যায়। এরপর বাবার প্রেমজ কণ্ঠে নিকুন্তিলার আড়ষ্ট হাত পা জমে যেতে থাকে, আজকে এক্সারসাইজ হবে না ?

মা যেন অন্যমনস্ক— মানে ?

আহা! শিশু যেন। এই যেমন হুটপুটি, চটপটি, চুমু, ঝুমঝুমু.. আদর আর...।

ধ্যাৎ! মা বাবাকে এমন ধাক্কা দেয়, বিছানা গড়িয়ে বাবা মেঝেতে... অতঃপর মা'র হিঃ হিঃ হিঃ।

একদিন নিকুন্তিলা যখন দুপুর তন্দ্রায়, স্বপ্নে দেখছে একটা বাজপাখি মুখে সোনার লকেট নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে, আকাশে অনেক রোদ্দুর, পাখির ডানা দুটো ধুয়ে যাচ্ছে সেই রঙে... তখন একটি ফোন আসে। মা রিসিভ করে ফোনে কী একটা শব্দ পেয়ে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, নিশ্চয়ই সে করেছে... নিকুন্তিলার ঘুম ছুটে যায়!

কী ? আমেরিকা থেকে ? মা'র মুখ ছাই হয়ে যায়, ইউসুফ তো এই সময় বাসায় থাকে না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাত এগারোটায় করলে পাবেন। জ্বি। ভালো আছি। জ্বি... ফোন রেখে মা বাঁকাচোড়া হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকে। নাহ্। জীবনেও ও ফোন করবে না... বিড়বিড় করতে করতে চাবি দিয়ে টান দিয়ে বারের পাল্লা খুলে একটা লাল বোতল এনে ঢেলে দেয় গ্লাসের মধ্যে। বেশির ভাগ মদ, অল্প পানিতে গ্লাসটা ভরে গেলে নাক চেপে জীবনে প্রথম মা ঢকঢক করে তা গলায় ঢেলে দেয়। ভয়ে নিকুন্তিলা মেঘপুঞ্জের মতো জড়ো হয়ে যায়। তীব্র ঝাঁঝ সামলাতে মা প্লেন জল গলায় ঢেলে ফের ঢালে হুইস্কি। মা'র ভেতর ঠেলে বমি উঠছে। মা কী এক চাপা ক্রোধে সেই বমি বুক চেপে গলায় আটকে রাখে।

স্তব্ধ দুপুর খানখান করে নিকুন্তিলা চেঁচিয়ে ওঠে— খালামণি! মা তখন উবু হয়ে মেঝেতে ধুঁকছে। খালামণি এসে এই কাণ্ড দেখে বোতল ছিনিয়ে নেয়। তুমি কি পাগল হয়েছ নিতু বু? মা রক্তচক্ষু করে চেয়ে থাকে খালার দিকে। খালামণি নিকুন্তিলার হাত ধরে ঘর থেকে বের হতে নিলে মা বাজপাখির মতো ওকে আঁকড়ে ধরে— ওকে নিবি না! নিবি না!

এরপর ভীতু নিকুন্তিলাকে বুকে চেপে জড়ানো কণ্ঠে মা হাসতে থাকে। একটু টেস্ট করে দেখলাম, ইউসুফ এতে কী মজা পায়। আরে! ভারি মজার তো! মনে হচ্ছে আমি একটা পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। এই তো আমার নিকু সোনা... বুঝলি, আমি চেয়েছিলাম অনেক অনেক সন্তানে আমার ঘর ভরে যাবে। কিন্তু ডাক্তারটা কী পাজি। নিকুর জন্মের কিছুদিন পরই বলল আপনার জরায়ুতে টিউমার। পুরো জরায়ুটা কেটে ফেলে দিল। খালামণি হিসহিস করে ওঠে— একটা বাচ্চাই পালতে পারো না!

হিঃ হিঃ... একটা বলেই তো পারি না। ওকে ছুঁতে গেলেই অনেক অনুতাপ, অনেক হারানো মানুষ... ওকে ছুঁতে গেলে অমৃত... বিষ... আহ্? আমার বুকটা জ্বলে যাচ্ছে...। ইউসুফ! ইউসুফ... তুমি আমার বুকের সবটুকু কষ্ট এক চুমুকে গিলে ফেল!

রাত্তিরে খালামণির বুকের ওপর চড়ে বসে নিকুন্তিলা। এখন যে প্রশ্ন করব, তুমি বলতে পারবে না, বড় হলে এর উত্তর পাব। বাতির আলোয় অস্পষ্ট খালামণির ফ্যাকাশে মুখ— তোর মা'র কীসের কষ্ট, কার ফোনের জন্য অপেক্ষা করে তোর মা, এই তো?

হ্যাঁ।

আমি এর উত্তর জানি না।

তুমি মিথ্যে বলছ।

আহ্ নিকু... খালামণি এই প্রথম একটা কষে ধমক লাগায় নিকুন্তলাকে, তুই কাছ থেকে তোর মাকে যতটুকু জানিস, তার চাইতে আমি কী করে বেশি জানব! এ-ও আমার অজানা এক রহস্য।

বাবা এসব জানে?

মনে হয় না।

বাবাকে বলে দেব?

তাতে তোর বাবা মা'র মধ্যে অশান্তি হবে, এইটুকুই বুঝি... খালার কণ্ঠ ভারী হয়ে ওঠে,

নিশ্চয়ই তুই তা চাইবি না। পৃথিবীর আমরা কতটুকু জানি ? কী করে পৃথিবীর জন্ম হলো ? কেন পৃথিবীর কোটি মানুষের চেহারা একরকম নয়। কী করে সূর্য ওঠে, বৃক্ষ থেকে ফুল, ফল হয়— কতটুকু জানি ? সব জানার কী দরকার ? নেতিয়ে পড়ে নিকুন্তিলা— কিন্তু বাবার পাশে বসলে যে মা'র সব দুঃখ ঘুচে যায়, সেই মা'র দুঃখ আমি কেন ঘোচাতে পারি না ?

তোর বাবা তো দেবতা। তার কথা আলাদা। তবুও বলি, যে মানুষের পাশে বসলেও তাকে কেন্দ্র করে দুঃখ মোচে না, যার সামনে প্রকাশ করা যায় নিজের কান্না, সে-ই মানুষের সবচাইতে প্রাণের। আনন্দ কখনোই দীর্ঘস্থায়ী নয়।

কিসসু না বুঝে নিকুন্তিলা একাকী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শোনে, বাবা মাকে বলছে, এভাবে খাওয়ার কী দরকার ছিল। আমার কাছে চাইলেই আমি তোমাকে দিতাম।

এরপর চাইলে দেবে ? মা'র চড়ানো কণ্ঠ।

তুমি তো এটা সহ্য করতে পার না।

এখন পারি, দেবে ?

কেন দেব না ? আমি যা পছন্দ করি, তা পছন্দ করার তোমারও সমান অধিকার রয়েছে। পছন্দ করে খাও, আপত্তি নেই, কিন্তু নিজের ওপর জেদ করে খেলে খাওয়ার যন্ত্রণা বাড়ে, আনন্দ নষ্ট হয়।

সেই থেকে মা'রও শুরু।

বাবা প্রায়ই ঢাকা ক্লাব বাদ দিয়ে সন্ধ্যায় বাসায় চলে এসে মা'র সাথে এলকোহল খেতে বসে। প্রথম প্রথম এলকোহল খেয়ে মা খুব সত্যবাদী হয়ে উঠত। বাবার নানা বিচ্যুতির সমালোচনা করত। মা নিজের প্রবণতার তুলনায় হয়ে উঠত অধিক সাহসী। বাবাকে বলত, মানুষ একজন স্ত্রী বা একজন স্বামীর সাথে কী করে সারা জীবন পার করে ? চাল ডাল নুন মরিচ, গাড়ি, একই ঘর একই বিছানা— কী করে দু'জন সারা জীবন রোমাঞ্চিত হয় ? বাবা ক্ষেপে উঠত, তুমি মানুষের বিবর্তনে বিশ্বাস করবে না ? মনুষ্য সমাজের সভ্যতায় বিশ্বাস করবে না ? একসঙ্গে থাকার মধ্যে কিছু পবিত্র দায়বদ্ধতা থাকে, যা কেবল মানুষই সৃষ্টি করতে পারে। পশুদের পক্ষে সেটা সম্ভব না। যে দিন মানুষের প্রথম স্পর্শ, প্রথম চুম্বন— সেই স্পর্শের যা আনন্দ, তা সারা জীবন এক রকম থাকবে ? মানুষই ক্লান্ত হয়। সেই জন্য তাদের মাঝখানে আসে সন্তান, সেই সন্তানকে কেন্দ্র করে দু'জন মানুষের শুরু হয় আরেক জীবন, একই ঘর, একই জীবন— কী করে তখন তা একই থাকে ?

তোমাকে আমার একঘেয়ে লাগে।

জাহান্নামে যাও... যাও, দশ পুরুষের সাথে সম্পর্ক কর গিয়ে— বাবা লাফ দিয়ে ওঠে— ধুর

তোমার সাথে একসঙ্গে খাওয়ার কোনো মজা নেই। মদ খেলে তোমার মাথায় ভূত চাপে। তুমি এটার আনন্দ নিতে পার না।

এরপর বাবা ফের পুরোদমে ঢাকা ক্লাবে। মা একাকী বার থেকে ঢেলে খায়, হালকা ছন্দে ঘুরে নাচতে নাচতে জলজ কণ্ঠে ডাকে— নিকু... নিকুউউ...। মা নিকুন্তিলাকে গহীন ভয়ে ঢুকিয়ে বলে, কাল ভোরে দেখবি ঠিক এই ঘরটার সিলিং ফ্যানে আমার লাশ ঝুলছে। নিকুন্তিলা একা। ঘর থেকে ওকে বের করে দিয়ে মা সব দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। খালামণি ফের তার দাদা বাড়িতে।

নিকুন্তিলার শোকাতুর মুহূর্ত তীব্র ভয়ে খানখান হয়ে ওঠে— কেষ্টদা! কেষ্টদা! মাকে বাঁচাও।

দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা। মিউজিকের তালে তালে মা একবার দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাচ্ছে। একবার নেভাচ্ছে। নীল বাতির ঘরে জানালা দিয়ে স্পষ্ট তাকায় কেষ্টদা... খালা খালা...। মা'র মুখ সেই আলোয় কখনো প্রথম চুমুক না দেয়া ধোঁয়া ওঠা চায়ের মতো গনগনে... নিভে গেলে ভুলে ফেলে রাখা জুরিয়ে যাওয়া চায়ে চুমুক দেয়া বিস্বাদের মতো। মা অমন শাদা ঘাঘড়া পরেছে কেন ? মা! মা! চিৎকার করে ওঠে নিকুন্তিলা।

দরজা খুলে দিয়ে মা ঢলে পড়ে বিছানায়। বিড়বিড় করে নিকুন্তিলাকে বলে— তোকে একা বাঁচতে হবে!

সারা রাত সে-কী অসহ্য ভয় নিকুন্তিলার। পরদিন ভোরে ইসকুল। বাবা বিজনেসের কাজে দেশের বাইরে। এক সপ্তাহ পর আসবে। কেষ্টদা নিকুন্তিলার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, কিচ্ছু হবে না নিকু সোনা, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো।

তন্দ্রার মধ্যে নিকুন্তিলা দেখে, মা'র দেহটা সিলিং ফ্যানে ঝুলছে। তাকে চারপাশ থেকে খামচে ধরে রাবণের নখ... নিকুন্তিলাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেই রাক্ষস। সে ভয়ে ভয়ে মা'র দরজায় উঁকি দেয়। ফের গলায় বরফ আটকে যাওয়ার দশা। মা'র দেহটা বিছানায় এমনভাবে পড়ে আছে, যেন-বা মা মৃত। নিকুন্তিলার গলা বেয়ে তেতো ফেনা ওঠে। সে হরর ছবির নায়িকার মতো কম্পিত পা ফেলে মা'র ঘরে যায়। এখন যদি গিয়ে দেখে মা'র শরীরটা মাঘের শীতের মতো ঠাণ্ডা! তার সারা শরীরে থর কাঁপুনি। কেন মা এসব খাওয়া শিখল! বাবা খেয়ে তো এমন করে না ? মা'র কী দুঃখ ? কাঁপতে কাঁপতে বাতি জ্বালিয়ে সে মা'র নিঃশ্বাসের কাছে যায়।

তার বুকে ফের উষ্ণ জল ফিরে আসে।

অনেক কষ্টে মাকে ঠিক মতো শুইয়ে সে লেপ দিয়ে মা'র দেহটা ঢেকে দেয়। মা ঘুমের মধ্যে যেন বলে— আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যাব না নিকু।

কিন্তু দিনে দিনে মা'র বিকার বাড়ছে। বাবারও বাড়ছে ঢাকার বাইরে যাওয়ার ব্যস্ততা। দিনে মা এত সহজ, সন্ধ্যার মানুষটার সাথে মেলানো যায় না। নিকুন্তলাকে নিয়ে চাইনিজ খেতে যায়। সমুদ্রে যাওয়ার গল্প বলে। অনুবাদের কাজ প্রায় বন্ধ। একদিন কোত্থেকে এক ভদ্রমহিলা ফোন করে বাবাকে চায়, বলে, সে বাবার বান্ধবী। মা বলে, বন্ধু হয়ে এইটুকু

খবর জানেন না এই মুহূর্তে আপনার বন্ধুটি কোথায় আছে ? শেষে মা সহজ কণ্ঠে হেসে মহিলাকে বাসায় আসার আমন্ত্রণ জানায়।

নিকুন্তিলা অবাক— বাবার বান্ধবী ?

হতে পারে না ? মা ছুরি দিয়ে পাউরুটিতে মাখন মাখে, অজন্তা তোর বন্ধু না ? জহির, শান্তনু ওরা আমার বন্ধু না ? বন্ধু খুব ভালো ব্যাপার। কিন্তু নিকুন্তিলার শান্তি হয় না। রাত রাত সে ভাবে— বাবা যদি ওই মহিলাকে বিয়ে করে ? মা শান্তনু মামা, অথবা জহির কাকুকে ?

প্রকাণ্ড পৃথিবীর নিচের ঘাসবৃন্দের ওপর নিকুন্তিলা নিজেকে একাকী দেখতে পায়। সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

মাঝখানে বাতি।

তার ওপাশে মায়ের মুখ কখনো স্পষ্ট, কখনো তামাটে, আবার কখনো জলের মতো, সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। ক্লাস ফাইভে ওঠা নিকুন্তিলা এখন অনেকটাই একগুঁয়ে। মা বলে, তোর মতো জোয়ান হয়ে উঠতে থাকা একটা মেয়েকে আমি কী করে আমার ক্ষুদে তলপেটে ধারণ করেছিলাম, ভাবতে অবাক লাগে।

তুমি যে কী বলো মা, নিকুন্তিলা হাসে, যেন আমি এই বয়সেই তোমার পেটে ছিলাম। এলকোহল খেলে তুমি যে কী বলো—! বাতির এ পাশের আলোয় 'ক্রনিক্যাল আফ এ ডেথ ফোর টোল' বইয়ের অসহায় পৃষ্ঠা। যা এলকোহল খেলে তোর সাথে কথা বলব না।

নিকুন্তিলা ভেঙে পড়ে— মা, আমার কিচ্ছু ভালো লাগে না।

এর মধ্যে জহির কাকুর সাথে খালামণির বিয়ে হয়ে যায়। নিকুন্তিলা চোখে আঁধার দেখে। তার মনে হয়, কেউ যেন একাকী এক শ্মশানঘাটে তাকে ফেলে চলে গেছে।

খালি বিছানায় খালামণির খালি অংশটায় চোখ দিয়ে ভিজিয়ে নিকুন্তিলা যখন ফুলে ফুলে কাঁদছে, মা এসে পাশে শোয়। ওকে বুকে জড়িয়ে মা-ও অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ে— বাড়িটা বড় খালি হয়ে গেল! নিকুন্তিলা স্বপ্নে দেখে, সে আর অজন্তা একটা মস্ত সাঁকো পার হচ্ছে। সামনে অজন্তা পেছনে সে। হঠাৎ সামনের সাঁকোটা ভেঙে যায়। অজন্তা ছিটকে নিচে পড়ে যাচ্ছে। চিৎকার করে ঘুম ভাঙলেও সে দেখে, তার চিৎকারে কোনো শব্দ হয় নি। সারা ঘরে আলো-আঁধারির পাক। নিকুন্তিলার শো-কেসের ওপর রাখা পঞ্চাশ-ষাটটা পুতুল হঠাৎ যেন মূর্ত। মিকিমাউসটা হাতছানি দিয়ে ওকে ডাকে। ও চোখ বন্ধ করে ফেলে। মা'র মেক্সির ভেতর হাত ঢুকিয়ে সে খালামণির তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে যায়। মা এত পর হয়ে গেছে!

বাবা এইবার এক মাসের জন্য দেশের বাইরে। নিজেদের কেনা ফ্ল্যাটে নিজস্ব দারোয়ান, সিকিউরিটির কোনো সমস্যা নেই। হঠাৎ করেই বিছানা ভেজানো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিকুন্তিলাও নিশ্চিন্ত। কেষ্টদা তাকে ইসকুলে দিয়ে আসে। রাতে হালকা মিউজিক ছেড়ে মা দু-তিন পেগ খেয়েই ডাক দেয়, নিকুউউ...।

নিকুন্তিলা ছুটে আসে না। ধীর পায়ে বিষণ্ন মুখে মা'র সামনে এসে বসে। মা বলে, অত বিষণ্ন হলে চলবে না। নতুন কিছু করতে হবে। জানিস, একসময় বাগান করার বড় শখ ছিল, ছেনি দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে সেই বীভৎস পাঁক থেকে ফোটাতাম কত বিচিত্র রহস্য... লাল... হলুদ, কমলা রঙের...। কিন্তু বুঝলি এই নেশা অনেক সাধারণ মানুষের থাকে। যে যত বেশি সাধারণ তার হাতে সবচাইতে বেশি ফুল ফোটে, সেই থেকে খুঁজছি, এমন কী করা যায়, যা সবাই করে না ? আজকাল অনুবাদ করতেও ভালো লাগে না।

হাতো তুমি করছোই— নিকুন্তিলা বলে, এই সোসাইটিতে কয়জন মহিলা তোমার মতোন মদ খায়!

এ তো হলো পতনের কথা!

কেন এই পতন মা ? তোমার কী নেই ?

কী নেই ? মা সারা ঘরে পাক খায়... তাই খুঁজেই তো মরছি। কী নেই বলতে পারলে তা বলে পাড়া এক করে কাঁদতাম। সহানুভূতি নিয়ে সবাই আমার পাশে দাঁড়াত।

সকালে চায়ের টেবিলে নিকুন্তিলা ফের সেই কথা তোলে, কেন তুমি জান না, কী তোমার নেই ?

মা চিনি বেশি দেয়া কাপটা নিকুন্তিলার দিকে এগিয়ে দেয়। নিজের চায়ে চুমুক দিয়ে বলে, কেষ্ট, শেলফ থেকে শেক্সপিয়ার সমগ্রটা বের করে রাখ তো।

নিকু আমার সব আছে, এই জন্যই আমাকে ফেলে আমি বাতাসের সাথে মিশে যাব।

এভাবে বলো না, নিকুন্তিলা বিমর্ষ স্বরে বলে, খালামণি চলে যাওয়ার পর তুমি আমার অনেক কাছে চলে এসেছ। তোমাকে আমার আর দূরের কেউ মনে হয় না। মনে হয়, তুমি আমার ঘরে ফেলে রাখা একটা বই যাকে পড়া এখন আমার জরুরি।

মা নিকুন্তিলাকে রিলকের 'হেমন্ত' পড়ে শোনায়, বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ—

পাতা ঝরে, শূন্য থেকে ঝরে পড়ে যায়,
যেন দূর আকাশে বিশীর্ণ হলো অনেক বাগান
এমন ভঙ্গিতে ঝরে, যেন প্রত্যাখ্যাত প্রতিশ্রুতা...

মা ধর্ষণ কী ?

মা চমকে ওঠে। এরপর বই ভাঁজ করে রেখে নিঃশব্দে বসে থাকে। ঠিক আছে, ধর্ষণ বলতে হবে না, তুমি তো আমার মা, আমি তোমার গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছি— বাবা আমার কে ?

মানে ? দ্বিধাগ্রস্ত মা'র জিভ আড়ষ্ট হয়ে ওঠে।

মানে আবার কী ? বাবা কেন আমার বাবা ? তোমরা এক বিছানায় শোও বলেই ? তাহলে আমার সাথে তার কী সম্পর্ক ?

নিকু চুপ! চুপ! বলতে বলতে মা গ্লাসে ওয়াইন ঢালে!

আজ আবার বাবাকে ছাড়া একা খাচ্ছ ?

ও আমাকে গিফট করেছে, মন খারাপ হলে একা খাওয়ার জন্য।

তোমার মন খারাপ কেন ?

ওই যে ফোন বাজছে, আমি ধরছি, তুই যা! তোর টিচার এসেছে। আমি তোকে কিচ্ছু লুকোব না... সময়মতো সব বলব!

এর মধ্যে কী হয়, নিকুন্তলার পাগল জ্বর ওঠে। বাবা যতক্ষণ থাকে মাথায় জলপট্টি দেয়, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। মা-ও উৎকণ্ঠিত। দিন সাতেক আবোল তাবোল বকার পর জ্বরটা সেরে যায়। স্কুলের পড়া হচ্ছে না, নিকুন্তলার টেনশান— এর মধ্যে আবার জ্বর। মা ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। বাবা বলে, দেখি, হয়তো ভাইরাস, সিজন চেঞ্জ হচ্ছে, কাউকে কাউকে বেশি ভোগায়!

নিকুন্তিলা বিছানায় অসাড় পড়ে থাকে। জ্বর সারলেও শরীরটা এমন হয়, মাথা তুললেই সারা ঘর চক্কর দিয়ে অন্ধকার নেমে আসে। কিন্তু বাবা কাজে চলে গেলে মা'র এই মত, যখন জ্বর কমছে, তখনো কেন নিকুন্তিলা শুয়ে থাকছে ? মা তাকে ডাকে— ওঠো, ওঠো নিকু...। এবং তারপরই মা তাকে এক অদ্ভুত কথা বলে, শোনো নিকু, জ্বরটা হয়তো সেরে যাবে, তোমাকে আরো আগেই একটা জরুরি বিষয় আমার জানানো দরকার ছিল, আমার হয়ে ওঠে নি। যদিও তোমার এই জ্বরের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই— তবুও, বলে মা সিরিয়াস কোনো কোনো কথা বলার সময় যা করার তা-ই করে— বুয়া, দু'কাপ কফি!

কফির ধোঁয়া পাকিয়ে উঠছে ওপরে। মা'র মুখ অস্পষ্ট।

আর কিছুদিন পরই তোমার জীবনে অতি স্বাভাবিক একটা ঘটনা ঘটবে— মা বলে— তুমি হঠাৎ একদিন লক্ষ করবে তোমার হাফপ্যান্টে রক্ত! কোথাও আছাড় খেয়েছ, অথবা কেটে গেছে, এ নিয়ে তুমি হয়তো ভয় পাবে, সেই জন্যই তোমাকে সব খুলে বলা। প্রতিটি মেয়ের জীবনেই তা-ই ঘটে। একদম ভয়ের কিছু নেই। সেই রক্তপাত হওয়া মানেই তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ এক নারীত্বের দিকে যাবে, এ তারই সূত্রপাত। যা হোক, এরপর প্রতি মাসে তিন থেকে চার দিন তোমার মধ্যে থেকে কিছু বাজে রক্ত বেরোবে, যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। যখন

কাণ্ডটা হবে, তখন তোমাকে কী করতে হবে সব বুঝিয়ে বলব। কিন্তু আবারও বলছি এটা একদম একটা স্বাভাবিক ঘটনা।

নিকুন্তিলার মাথায় এখন প্রলয় রক্তপাত! মা-তো বলেই খালাস! প্রতি মাসে ? কেন ? যা হোক, এদিকে জ্বর থেকে থেকে উঠছে। মা'র বিকার নেই। মা আড্ডা দিচ্ছে— খালামণি, শান্তনু মামা, আকতার কাকু আর জহির কাকুর সাথে। খালামণি ওকে আদরে চুমুতে ভাসিয়ে আড্ডায় ঢুকে লাপাত্তা! ওদের আড্ডার বিষয়বস্তু— কিশোরীর সাইকোলজি এবং জীবন!

শান্তনু মামা মা'র ছেলেবেলার বন্ধু। আর আকতার কাকু মা'র সাথে এক কলেজে পড়াত। সে এখনো পড়ায়, মা চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। এদিকে আকতার কাকু বাবার ছেলেবেলার বন্ধু। মার সাথে চাকরিসূত্রের পর থেকে ইদানীং তার সখ্য বেশি। আকতার কাকুর স্ত্রীর এনজিওর চাকরি। পোস্টিং ঢাকার বাইরে। ঢাকায় এলে কোনো শুক্রবারে হয়তো সপরিবারে এই বাসায় আসে। তখন বাবার সাথেও তাদের বিস্তর আড্ডা হয়। এদিকে জ্বরে ছটফট করছে নিকুন্তিলা— মা কেষ্টদাকে পাঠিয়ে দিয়েছে তার সেবায়, আর ওদিকে চলছে উচ্চকণ্ঠ তর্ক— মা বলছে, আমি কী করে পৃথিবীতে এলাম ? আমার নিকুন্তিলা শিশুবেলায় যখন প্রশ্ন করত, তখন হাজারো জুজুবুড়ি আর পরীর গল্প দিয়ে তার জন্মকে চৌকস করে তোলা যেত। কিন্তু সে এখন বড় হচ্ছে। আমার গল্পের ভাণ্ডার শূন্য হচ্ছে। কী হবে নিজেকে লুকিয়ে ? ওকে সত্য ধারণাই দিতে হবে।

খালামণি বলে— একজন কিশোরীর সবচে' নাজুক আর বিষণ্ন তার কিশোরীকাল। নিকুন্তিলা তার বোধবুদ্ধি দিয়ে শৈশব অতিক্রমের আগেই কিশোরীকালকে স্পর্শ করছে। এই রকম মুহূর্ত এমন বিপদের, সে গা থেকে শিশুবেলায় ডানায় লেগে যাওয়া ধুলো ঝাড়তে পারে না, আবার যুবতী সময়ের উজ্জ্বল আলো দিয়ে সে নিজেকে উদ্ভাসিতও করতে পারে না।

আকতার কাকু বলে— তার মানে এই মানতে হবে এই বয়সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় কোনো মেয়ে কখনো পুতুল খেলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছে, কখনো টিভি স্ক্রিনে অর্ধ উন্মুক্ত দেহ দেখে অস্বস্তিতে আড়ষ্ট হয়ে উঠছে।

খালামণি বলে— অথচ সেই কিশোরীর সেই বালিকাবেলাতেই তাকে শৃঙ্খলিত করার জন্য মায়েরা কতই না তীক্ষ্ণ সচেতন হয়ে ওঠে। সে দৌড়ঝাপ করে খেলতে গেলে মা হা হা করে উঠে, তুই বড় হচ্ছিস না ? তোর কবে বুদ্ধি হবে ? আবার গোল বেঁধে গল্প করার সময় সেই মেয়েকেই মা বলছে— নিতু'বু, আমি তোমাকে মিন করছি না— কী বলছে জানো, তোমার এসব শোনার বয়স হয় নি, তুমি তোমার ঘরে গিয়ে পড়ো গে।

নিকুন্তিলার জ্বর বাড়ছে। অসহ্য যন্ত্রণায় মাথার দুপাশের রগ ফেটে যাচ্ছে, পাশের ঘরের কারো কোনো বিকার নেই। বিয়ের পর খালামণিও কি বদলে গেল ? অথচ মধ্যরাতে দুর্ঘটনায় মৃত বাবা-মা'র নাম ধরে খালামণি যখন ডুকরে কেঁদেছে, নিকুন্তিলা বলেছে, তার বুকে শুয়ে— এই তো আমি আছি! আর মা ?

মা'র কথা মনে হতেই অন্ধকারে ঢেকে যায় সব।

ভেসে আসে শব্দ। মা বলছে, তখন একজন কিশোরীর কী হয় ? তার পড়ার টেবিল তার চোখের সামনে ছায়া হয়ে আসে। এক অনির্দিষ্ট, অনিশ্চিত ঝাপসা দুরাশাময় অচেনা পৃথিবী তাকে ক্রমশ নিঃসঙ্গ আর বিষণ্ন করে তুলতে থাকে। তার শিশুকালের পরম মমতাময় মা-বাবা তার অস্তিত্ব থেকে ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে। সে তখন তার এই অসহায়ত্বের প্রকাশ করে কখনো খিটখিটে হয়ে... ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে সে আলাদা এক জগৎ তৈরি করতে থাকে। কখনো সে গম্ভীর হয়ে যায়। এই মেয়েটিই এক সময় চারপাশের তুমুল পৃথিবীর পথঘাট না চিনে এক বিভ্রান্তিময় জগতে পা রাখে।

খালামণি বলে— বুঝলেন শান্তনুভাই, এখানে বেড়ে উঠতে থাকা কিশোরীর জন্য এই পুরুষবহুল পৃথিবী খুবই ভয়ঙ্কর। তার নিকট-আত্মীয় পুরুষেরা, এমনকি তার চাচা মামারা পর্যন্ত তার জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

জহির কাকু বলে— তুমি ঢালাওভাবে সব পুরুষ সম্পর্কে এই মন্তব্য করতে পার না।

খালামণি বলে— আমি ঢালাওভাবে কিছু মিন করছি না। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যা ঘটতে পারে তার ইঙ্গিত করছি। নিকুকে এই জন্য বুঝে ওঠার আগ থেকে চোখে চোখে রেখেছি।

আকতার কাকু বলে— এ তোমাদের রক্ষণশীলতা। একজন কিশোরীর ছেলে বন্ধু থাকতে পারে না ?

পারে— মা বলে, নিকুন্তিলা কো-এডুকেশনে পড়লে অন্য কথা ছিল। ও মেয়েদের স্কুলে পড়ে। আমাদের বাড়ির বাস্তবতাটাই এমন, কোনো ছেলের সাথে মেশার মতো অবস্থা ওর নেই। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ওর কোনো ছেলে বন্ধু হয়ে গেলে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু কোনো একটা ছেলের সাথে মিশতে হবে বলেই বানিয়ে তো আর ও বন্ধুত্ব তৈরি করতে পারে না। যা হোক কী কথা হচ্ছিল ?

শান্তনু মামা বলে— কেষ্টকে চায়ের কথা বলা যেতে পারে।

খালামণি উঠে যায়। মা বলে, চোখের সামনে বেড়ে উঠতে থাকা মেয়েটি যখন কিশোরীতে রূপান্তরিত হতে থাকে, তখন তার শরীর থেকে এক এক করে ঝরতে থাকে শিশু রোম, তার অস্তিত্বের মধ্যে গজাতে থাকে নতুন ডাল, সবুজ পাতা। এই বিবর্তনে সে তখন নিজেও দিশেহারা থাকে, যে নিকট-আত্মীয়র বুকে দু'দিন আগেও দারুণ উচ্ছ্বাস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত, সেখানে নানা কায়দায় তৈরি হতে থাকে অস্বস্তি। সেই আত্মীয়র ভেতরে হয়তো মেয়েটিকে কেন্দ্র করে এক সরল শিশু মায়াই আছে, কিন্তু মেয়েটির মা পৃথিবীর কোনো কিছু সম্পর্কে মেয়েটিকে কোনো ধারণা না দিয়েই হয়তো তার উচ্ছ্বাসকে চাপা ধমকে থামিয়ে দিয়ে বলে— এখন তুমি বড় হচ্ছ, এইভাবে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া তোমার ঠিক নয়। সেই কিশোরীর ভেতরটা তখন নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় গুঁড়িয়ে যেতে থাকে। সে তখন ওই সারল্যপ্রিয় মমতাময় আত্মীয়কে জন্তুর চোখে দেখতে শুরু করে। নয়তো ভুল বোঝে মাকে, সে এই পৃথিবীকে সুন্দর চোখে দেখতে পারছে না।

চা আসে। পাকিয়ে ওঠে ধোঁয়া।

নিকুন্তিলা অসহায় চোখে দেখে স্থির সিলিং ফ্যান। মাথাটা টলছে। গুমরানো রোদনের নিভৃত কোলাহল। বমি আসছে। পায়ে কষে কম্বল চাপিয়ে নিকুন্তিলা দেখে এক ধুধু মাঠ... নিকুন্তিলা যেন একাকী শুয়ে পড়ে বিস্তৃত সবুজ ঘাসের ঠাণ্ডা ওমে।

শান্তনু মামা বলে, আমার একটা তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলি— সেদিন আমার এক খালা তার কিশোরী মেয়েকে নিয়ে আমাদের বাসায় বেড়াতে আসে। সে আমাদের খুব ক্লোজ। আমি তার মেয়েটাকে ছোটবেলা থেকেই খুব আদর করতাম। অনেকদিন পর যেদিন ওরা এল আমি অন্য বাচ্চাদের সাথে ওকে নিয়ে খেলায় মেতে উঠি। মেয়েটা যখন আমার সাথে ছোঁয়াছুঁয়ি ধাক্কাধাক্কি খেলছে, হঠাৎ লক্ষ করি ওর মা ওকে ইশারায় ডাকছে। তোমরা কল্পনা করতে পারবে না কী রকম শিশু সারল্য খেলায় আমি মেতে উঠেছিলাম। হঠাৎ দেখি মেয়েটা স্তব্ধ। আমাকে এড়িয়ে সোফার এককোনায় গিয়ে বসে আছে। আমি তো বুঝে উঠতে পারি না কী হয়েছে! ওর মা ভেতরে গেলে মেয়েটি আমাকে ফিসফিস করে বলে— মা আমাকে ধমক লাগিয়েছে। আপনার কাছ থেকে সাবধানে থাকতে বলেছে। শান্তনু মামার চোখে প্রায় জল এসে যায়! কী অসহ্য অপমান! আহা! ওইটুকুন বাচ্চা। ওর মধ্যে ওর মা বিষ ঢুকিয়ে দিল ?

খালামণি বলে, এতে আপনার অত আপসেট হওয়ার কিছু নেই। বাড়ন্ত মেয়ের জন্য এই পৃথিবীটা অনেক মর্মান্তিক। সবার চোখ তো আর সরল নয়।

মা বলে, আমাদের অবদমিত পুরুষেরা তাদের দেহের কাছে খুব অসহায়। একজন কিশোরীর ক্ষেত্রে সহজেই তারা ঝুঁকিটা নিয়ে নেয়। তারা মনে করে পটিয়ে পটিয়ে সহজেই তাকে বিষয়টি ভুলিয়ে ফেলতে পারবে।

শান্তনু মামা এই যুক্তি মানে না, বলে— সেই খালা আমার মনেও বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে। মেয়েটির দিকে আমি তাকাতে পারছি না। আমার সরল পৃথিবীটাকে নষ্ট করে দেয়ার কোনো অধিকারই সেই খালার নেই।

আকতার কাকু বলে, আমারও দুই মেয়ে, বড় হচ্ছে। সত্যিই ভয়ঙ্কর আজকের আলোচনা।

জুজুবুড়ি— জ্বরের ঘোরে আবছায়া পরিভ্রমণরত বাতাসে নিকুন্তিলা যেন তার হাতছানি দেখতে পায়। ওর লম্বা নখ.. সামনের ছায়ায় মা! মা! নিকুন্তিলা চিৎকার দেয়। আড্ডা ছেড়ে মহাবিরক্ত মা ওর কাছে এলে ও কুঁকড়ে যায়। নিকুন্তিলা বলে—ভীষণ জ্বর বেড়েছে। মা ওর কপালে হাত রেখে ঝাঁঝমেশানো কণ্ঠে বলে— গায়ে তো জ্বর নেই। তুমি মিছেই ভয় পেয়ে জ্বরকে কাছে ডেকে স্কুল ফাঁকি দিচ্ছ। চুপচাপ চোখ বুঁজে শুয়ে থাক।

মা চলে গেলে গুমরে ওঠে নিকুন্তলা— নিষ্ঠুর!

মা ওই ঘরে গিয়ে সেই আলোচনার সূত্র ধরেই বলে— বংশপরম্পরায় আমাদের মেয়েরা বড় পরাধীন জীবনযাপন করে আসছে। আলোহীন বাতাসহীন অন্ধকার পৃথিবীতে যে মেয়ে যত হলুদ ঘাসের মতো, তত সে সুন্দর, তত প্রশংসনীয়। একজন শিক্ষিত মেয়েও যখন চলন্ত পণ্যের মতো বিয়ে বাজারে পাত্র-পক্ষের সামনে বসে তাদের প্রশ্নের মুখে মরিয়া হয়ে নিজের কীর্তি জাহির করে এবং এরকম অমানবিক বিষয় অত্যন্ত দাপটের সাথে যখন এই সমাজের ঘরে ঘরে প্রচলিত তখন আমাদের চারপাশের নারীর চরম দীনতার রূপটাই প্রকট হয়ে পড়ে।

ও-কী জহির, তুমি চা খাচ্ছো না!

নিতু, এরই মধ্যে ভুলে গেলে, চা আমি একটু ঠাণ্ডা হলে খাই।

খালামণি টিপ্পনী দেয়— গরম মেজাজের মানুষ তো!

জহির কাকু একটু হাসে, থার্মোমিটার এনে মেপে দেখতে হবে কার মেজাজ বেশি গরম।

আকতার কাকু বলে, তুমি ভেবে দেখো নিতু, সেই মেয়েই একের পর এক বিয়ের পরীক্ষা দিয়ে পাশ করার পর তার বিয়ে হয়। তাকে আবার এক কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়, কন্যা সন্তানের মা হওয়ার পর। তার চারপাশের আত্মীয়দের মুখে ছাই নেমে আসে। নারীর নষ্টগর্ভই কন্যা সন্তানটি ভূমিষ্ট হওয়ার জন্য দায়ী— এরকম একটি দায় সবাই সেই নারীর ওপর চাপিয়ে দেয়। এবং এটাই আমাদের সমাজের অধিকাংশ পরিবারের অতি চেনা চেহারা।

জহির কাকু বলে, এই পরিস্থিতিতে সেই নারী নিজেও তার শিশুকন্যার ওপর অমানবিক হয়ে ওঠে। এটা তার অস্তিত্ব সংকটের কারণে হয়। সে নিজের পরিবার থেকে যা যা শিখে এসেছে, তা-ই চালিয়ে দিতে থাকে তার বেড়ে উঠতে থাকা কন্যার ওপর। সে মনে করে, নারী পুরুষের সম্পর্ক, বাইরের পৃথিবীর যাবতীয় রূপ, এইসব বিষয় সম্পর্কে যদি সেই কিশোরীকে ধারণা দেয়া হয়, তাহলে সেই কিশোরীর কুসুম কোমল সৌন্দর্যের মধ্যে চিড় ধরবে, সেই কিশোরী অগ্রগামী পুরুষদের সমান্তরালে চলতে চাইবে—

মা কথা লুফে নেয়— 'কিচ্ছু জানি না, কিচ্ছু বুঝি না' এই যে এক চেহারা কিশোরীর, সেই নিষ্পাপতার মধ্যে নষ্ট বাতাস ঢুকে যাবে। সে মেয়েকে জীবন সম্পর্কে কিচ্ছু ধারণা না দিয়ে, চলায় চলায় তার অসঙ্গতি ধরতে শুরু করে... আমি কি ঠিক বোঝাতে পারছি ? মানে ঠিক কোন পথটা তার কিশোরী মেয়ের— এটা খুঁজে একজন কিশোরী যখন দিশেহারা, সেই মা তখন মেয়ের এই বিভ্রান্তিকে মনে করে, অগ্রসর সমাজ থেকে আসা নতুন সমাজ মেয়েকে বিভ্রান্ত করছে।

আকতার কাকু বলে, তখনই শুরু হয় মেয়ের পায়ে বেড়ি পরানোর খেলা।

মা বলে— সেই মা চায়, সেই কিশোরীর আচরণ হবে শিশুর মতো কিন্তু সে বুদ্ধি রাখবে

একজন পরিণত নারীর। সে নিজের সময়ের পরাধীন পৃথিবীর গল্প মেয়ের সাথে গর্বের সাথে করে। সে সমাজের সব পুরুষ সম্পর্কে মেয়েকে অশরীরী এক ধারণা দিয়ে ক্রমশ ভীতু আর পুরুষবিদ্বেষী করে তোলে। সেই মেয়ে ভয় থেকে পুরুষকে গ্রহণ করে, শ্রদ্ধা করে তার অধীনতা মেনে নেয় কিন্তু ভালোবাসতে পারে না। তার মধ্যে ঢুকে যায় দুনিয়ার সন্দেহ। একজন কিশোরীর পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে আসে।

অন্ধকার ? সুতীব্র আলোর ভাঁজে ভাঁজে তা-ই দেখে নিকুন্তিলা। ওই ঘরে কি কোনো মঞ্চ নাটকের মহরত চলছে ? সবাই একটি বিষয়ে একমত হয়ে একটি বিশেষ থিম নিয়ে কথা বলছে। যার বেশির ভাগ বিষয়েরই মুণ্ডু লেজ ধরতে পারছে না। অন্য সময় এলে একজনের কথা ছাপিয়ে আরেকজন তর্ক করে। কিন্তু আজ যেন সবাই বিন্যস্ত হয়ে এক হয়ে কথা বলছে। তবে ওই ঘরে যত কথাই হোক, মাকে তার মনে হলো স্ববিরোধী, ভণ্ড। নিজের মেয়ের কপাল ছুঁয়ে যে মেয়ের ভেতরের জ্বর, যন্ত্রণা ছুঁতে পারে না— সে কী করে এত কথা বলে ? এক অসীম ডুব সাঁতারে ডুবে নিকুন্তিলা ফিসফিস কেঁদে ওঠে— বাবা! বাবা গো, তুমি কোথায় ?

সেই ঘর থেকে চায়ের চুমুক চুমুক শব্দ ভেদ করে উড়ে আসে মা'র আরো শব্দাবলি... নিকুন্তিলার কান লাল হয়ে যায়, সেদিন মা মেয়েদের যে গোপন বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছে তার সাথে, এইবার সেই বিষয় নিয়ে খোলামেলা ডিসকাশনে যাচ্ছে। মা বলছে— এই বিষয়টা আরো প্রকট হয় সেই কিশোরীর পিরিয়ড হওয়ার পর। যখন এক নতুন স্রোতের প্রাবল্যে একজন কিশোরী ভীত, যন্ত্রণাকর অবস্থায় পড়ে, তখন অকারণেই কোনো মা সেই মেয়ের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কোনো মা বিষয়টিকে সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ হিসেবে দেখে, মেয়েকে সে এই ধারণা দেয়, তোর মা হওয়ার দরজা খুলে গেল। এ শুধু খুলেছে তোর স্বামীর জন্যই। সাবধান! অন্য কোনো পুরুষ সম্পর্কে সাবধান! বুঝে দেখ, সেই কিশোরী, যে তখন বসে আছে ভাঙা খোলায় শিশুকুসুম হয়ে, এইসব বিশাল ভারবাহী শব্দ তাকে ক্ষুব্ধ, কাতর করে তোলে।

নিতু'বু, খালামণি বলে— প্রতি মুহূর্তে আমাদের পৃথিবী পাল্টাচ্ছে। এবং এই পাল্টে যেতে থাকা পৃথিবী প্রতিমহূর্তের প্রচার মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি। মানুষের পড়াশোনা, গার্হস্থ্য জীবনের মতোই জরুরি আমাদের যৌনজীবন।

আমি তো তাই বলছি— মা বলে— যে কিশোরী তার বড় বোন কিংবা খালাকে দেখছে প্রতিবেশীর ধাক্কা খেয়ে অপরিচিত এক বদ্ধ বাসরঘরে ঢুকে রুদ্ধদ্বার বাসর কাটাতে তার সামনে পুরুষ নারীর সম্পর্ককে অশ্লীল কিংবা ভয়াবহ দেখিয়ে এইসব বিষয় থেকে তাকে সরাতে চাওয়ার কোনো মানে নেই। বিয়ে হয়ে যাওয়া মানে এই নয়, মেয়েকে পেলেপুষে বড় করে অর্থহীন অপচয়ের পর অন্যের হাতে তুলে দেয়া— মায়েরা মেয়েকে এই ধারণা থেকে বের করে যদি তার মধ্যে এই চিন্তার ভ্রূণ পুঁতে দেয়, সে যদি পরিবারের প্রয়োজনীয় সন্তান হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলে, নিজেকে বিক্রি না করে, বিকিয়ে না দেয়, তাহলে ছেলেসন্তানের মতো অপরিহার্য আর মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে তার অবস্থান। তাহলে এখন

কন্যা সন্তান জন্মের পর যে ছায়া চারদিক অন্ধকার করে দেয়— সেই ছায়ার গ্রাস থেকে ক্রমেই সবাই বেরিয়ে আসার স্বপ্ন দেখতে পাবে। তার আগে জরুরি, মেয়েকে জীবনের, পৃথিবীর সার্বিক রূপের ধারণা দেয়া, আমিও ভাবছি নিকুন্তিলার সাথে—

খালা... খালা... কেষ্টদা মা'র রুমে আছড়ে পড়ে, নিকুমনি বমি করে সারা ঘর ভাসিয়ে দিচ্ছে।

ক'দিন টানা ভোগার পর নিকুন্তিলার ইসকুলের জীবন শুরু হয়। ওর শরীরটা ঢ্যাঙ্গা আর পাখির পালকের মতো হালকা হয়ে গেছে। এক দুপুরে নিকুন্তিলা স্কুল থেকে এসে হতভম্ব, মা চোখ ফুলিয়ে লাল করে ফেলেছে। তার সামনে নিকুন্তিলার ডাইরি মেলে ধরা, যাতে অসুখকালীন সময়ে নিকুন্তিলার কী ভয়াবহ পল পল যন্ত্রণা হয়েছে তার বর্ণনা, মা'র নিষ্ঠুরতায় সে কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেও বাবার মুখ মনে করে করতে পারে নি, ডাইরিতে এইসব বর্ণিত!

মা নিকুন্তিলার মুখের দিকে অচেনা চোখে চেয়ে থাকে।

নিকুন্তিলা গ্রীবা উচ্চকিত করে, তুমিই আমাকে শিখিয়েছ কাউকে না জানিয়ে অন্যের ডাইরি পড়া, চিঠি খোলা অন্যায়!

তোর সেই বয়স এখনো হয় নি। তোর বয়সের অনেক দায়িত্বের ভার আমার ওপর।

কত যেন পালন কর আমার দায়িত্ব... নিকুন্তিলা মাকে আকাশ থেকে মাটিতে আছড়ে ফেলে বলে— আমাকে তুমি হোস্টেলে ভর্তি করে দাও! আমি এই বাড়িতে থাকলে দম বন্ধ হয়ে মরে যাব'

বলা যায় এই ঘটনার পরই যেন নিকুন্তিলার সাথে মা'র সারা জীবনের বন্ধুত্ব হয়ে যায়। মা সেদিন নিকুন্তিলাকে চুমুয় চুমুয় ভাসিয়ে আকুল কান্নায় ডুবে বলেছিল— এই আঘাতটা আমার দরকার ছিল। এতদিন আমি কেবল নিজের আনন্দ বেদনার মধ্যে আবর্তিত ছিলাম! তুই আমাকে ঠিক শিক্ষাটা দিয়েছিস! টিচার চলে গেলে মা ক্রিসেন্ট লেকের জলের সামনে বসে বাদাম খেতে খেতে বলে— তোকে তো বলেছিই আমার মা'র অনেক বাচ্চা ছিল। সব এক এক করে মরল, কেউ গর্ভে, কেউ জন্মের পর। এরপর এই যে আমার বেঁচে থাকা। আমার মনে হতো আমিও মৃতদের দলের একজন, ভুলক্রমে বেঁচে আছি।

মা, তোমার জরায়ু কেটে ফেলা— এটা কী ?

তোর জন্মের কিছুদিন পরই আমার মাঝে মধ্যে তলপেটে ব্যথা হতো। আমি খুব অসুখ

পুষে রাখি। এক দু'বছর এমনিই কাটল। একদিন তোর বাবা টেনে হিঁচড়ে আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ডাক্তার বলল, জরায়ু— মানে যার মধ্যে একটা বাচ্চা বড় হয়— সেখানের টিউমারের কন্ডিশন খারাপ। জরায়ুটা কেটে ফেলে দিতে হবে। সেটা কাটলে আমার আর বাচ্চা হবে না।

জলের ওপর সোডিয়াম বাতি হলুদে দুধের সরের মতো। আকাশে বাতাস আর চারপাশে মানুষের ভিড়। মা নিকুন্তিলার হাত জোরে চেপে বলে— এতদিন তোকে কী কারণে কেন প্রাণ থেকে জড়িয়ে ধরতে পারতাম না, সে আরেকদিন বলব। কিন্তু আমি চাইতাম... গণ্ডা গণ্ডা বাচ্চায় আমার ঘর ভরে থাক, আমার মা যেমন চাইত। তোর বাবা নির্দ্বিধায় ডাক্তারকে বলল— ফেলে দিন। আমি তো আকুল কান্নায় পাগল। অতীত-বর্তমানের সমস্ত বেদনা আমাকে ছেঁকে ধরল। ডাক্তাররা বোর্ড মিটিং বসাল। তারা চাইল আমি টিউমারের মধ্যেই আরেকটা বাচ্চা নিই।

কিন্তু তোর বাবা কিছুতেই সেই ঝুঁকি নিল না... নিকু দেখ দেখ, কী চমৎকার ফোয়ারা... জলের চারপাশে মিহি কাচের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে।

মা! গাড়ি নিয়ে এসে একদিন নৌকায় করে সেই ফোয়ারার জলে ভিজব। এরপর ভেজা কাপড় নিয়ে গাড়িতে উঠে বাসায় চলে যাব। যাব ?

আচ্ছা।

এক রাতে মা যখন শ্যাডল্যাম্পের নিচে বসে ইয়োসার দ্য অফ দ্য হিরে অনুবাদে ব্যস্ত... তখন মাথার ওপর কুয়াশাপুঞ্জের বিস্তার। মা সেই ইংরেজি অক্ষরগুলোর মধ্যে যেন ঘোর সাঁতার খাচ্ছে, পেছনে নিকুন্তিলা এসে সহজ কণ্ঠে বলল, মা আমার হয়ে গেছে।

মা যেন পাতাল থেকে ওঠে— কী ?

ওই যে তুমি যে বলছিলে... আমার প্যান্টুতে রক্ত!

মা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিকুন্তিলাকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে চেক করে। এরপর বুয়াকে দিয়ে সামনের ফার্মেসি থেকে প্যাড এনে নিকুন্তিলাকে চুমু খেয়ে বলে— কিচ্ছু ভয় নেই। প্রথম মাঝে মাঝে সব ঝামেলা হবে। এরপর ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।

তোমার যে হয়েছে, বাবা জানে ?

মা হেসে মরে— তোর বাবার সাথে আমি এক বিছানায় ঘুমাই, জানবে না ?

রাতে নিকুন্তিলা আকুল লজ্জায় লাল হয়ে শোনে, মা বাবাকে এই গল্প করছে। বাবার ভেতর বিষাদ মেশানো কী যেন, আমার নিকুটা তাহলে বড় হয়ে গেল!

আজকাল মাঝে মধ্যেই বাবা-মা একসাথে বসে সন্ধ্যায় এলকোহল খায়। রাত বাড়তে থাকলে দু'জনই এমন উদ্ভাসিত হাসি আড্ডায় মেতে ওঠে— নিকুন্তিলার বড় মধুর লাগে। বাবা মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, দাঁড়াও তোমার ভাষায় চেষ্টা করি, নিতু, তুই যখন বুড়ি হবি তখন আমি সব্বাইকে ডেকে বলব, এর যৌবনের সব রঙ রস পান করে আমি আজ পূর্ণ, এই যে দেখুন আমার স্ত্রী, রাজহংসীর মতন যে জলে সাঁতার কাটত, প্রতিটি মানুষের প্রতি আছে যার সমান অনুভব, যার স্তনের ভাঁজে মুখ ঢুকিয়ে সৌন্দর্য কী আমি চিনেছি, তার বার্ধক্যের চামড়াও কী ভয়ঙ্কর সুন্দরে ঋদ্ধ! মা হাসে, পারও তুমি, যেন আজকেই প্রেমে পড়েছ! কাণ্ড!

বাবা প্রশ্ন করে, আমি বৃদ্ধ হলে তুমি কী বলবে ? মা খানিক ভেবে বাবার গা ঘেঁষে বসে বলে, আমি বলব, সারা জীবন আমি নানা অনন্তলোকে উড়েছি। শেকড়টাকে তোমার বুকে রেখে।

নিকুন্তিলাকে বাবা ডাক দিলে একেবারে জড়সড় সে বাবার সামনে বসে। বাবা মজা করে বলে— এক পেগ খাবি ?

ধেৎ!

তাহলে তোর কোকের গ্লাসটা নিয়ে আয়।

তিনজনে একসাথে গ্লাস ঠেকায়— চিয়ার্স। মাঝখানে টেবিল। বাবার শাদা কপালে এই শীতেও বিন্দুঘাম। নিকুন্তিলার ইচ্ছে হয়, রুমাল দিয়ে বাবার কপাল মুছে দেয়। বাবা এইবার নিকুন্তিলার দিকে তাকায়, ওর চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলে— অনেকদিন নিকুকে নিয়ে বাইরে যাওয়া হয় না। মাসখানেক পর নিকুর হাফ ইয়ার্লি শেষ হলে ওকে নিয়ে সুন্দরবন যাব।

নিকুন্তিলার গলায় কোক আটকে যায়— সত্যি ?

মা নিরস কণ্ঠে বলে 'ইয়োসার' অনুবাদ শেষ না করে আমি কোথাও যেতে পারব না। একটা পাবলিশারের সাথে কথা হয়েছে, তিনমাসের মধ্যেই পাণ্ডুলিপি চেয়েছে।

নিকুন্তিলার সব পানসে হয়ে যায়। মা... প্লিজ...।

বলছি তো! এতকাল ধরে কাজ করছি, একটা বই হবে না ?

মার্কেসেরটার খবর কী ? বাবা প্রশ্ন করে।

ওটা অর্ধেক করে রেখে দিয়েছি। পাবলিশার ওটাই চাইছিল। বলছিল, ইয়োসাকে ক'জন চেনে ? মার্কেসেরটা দিন, ওর খুব ডিমান্ড। আমি পাশ কাটিয়ে গেছি। ওটা আরো বড় কোনো পাবলিশারকে দেব। নিকুন্তিলার মনে পড়ে, সান্তিয়াগো স্বপ্নে ফুলের বাগানে হাঁটছিল, ওর মাথায় পাখির বিষ্ঠা, শেষে খুন... মা কেন ওটা অর্ধেক করে আরেকটিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ?

তাহলে... বাবা এইবার উৎসুক হয়ে নিকুন্তিলার দিকে তাকায়— চল্ নিকু, আমি আর তুই একা যাব। তোর মাকে নেব না।

মা যাবে না... ? নিকুন্তিলার চোখের মধ্যে ঘাই দিয়ে ওঠে নেপালে মা'র সাথে একত্রে

প্রকৃতি উপভোগের দৃশ্যগুলি— কী হয় মা, তুমি যদি যাও ? এতকাল অনুবাদ করেছ, বইতো কর নি! একবার না করলে কী হয় ?

কলেজের চাকরিটা ছেড়েছি... বলতে বলতে মা তার সহজাত স্বভাবে মূল বাতি নিভিয়ে দিয়ে কোনার স্ট্যান্ডের ল্যাম্প জ্বালিয়ে ঘরে একটা আধো আলোছায়ার চক্র তৈরি করে এয়ার ফ্রেশনার ছড়াতে থাকে— এইবার মনস্থির করেছি, একটা তো অর্থবহ কিছু করতে হয়। এত রাত রাত খাটুনি, ইংরেজির কয়েকজন প্রফেসারকে দেখিয়েছি। তারা বলেছেন, আমার অনুবাদ খুব সৃষ্টিশীল, খুব মৌলিক কাব্যময়তা আছে এতে, তাই মনে জোর পাচ্ছি— এইবার থেমে গেলে ফের আলসেমিতে পেয়ে বসবে— সেই আলোছায়ায় মায়ের হাতের লেবু স্প্রাইট মেশানো ভদকার জল কাঁপতে থাকে... আর আধকাটা চুল সামনে মেলে দেয়া মায়ের মুখটাকে দেখাচ্ছে পরীর মতো... মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে নিকুন্তিলা। মা'র চোখে ঘোর জমছে, সে নিকুন্তিলার হাত নিজের আলতো ঠোঁটে ছুঁইয়ে বলে— একবার বাবার সাথে একা গিয়ে দেখ, নতুন থ্রিল। আমি তো আবার কিপটেমি করব— বড় হোটেলে উঠে দু'জন দেদারসে খরচ করবি...।

নিকুন্তিলার প্রথম ঋতুবতী হওয়ার দিনটা এমনিই যেত... যদি না একাকী ঘরে শুয়ে তাকে অন্য ভাবনায় পেয়ে না বসত।— আমার নিকুটা বড় হয়ে গেল— বাবার এই শব্দাবলি একাকী বিছানায় তাকে বিদ্ধ করে। পিরিয়ড হওয়ার সাথে বড় হয়ে যাওয়ার কী সম্পর্ক ? তবে কি আজ রাতেই সে ঢ্যাঙ্গা তালগাছের মতো হয়ে উঠবে ? কী রকম ভয় ভয় রোমাঞ্চ হচ্ছে। মা'র সেই হাসি— এক বিছানায় ঘুমাই...। বাবা মা'র সম্পর্কটা ? ধুর! অত ভেবে কাজ নেই। খুব লোভ হচ্ছে, অজন্তাকে ফোন করে। কিন্তু এখন রাত সাড়ে বারোটা, ও নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। মা বলেছে, সাইড এফেক্টে কারও কারও তলপেটে ব্যথা হয়। বুকের জায়গাটা আগের মতো সরল নেই। ক্রমশ মায়ের মতন উঁচু হচ্ছে। কিন্তু নিজের হাতের চাপ পড়লেও সেখানে সাংঘাতিক ব্যথা হয়। এতসব পরিবর্তনের মুখোমুখি ও দাঁড়াতে পারবে তো ?

পাশের ঘরে বাবার ভেজা কণ্ঠ— নিতু... নিতু তোকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

মা অনর্থক হাসছে।

নিকুন্তিলা ঘুমিয়ে পড়ে।

তিন দিন পর নিজেকে অনেকটা সামলে সে স্কুলে যায়। ক্লাসে সে ভালো ছাত্রী, টিচাররা তাকে আদর করে। আজ মনে হচ্ছে, এই ঘটনা এই ক্লাসে একমাত্র তারই হয়েছে। কেমন আড়ষ্ট লাগে। সে এইবার সেই বিস্তৃত সবুজ মাঠে বাবা-মা'র হাত ধরে হাঁটে। মনটা চলে

যায়, দূরে দূরে... ডিজনির স্বপন কুমারীর জগতে। কী যে বলে যাচ্ছে টিচার, মাথায় কিছুই ঢুকছে না। তার মনে হচ্ছে, কখন টিফিন পিরিয়ড হবে। বিষয়টা অন্তত অজন্তার সাথে শেয়ার করা দরকার। বাবার শিখিয়ে দেয়া প্রক্রিয়ায় সে জয়ী হয়েছে। অজন্তাকে নোট দিয়ে, নানাভাবে সাহায্য করে অনেকটাই ভালো ছাত্রী তাকে করে তুলেছে নিকুন্তিলা। হঠাৎ হুঁশ হয়, টিচার তাকে ইঙ্গিত করে কিছু বলছে। পাশে বসে তাকে খোঁচাচ্ছে অজন্তা, এদিকে তার খেয়ালও ছিল না।

দাঁড়িয়ে দেখে, ক্লাসের সব মেয়ে হাসছে। টিচার বলে, কী হে নিকুন্তিলা সুলতানা, তুমি কোথায় ছিলে ?

জ্বি, ম্যাডাম, তিনদিন আমার অসুখ ছিল।

তিনদিনের কথা জিজ্ঞেস করছি না, পাস্ট পারফেক্ট টেন্স নিয়ে তোমাকে তিনবার একটা প্রশ্ন করেছি, বলি, কোন জগতে ছিলে ?

আবার ক্লাসে হাসির হুল্লোড়।

সরি ম্যাডাম...।

যা হোক, টিফিন পিরিয়ডে কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে বসে অজন্তাকে কীভাবে কথাটা বলবে, তাতেই অনেক সময় পেরিয়ে যায়। শেষে কিছুটা শুরু করতেই অজন্তা ওর পিঠে থাপ্পর বসায়— এ তো আমার এক বছর আগে হয়েছে।

নিকুন্তিলা আকাশ থেকে পড়ে, তুই আমাকে কোনোদিন বললি না ? এত চাপা তুই ?

তুই যে শিশুর মতো... অজন্তা টিফিন বের করে নিকুন্তিলাকে খেতে দেয়— ভেবেছি, তোর হওয়ার আগে কিছু বলে তোর মাথাটা নষ্ট করার কিছু অর্থ হয় না। তোকে বোঝাতে গেলে এত আবোলতাবোল প্রশ্ন করতি, আমারই মাথা খারাপ হয়ে যেত!

এইভাবে দিন যায়। শীত চলে যায়, বসন্ত আসে। এই বহুতল দালানের বর্ণাঢ্য ফাঁকেও কোকিলকে ঠেকানো যায় না। বিকেলের ঘুমভাঙা নিকুন্তিলার ইন্দ্রিয় অবশ করে দিয়ে কোত্থেকে উড়ে আসে।

মুখ ধুয়ে বারান্দার প্লাস্টিক চেয়ারে বসলে বুয়া চা নাস্তা দিয়ে যায়। নিকুন্তিলা দেখে, হাউজকোট পরা মা বারান্দার দিকে আসতে থাকলে— ফোন। নিকুন্তিলার কাছে হ্যান্ডসেট ছিল। সেটা টিপতে নিতেই মা হা হা করে ওঠে— আমি ধরছি। হিম হিম বাসন্তী হাওয়াতেও নিকুন্তিলার শরীর শিরশির করে— মা আছড়ে পড়েছে ফোনে। ফের হতাশা। রাজ্যির বিমর্ষতা নিয়ে মা বারান্দায় আসে— হায়! অপেক্ষা।

এই রহস্যের জট মা কোনোদিন খুলবে না। প্রশ্ন করেও লাভ নেই। নিকুন্তিলা যে-ই চায়ে

চুমুক দিয়েছে, সেই সন্ধ্যায় তাকে তব্দা করে দিয়ে মা জানায়— তোকে আমার পেট কেটে বের করা হয় নি। নিকুন্তিলা বিমূঢ় হয়ে মা'র মুখের দিকে তাকায়। তুই বড় হচ্ছিস। তোর সব ঠিকটাই জানা দরকার। বিদেশে কী করে জানিস, সেই ছোটবেলা থেকে এইসব কিছু সকলকেই ক্লাসে ধারণা দেয়া হয়। কোনো টিচার প্রেগনেন্ট হলে তাকে সব ক্লাস ঘুরিয়ে দেখানো হয়। জানানো হয়, ওইটার মধ্যে একটা বাবু আছে। ওদের মায়ের সেই সময় অন্য সন্তানের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। আমার নরমাল ডেলিভারি হয়েছে। বলছিলাম না, পেটে প্রচণ্ড যন্ত্রণা, আমি চিৎকার করছি। ডাক্তার বারবার আমাকে চেক করে বলছে, সহ্য করতে হবে, এটা নরমাল কেস, এক সময় ট্রলিতে করে আমাকে লেভার রুমে নিয়ে গিয়ে আমার দু'পা দুই স্ট্যান্ডের সাথে উঁচু করে আটকে দেয়া হলো, এত কষ্ট নিকু, মনে হচ্ছিল আমাকে কেটে দু'টুকরো করলেও কিছু টের পাব না। শেষে ওই যে রূপকথার গল্প আছে, চিচিং ফাঁক বলতেই পাহাড় দু'পাশ হয়ে গেল, প্রকৃতির কী কারিশমা, তোর বেরোনোর সময় আমার ইউরিনের নিচের রাস্তা তেমনই ফাঁক হয়ে গেল, ডাক্তার টান দিয়ে তোকে ওপরে তুলতেই— কী শান্তি... তোর ওঁয়া-ওঁয়া শুনতে পাচ্ছি। আমি নেতিয়ে পড়তে পড়তেও তোর রক্ত মাখা শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকি। নার্স তোকে মোছানোর জন্য নিয়ে যায়।

মা আবার রাত্তির জাগা অনুবাদে ঢুকে গেছে। মাকে এখন অনেক আত্মপ্রত্যয়ী মনে হয়। মাঝে মাঝে ওরা নানার বাসায় যায়। নিকুন্তলা বুঝে পায় না, মা কেন এত কম নানার বাসায় যায়। মা বলে, ও বাড়িতে গেলে আমি আমার না দেখা মৃত ভাই-বোনদের দেখতে পাই। কিন্তু ওরা গেলে নানা নানু এত আপ্লুত হয়, যেন ওরা মহা কোনো গেস্ট গিয়েছে। নানু স্ট্রোক করার পর ঠিকমতো হাঁটতে পারে না। নানা সারাদিন ঘরে বসে একা টিভির চ্যানেল টেপে আর হুইস্কি খায়। নিকুন্তিলাকে জড়িয়ে ধরে দু'জনই কাঁদে। নানু বলে, এক দুইদিন মেয়েটাকে আমার কাছে রেখে যাওয়া যায় না ?

মা বলে, ও আমাকে ছাড়া এক রাতও কোথাও থাকে না।

আমরা 'কোথাও' হয়ে গেলাম! ইউসুফকে বিয়ে করে তুই এমন বদলে গেলি ? ও আলাদা ঘরে ঘুমায় না ?

কিন্তু মা, আমরা তো একই বাড়িতে থাকি।

মেয়েকে বিয়ে দিলে বুঝবি, আমাদের কত কষ্ট।

কতনা মেয়েকে ভালোবেসে বড় করেছ। আমার জীবনটা তোমরাই নষ্ট করেছ। মা অক্ষম জেদে বলে— আমি এই বাড়ি থেকে গিয়ে বেঁচেছি। নানু কাঁদতে থাকে। এই শাস্তি আমার প্রাপ্য। আমি মানুষ ছিলাম না...। হতচকিত নিকুন্তিলা এই সবের কিছু বোঝে না।

নানা নিকুন্তিলাকে নিয়ে হুল্লোড়ে মেতে ওঠে। নানু নিজেকে হেঁচড়ে রান্নাঘরে গিয়ে মা'র পছন্দের কত আইটেম যে রান্না করে! শনিবারে নিকুন্তিলার বন্ধ। এক শনিবারে মা লাইব্রেরি থেকে ফিরে দেখে, কেষ্টদা কারেন্টের বিল দিতে গিয়ে লাপাত্তা। বুয়া রান্নাঘরে। বালিশে

মুখ চেপে উন্মাদের মতো নিকুন্তিলা কাঁদছে।

মা নিকুন্তিলাকে ঝাঁকায়— কী হয়েছে ?

সে মুখ তোলে না। ততোধিক উষ্ণ কান্নায় বালিশ ভেজাতে থাকে। মা তাকে টেনে তুলে দেখে, মেয়ের চোখ ডুমুর দানার মতো হয়ে গেছে।

কী ? কী হয়েছে নিকু ? আমাকে বলবি না ?

নিকুন্তিলা হড়হড় করে বমি করে মা'র বুকে আছড়ে পড়ে— মা! আমি বাঁচব না!

মা ওকে টয়লেটে নিয়ে যায় প্রস্তর মূর্তির মতো। ওর মুখ ধুইয়ে এ.সি. ছেড়ে দিয়ে ওকে মুখোমুখি বসায়— আমার দিকে তাকা!

নিকুন্তিলা ঠোঁট কামড়ে কাঁপতে কাঁপতে কোনো দৈত্য দেখছে এরকম ভয়ে চারপাশে তাকিয়ে গোঙাতে থাকে— আমাকে লুকিয়ে রাখো মা। মা স্থবির বসে থেকে নিকুন্তিলাকে ধাতস্থ হতে সময় দেয়। দীর্ঘ হেঁচকির টানাপোড়নে সে কিছু বলতে পারে না। বিড়বিড় করে নিকুন্তিলা বলে, তুমি চলে গেলে অনেক চকলেট নিয়ে আজ আকতার কাকু এসেছিল।

মা'র মুখ রক্তশূন্য হয়ে ওঠে।

নিকুন্তিলা হেঁচকি তুলে বলে, আমি আমার ঘরে পড়ছিলাম। সে পেছন থেকে এসে কষে আমার বুক চেপে দিল! এত কষ্ট মা! মনে হচ্ছিল জ্ঞান হারিয়ে ফেলব! এরপর আমাকে চুমো খেতে খেতে বিছানায় যখন নিচ্ছে, আমি চিৎকার করে বুয়াকে ডাক দিতেই আমাকে ছেড়ে দিয়ে কসম কাটাল, আমি যেন কাউকে কিছু না বলি। এরপর চলে গেল।

নিকুন্তিলা স্পষ্ট দেখে মা'র মাথা টলছে। জেদে আক্রোশে মা'র মুখ বিষাক্ত হয়ে উঠছে... কিশোরীর জীবন নিয়ে সেদিনের ডিসকাস... মা'র সফেদ শাড়ি অবিন্যস্ত! এক যন্ত্রণাকর চিৎকার গিলে মা ক্রমশ তার সহজাত স্বভাবে ফিরে আসে— থ্যাংক গড! অল্পের ওপর দিয়ে গেছে। আজ একটা মহা সর্বনাশ ঘটতে পারত। এইবার মা অচেনা। সে বোকার মতো মা'র দিকে তাকিয়ে বলে— এটা কোনো ঘটনাই নয় ?

মা বলে, এইসব নষ্ট অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই আমাদের বড় হতে হয়।

তোমার হয়েছে ? চোখ মোছে নিকুন্তিলা।

সেই শৈশবে, আমারও হয়েছে। এরপর কেউ ভালোবেসেও আমার শরীর ছুঁতে চাইলে আমার শরীর ঘিন ঘিন করত। নিকু, এই দুঃস্বপ্ন দিয়ে তোর জীবন নষ্ট করবি না। এই জেদের ওপর তুই শক্ত পায়ে দাঁড়াবি।

মা... মাগো...। মা'র বুকে আছড়ে পড়ে নিকুন্তিলা, আমার যদি বাচ্চা হয়ে যায় ?

কেউ শুধু বুক ছুঁলে, চুমো খেলে, বাচ্চা হয় না।

তবে যে সেদিন বললে— পিরিয়ডের পর...।

সে আরো ব্যাপার আছে, তোকে খুলে বলব। আপাতত তুই শান্ত হ।

নিকুন্তিলার ভেতরের হেঁচকি থামে না।

চল্, বাইরে যাই, চিকেন ফ্রাই খাবি!

মা আমার গা ঘিনঘিন করছে! আবার বমি হয়ে যাবে!

মা নিকুন্তিলাকে বুকে চেপে অনড় বসে থাকে।

বাবাকে কিছু জানানো হয় না।

নিকুন্তিলার এক ভয়ার্ত জীবনের সূত্রপাত হয়।

সম্মুখে রাত্রি।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্তব্ধ বিমূঢ় নিকুন্তিলা নৈশপ্রাণে ছটফট করে ওঠে। কতক্ষণ সে দাঁড়িয়েছে, স্মরণ করতে পারে না। তার মূর্তি চোখের সামনেই রাত্তিরটা গড়িয়ে হেলান দিয়ে গভীর রাতে রূপ নিয়েছে। প্রতিদিন যে মেয়ে বিকেল, রাত, সন্ধ্যার বিবর্তন দেখার সুযোগ পেলে প্রতিটি ইন্দ্রিয় দিয়ে এর রূপ, রঙ নিজের অস্তিত্বের মধ্যে ধারণ করে, আজ সে বোধ করছে তার সেই বিকশিত অস্তিত্বের মধ্যে একটাই রঙ ঢুকে গেছে, ভয়ঙ্কর বিবমিষা এক কঠিন কালো। যা ভেদ করে তাকে আলোড়িত করে এই অনুজ্জ্বল ধরণীতে তেমন কোনো বাতাস নেই। ভেতর থেকে ঠেলে ঠেলে বমি উঠছে, কিন্তু সেটা নিকুন্তিলার গলা অব্দি এসে ফের মিশে যাচ্ছে সেই কালো চক্রের মধ্যেই। নিকুন্তিলা আজ সত্যিই অশরীরী এক ছায়া। নিজের গৃহটাকে মনে হচ্ছে একটা ক্লিষ্ট, খয়েরি কুয়ো। যেখানে প্রবেশ করলে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা পড়বে সে।

সেখানে ঢুকলেই লম্বা লম্বা নখের আঁচড়, কোনো মানুষ নয়, বরং হরর ছবির মতনই একজন চেনা মানুষের বদলে যাওয়া ভয়ঙ্কর কুৎসিত দপদপে এক মুখ।

মা ঘুমিয়ে আছে। বাবা আজ ফোনে জানিয়েছে বিদেশী ক্লায়েন্ট এসেছে, ফিরতে গভীর রাত হবে।

সে এই কিশোরী শরীরটাকে কোথায় লুকায়? মনে হয় মা'র সাথে সাঁতার শেখার শেষ সময়টায় জলের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে, ভেসে আকাশ দেখতে পাওয়ার যে উন্মাদনায় সেদিন সে তুমুল রোমাঞ্চিত হয়েছিল, সেই সুইমিংয়ে ঝাঁপ দিয়ে পুরো সত্তাটাকে একবার ধুয়ে নিয়ে আসে।

কিন্তু ভেতরে ঢুকে যাওয়া কালো? ছুরি দিয়ে সমস্ত অস্তিত্বটাকে ফালা ফালা করে ফেললেও কি সব রক্তের লাল থেকে কালো রঙটা বেরোবে?

কুয়োতে ঢোকার ভয়ে ছাদের দরজার চাবি নিয়ে টাটানি ধরে যাওয়া ভারি দুটো পা নিয়ে সে সিঁড়ি টপকায়!

হাঁ আকাশ!

কিন্তু নিঃশ্বাসের সামনে এমন বিষ গন্ধ কেন ?

চারপাশে রাত্তিরের আলোকজ্জ্বল মৃদু কোলাহল।

নিকুন্তিলা ভয়ে ভয়ে রেলিংয়ে হেলান দিয়ে আকাশের দিকে তাকায়। সার সার তারকা নয়, দিগন্তব্যাপী মোজাইক করা মেঝে। উপুড় হয়ে বসে পড়ে সে, চোখ বন্ধ করে। কিন্তু আশ্চর্য! চোখ বুজলেই সেই নখর মানবের বীভৎস চেহারা। প্রায় ছেলেবেলা থেকে মাঝে মধ্যেই আকতার কাকু এই বাড়িতে এসেছে। নিকুন্তিলার জন্য নিয়ে এসেছে চকলেট, করেছে নিষ্পাপ স্নেহময় আদর। ছবিগুলোতে ভিলেনদের চেহারা দেখলেই কিছু মুহূর্ত পর তাদের আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু যে মানুষটার চেহারা দেখলেই তার নিষ্পাপ অবয়ব দেখে বুঝে উঠার বয়স থেকেই নিকুন্তিলার সমগ্র সত্তা শ্রদ্ধায় নত হয়ে এসেছে, কী করে একটা দুপুরের নির্জনতায় তার মধ্যে জান্তব পশু ভর করে ?

অন্তরাত্মা ছিঁড়েখুঁড়ে স্তব্ধ ফোঁপানি। চোখে এক ফোটা জল ওঠে না। অথচ এই দৃশ্য সে কত স্বাভাবিক চোখে সিনেমায় নাটকে দেখেছে। পেপারে পড়েছে এর চাইতে শতগুণ অত্যাচারের কাহিনী। দল বেঁধে রেপ করে কিছু পুরুষ মেয়েটাকে জবাই করে ফেলে রেখে গেছে চরাঞ্চলে। নিউজ পড়তে পড়তে কখনো সেই ভয়াবহ বিপন্ন মেয়েটা, যার নগ্ন শরীর ছিঁড়ে কেটে ঢুকছে একের পর এক পুরুষ, তার পরম স্বজনেরা হয়তো নিশ্চিন্তে ভাত খেতে বসেছে। এমনও হয়তো হয়েছে অন্য সময় মেয়েটার শরীরে পিঁপড়ে কামড় দিয়েছে বলে ছটফট করে উঠেছে তার বাবা, সে একটি নির্জন এলাকায় কিছু রাক্ষসের অত্যাচারে যখন আকাশটাকে নীল দেখছে, তার সামনে ঝলসে উঠেছে ছুরি— সেই মেয়েটাকে নিজের অনুভবে আনতে গিয়ে নিকুন্তিলার কল্পনা থমকে গেছে। সে পেপারটা ভাঁজ করে টিভি দেখতে দেখতে ভুলে গেছে মেয়েটার কথা।

আজ দুপুরে বলা যায় সেই বীভৎসতার সিকিমাত্রও তার জীবনে ঘটে নি। তারপরও যার হাত কেটে যায় ব্লেডে, সে আরেকজন মানুষের দু'পা ট্রেনে কেটে যাওয়ার যন্ত্রণা অনুভবে এনেও নিজের হাত কাটার কষ্ট ভুলতে পারে না।

যে নিকুন্তিলা হাজারবার চেষ্টা করেও দুপুরের বাস্তব স্মৃতিটা যাতে চোখের সামনে না আসে, তার জন্য সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে প্রকোষ্ঠ থেকে প্রকোষ্ঠে পালিয়ে বেড়িয়েছে, সে রেলিং-এ ভর দিয়ে প্রাণপণে সেই বাস্তবতার মুখোমুখি ফের দাঁড়াতে চায়।

মা তখন লাইব্রেরিতে।

ইশকুল বন্ধ থাকায় নিকুন্তিলা নিজের ঘরের আয়েশি বিছানায় শুয়ে আরব্য রজনীর কিশোর সংস্করণটা পড়ছিল। কলিং বেলের শব্দ। নিকুন্তিলার হুঁশ হয়, বুয়া এখন বেঘোর ঘুমে। কেষ্টদা বাজারে। ছুটতে ছুটতে দরজা খুললে— আকতার কাকু। চিরকালীন সোহাগে তার হাত ধরে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে নিকুন্তিলা অবাক— মা-তো বাসায় নেই। লাইব্রেরিতে গেছে।

তোমার বাবা কোথায় ?

বারে! কোনোদিন বাবাকে তুমি দুপুরে এ বাসায় দেখেছ ?

ছোট্ট খুকি! আমি আজ স্পেশালি তোমার সাথেই দেখা করতে এসেছি! তা ছোট্ট খুকি, কী করছিলে তুমি ? বলতে বলতে আকতার কাকু নিকুন্তিলার রুমে আসে!

আমি যথেষ্ট বড় হয়েছি! নিকুন্তিলা টানটান হয়, আমাকে ছোট্ট খুকি বলবে না!

কী একটা শব্দ হয়! ছাদের রাত্তিরে বসে চমকে নিকুন্তিলা টের পায়, কোথায় যেন কে গুলি ছুঁড়েছে। আসমান থেকে ধেয়ে নামছে কুয়াশা! শরীর ভিজে যাচ্ছে! কিন্তু তার প্রস্তর শরীর ভেদ করে কনকনে শীত ভেতরে ঢোকে তার এত সাধ্যি কোথায় ? নৈঃশব্দ ফুঁড়ে উত্থিষ্ঠিত শব্দের দিকে তার চোখ ধাবিত হয়। ধু ধু শূন্যতা। যেন সে এক মস্ত চরের মধ্যে একাকী দাঁড়িয়ে। তার চারপাশে জলস্রোতের সন্ত্রাস।

কী বই পড়ছ তুমি ? আকতার কাকু বইটা হাতে নিয়ে চমকে ওঠে, আরব্য রজনী! তাহলে তো তোমাকে খুকি বলে অন্যায়ই করেছি আমি!

জি না কাকু, ভালো করে দেখুন, এটা কিশোরদের জন্য রচিত আরব্য রজনী।

নিকুন্তিলার বিছানায় বসে আকতার কাকু মহা উদ্বিগ্ন। বুঝলে আমাদের লেখকদের এই মস্ত সমস্যা। হাতে কলম থাকলেই তার যথেচ্ছাচার ব্যবহার ঘটায়। বড়দের জন্য লিখিত অনেক বইকে কেটে ছোট শিশুদের উপযোগী করে ফেলে। এর ফলে যে সমস্যাটা হয়, কিশোর বয়সে একটি খণ্ডিত বই পড়ে একজন কিশোর পাঠকের সেই বইটি সম্পর্কে বড় হওয়ার পর কোনো কৌতূহল থাকে না। একটি অনেক বড় সৃষ্টির ভাণ্ডার থেকে সে তখন বঞ্চিত হয়।

নিকুন্তিলা নখ খুঁটতে থাকে।

ছাদের ওপর ঝুলন্ত শীত, দুপুরের ছায়া ঘরকেও গ্রাস করে। সে পর্দা খুলতে যাবে যখন, আকতার কাকু নিস্পৃহ মুখে জিজ্ঞেস করে, নিকু তুমি কখনো ব্লুফিল্ম দেখেছ ?

সে রক্তাভ হয়ে ওঠে। নিজেকে সজোরে সামলে সে শান্ত কণ্ঠে বলে, ওটা আবার কোনো দেখার বিষয় হলো বুঝি ? মা'র কাছে শুনেছি! কিছুটা শুনেই বমি এসেছে!

মা তোমার সাথে সব গল্পই করে বুঝি ?

মা'র সাথে আমার কথা হয় না পৃথিবীতে এমন কোনো বিষয়ই নেই।

মা তোমাকে মানুষের শরীরের আনন্দ সম্পর্কে কিছু বলে নি ?

যেন ডুব সাঁতার থেকে ভুস... মাথা তুলে নিকুন্তিলা আবার আকাশটাকে দেখতে চায়। ধোঁয়ার মতো কুয়াশা ঢেকে রেখেছে ব্যাপক শূন্যতাকে। আজ রাতটা কি ছাদেই কাটাব ? ভাবতে ভাবতেই ছটফট করে সে গিয়ে পড়ে আকতার কাকুর কাণ্ডে।

সে সবে পর্দাটা সরাবে অমনি পেছন থেকে ওকে আলগোছে জাপটে ধরে টেনে বিছানার দিকে নিতে চায় মানুষটা। দু'হাতে স্তন পিষে বলে, প্রতিটি মানুষেরই এই আনন্দ নেয়ার দরকার আছে।

বাকরুদ্ধ বিমূঢ় নিকুন্তিলা চোখ গোল করে দেখে চিরদিনের চেনা আপন মানুষটার বদলে যেতে থাকা পাষণ্ড চেহারা...। ওকে কষে চুমু খেয়ে মানুষটা বলে, আমি তোমাকে একদম

কষ্ট দেব না... প্লিজ নিকু...।

ভূমণ্ডল ফুঁড়ে নিকুন্তিলার চিৎকার ওঠে— বুয়া...বুয়া।

ওকে ছেড়ে দিয়ে... সরি...সরি নিকু, বলতে বলতে মানুষটা তিন লাফে বাইরে বেরিয়ে যায়।

কাঁদতে কাঁদতে যখন ঢুলঝিমুনি, মা এসেছে।

নিকুন্তিলা যাতে এই স্মৃতির ভয়াবহতা থেকে বেরিয়ে আসে তার জন্য মা সন্ধ্যা অব্দি মানুষের জীবনের অনেক দুঃসহ ঘটনার কথা বলে।

রাতে ও ঘুমিয়েছে ভেবে ওর কপালে চুমু খেয়ে মা চলে যাওয়ার পর সে ধীর পায়ে বারান্দায় দাঁড়ায়। একজন মানুষ ওর শরীরে প্রবেশ করে নি বলেই মা এই বিষয়টার গুরুত্ব এতখানি কমিয়ে দেখল ? ওর মতো মা একটুও চমকে উঠল না, একজন এত আপন মানুষের চেহারা কী করে বদলে যায়, সেই বিস্ময়ের কথা ভেবে ? মা কি তবে এই বিশ্বাস করে— পৃথিবীতে অপরাধীর কোনো শাস্তির প্রয়োজন নেই ? এই বিশ্বাসে কি মা স্থির, যা ঘটেছে কোনো বিচারের কারণে তো সেই ঘটনাটা মুছে যাবে না ?

কিন্তু প্রতিশোধ স্পৃহার দগ্ধতায় নিকুন্তিলার মাথায় যে এক মস্ত পাথর আসন গেড়ে বসেছে! তবে কি মা-ও এর চাইতে ঢের বিশ্বাসভঙ্গ এবং অযুত নিযুত পতনের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছে ?

মা! আমি তবে কাকে বিশ্বাস করব ?

তোমার এই ক্ষতিটার ভয়ই আমি পাচ্ছি... মা বলছিল, তুমি এখন এক ছকে সব মানুষকে ফেলতে থাকবে। তুমি বড় হচ্ছ, তোমার এখন নিজের মধ্যে সাংঘাতিক করে তুলতে হবে তোমার অন্তর্দৃষ্টিকে। সেই চোখ দিয়েই, চেনা... বিশ্বাস অবিশ্বাস, কিছু মানুষের পতনের জন্য তুমি অবিশ্বাস করে একজন ভালো মানুষের প্রতি অবিচার করতে পার না।

না, এইসব কোনো যুক্তিই তাকে স্বস্তি দিচ্ছে না। লোকটা স্পর্শ কেন, তার দেহটার দিকে তাকালেই সে বোধ করত কেউ তাকে লেহন করে গেছে। আরশচ্যুত নিকুন্তিলা ছাদের ওপর শরীর ছেড়ে দিয়ে ক্রমশ এই অনুভবে দাঁড়ায়। তার প্রতিটি ইন্দ্রিয়, অন্তরীক্ষ ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে একজন সারা জীবন চেনা মানুষের এক মুহূর্তের আমূল বদল এবং নখর দিয়ে তাকে বিদ্ধ করতে চাওয়ার ভোগাকাঙ্ক্ষাকে সে মেনে নিতে পারছে না।

প্রতিটি দ্রাঘিমায় দ্রাঘিমায় নিকুন্তিলার ঘৃণিত বিষবাষ্পোচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। নিকুন্তিলার ইচ্ছে হয়, ওপর আকাশ থেকে নেমে আসা কোনো নুহের কিশতিতে বসে সে অনন্তলোকে মিলিয়ে যায়।

মুখ তুলে ভূতের মতো থেকে চমকে ওঠে সে।

সামনে একজন ছায়া মানুষ। এই স্তব্ধ নির্জন ছাদে এক্ষুণি মানুষটার মুখোশ খুলে যাবে, চামড়া খুলে যাওয়া পুড়ে যাওয়া সেই মুখ এক্ষুণি তার মুখের ওপর হামলে পড়বে। তার কোটের পকেট থেকে বেরিয়ে আসবে লম্বা লম্বা নখ, নির্জন ছাদ ধরে দৌড়ে সে রেলিং পর্যন্ত গেলে মানুষটি তাকে জড়িয়ে ধরে।

মা... মা... গো... আমাকে বাঁচাও... বেহুঁশের মতন যখন সে চিৎকার করছে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে তাকে থিতু করে ক্রমশ মানুষটি মূর্ত হয়... নিকু... নিকু... সোনা তোর কী হয়েছে ? আমি বাবা! আমার কিচ্ছু শব্দ তোর কানে যাচ্ছে না ?

অসীম তন্দ্রায় বাবার কোলে সে ঢলে পড়ে।

রাতে নিকুন্তিলা শোনে, মা বাবাকে বলছে— আজকে ইশকুল থেকে আসার পথে ও একটা খুনের ঘটনা দেখেছে। একজন ছেলেকে চার-পাঁচ জন মিলে কোপাচ্ছে। সেই থেকেই কেমন করছিল। আমি তো ওকে ঘুম পাড়িয়েই নিজের ঘরে এসেছি। কখন যে ও ছাদে গেল!

বাবা বলে, আমার এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের কাজ... কত যে ব্যস্ত থাকতে হয়, নিতু, তোমাকে দোহাই দিয়ে বলি— এরকম নিয়মিত এলকোহল খেয়ো না। মেয়েটাকে তো তোমাকেই দেখতে হবে! এছাড়া প্রত্যেকটি বিষয়েরই একটি শৃঙ্খলা, পরিমিতি দরকার... তুমি যদি আমাকে নিয়ে সুখী না হও...।

না! না! মা চিৎকার করে ওঠে, আমাকে একটু সময় দাও... যে-কোনো এডিকশনকে, বিশ্বাস কর, ইউসুফ, আমি ঘৃণা করি, যে আমি সুন্দরকে পূজা করি, সেই আমার নান্দনিকতাকে এডিকশন কুৎসিত করছে। তুমি বিশ্বাস কর, আমি এ থেকে বেরোব, কেননা, আমি আয়নায় নিজেকেই নিজে যখন অসুন্দর দেখি, মনে হয়, মাথার মধ্যে পিস্তল ঠেকিয়ে নিজের খুলি নিজে উড়িয়ে দিই। ইউসুফ, আমার জন্মের পর থেকে এত বিষাক্ত কষ্টের ছায়া আমাকে তাড়া করে বেরিয়েছে, কোনো নেশার সাধ্য নেই, তাকে অতিক্রম করে... আই লাভ য়্যু ইউ ইউসুফ... লাভ য়্যু।

পরদিন বাবা অফিসে বেরিয়ে গেলে মা নিকুন্তিলাকে নিয়ে বাইরে বেরোয়। শীতের মধ্যে কী যে কী হলো, বৃষ্টি নেমেছে। ঝিরঝির বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি দিয়ে ঘুরে সারা শহর চক্কর খায়।

হাসতে হাসতে বলে, এক জায়গায় তোকে নিয়ে যাই। এরপর এক চীনে রেস্তোরাঁয় বসে বলে— থ্যাংক গড, ঠিক সেই চেয়ার-টেবিলটাই খালি আছে। সেখানে বসে মা স্রেফ স্যুপের অর্ডার দিয়ে বলে, এই চেয়ারটায় বসেই তোর বাবা আমাকে প্রথম বিয়ের প্রস্তাব দেয়।

তোমাদের ভালোবাসার বিয়ে ছিল ?

না।

তবে যে সেদিন বললে তোমাদের বিয়েতে নানা নানু, শান্তনু মামা, জহির কাকু... খালামণি... এই কয়জন উপস্থিত ছিল ?

ছিল।

একমাত্র মেয়ে তুমি, কোনো জাঁকজমক হয় নি ?

হয় নি।

তোমার এ রকম ইয়েস নো মার্কা কথা শুনতে ভালো লাগছে না— নিকুন্তিলা বলে। ঝেড়ে কাশো মা।

স্যুপ এসে যায়। নিকুন্তিলা আগে মায়ের বাটিতে দিয়ে, পরে নিজে নেয়। হিমহিম আলোছায়ার বিচ্ছুরণ— সাথে মৃদু ছন্দের মিউজিক... হলে হবে কী ? নিকুন্তিলা এখানে নেই... রাত এলে দৈত্যের মতোন হয়ে ওঠে আকতার কাকুর দাঁত, সে কামড় বসায় উরুতে... মা'র ঊর্ধ্বমুখী দুই পা... বেরিয়ে আসছে রক্তাক্ত নিকুন্তিলা... হাঁপাতে হাঁপাতে ঘুম ভাঙে। আজকাল বাবার কাছে ঘেঁষতেও আড়ষ্ট বোধ করে... বাবার মুখটা আকতার কাকুর মুখের মতোন হয়ে যায়। মা'র সাথে ইদানীং শান্তনু মামার দোস্তি যেন আরো গাঢ় হয়েছে। প্রায়ই সে আসে, ঘণ্টা ঘণ্টা আড্ডা হয়। নিকুন্তিলার ওই মানুষটাকেও হিংস্র মনে হয়। এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল ওর জীবনে! মা'র কোনো বিকার নেই ? মা কি আবারও সেই আগের মতো তার জীবনের দূরতম মানুষ হয়ে উঠবে ?

না। নিকুন্তিলা, মাকে আর হারাতে চায় না। এই ভয়াল পৃথিবীতে কে তাকে বাঁচাবে ? নাকি বাবাকে জানিয়ে দেবে সব ? বাবা আকতার মামাকে জুতোপেটা করলে তবে যদি নিকুন্তিলার জানের আরাম হয়!

ও-কী! আর স্যুপ নিচ্ছিস না ?

ইচ্ছে করছে না।

মা'র মোবাইলে ফোন আসে— মা কাকে যেন বলে, তুমি সামনে আমার গাড়ির কাছে দাঁড়াও, আমরা এক্ষুণি আসছি।

চারপাশ কুয়াশা করে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির অস্বচ্ছ পতন। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে নিকুন্তিলা গম্ভীর আর আড়ষ্ট হয়ে যায়। তাদের গাড়ির পাশে শান্তনু মামা— তোমার এত জরুরি তলব, আমি সকাল থেকে নাভিশ্বাসে হাতের কাজ সেরেছি।

সবাই গাড়িতে উঠলে শান্তনু মামা জিজ্ঞেস করে— তা আমরা যাচ্ছি কোথায় ?

এই, বাঁয়ে দাঁড়াও, ঘড়ি দেখে মা ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে রাস্তার কর্নার থেকে গাড়িতে বসেই কিছু গোলাপস্তবক কেনে।

চূড়ান্ত বিরক্তিতে ভেতরে ভেতরে ফেটে পড়ছে নিকুন্তিলা। তার এই রকম মানসিক অবস্থায় কাউকে উইস করতে যাওয়ার মতো বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তার। সে চাপা কণ্ঠে বলে, মা, আমাকে দিয়ে এস।

মা রহস্যময়ভাবে চুপ।

শান্তনু মামা যেন মা'র এই হেঁয়ালি চেনে। সে কোনো কথা বলে না। রাস্তা ডান-বাঁ করে একটা কলেজের সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রায় ছুটে সবাই কলেজের করিডোর পেরিয়ে ছাত্র-ছাত্রীর ভিড় পেরিয়ে প্রিন্সিপালের রুমে ঢোকে।

আজ কি প্রিন্সিপালের জন্মদিন ? যা হোক, অসহ্য লাগছে নিকুন্তিলার। মাকে বোঝা কঠিন। ওকে দেখে প্রায় চিৎকার করে ওঠেন প্রিন্সিপাল, আরে মিসেস নিতু সুলতানা যে! আসুন! আসুন!

ও আমার মেয়ে আর উনি শান্তনু, আমার বন্ধু।

বসুন! বসুন! বেল টেপেন প্রিন্সিপাল।

না, স্যার, কিছু খাব না!

সে কী! এদ্দিন পর এলেন! আপনার মতো টিচারকে আমরা খুব মিস করি, তা মেয়ে তো অনেক বড় হয়ে গেছে। ওর প্রথম না দ্বিতীয় জন্মদিনে আমি গিয়েছিলাম।

তৃতীয় জন্মদিনে, বলে মা চারপাশে তাকায়, আনোয়ারা, রাশেদা আপারা আছেন না ?

পিওনকে ডেকে সব আপাকে খবর দেন প্রিন্সিপাল। তারা মাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে— এদ্দিন পর আমাদের কথা মনে হলো ? তা হাতে ফুল যে ? কী উপলক্ষ ?

সবাই বসলে মা বিনীত অনুরোধ করেন প্রিন্সিপালকে। আকতার, আমার হাজব্যান্ডের সেই ছেলেবেলার বন্ধু বলা যায়, ওর পরিচয়েই আপনাদের এখানে আমার চাকরি হয়েছিল। ওকে একটু খবর দেয়া যায় ?

সে কী! আজ তার বিশেষ কোনো দিন নাকি ? লাঞ্চ টাইম। প্রিন্সিপাল বেল টিপে পিওনকে বলেন— আকতার স্যারকে একটু খবর দাও। বলো, আমি ডাকছি।

নিকুন্তিলার দর্পিত ক্রোধে কেউ নুন ঢেলে দেয়। শান্তনু মামা কিছু না জেনে বোকার মতো হাসছে। বাইরে মেঘ কেটে সেখানে তালের শাঁসের মতো শাদা। সেই আলোর এক ফালি মুখে পড়া এই মা'র মুখ কোনোদিন দেখে নি নিকুন্তিলা। ভয়ে, কৌতূহলে সে কেঁচো হয়ে যেতে থাকে। রক্তের মধ্যে গুঁড়ি গুঁড়ি বিষকণার উল্লম্ফন!

আকতার কাকু রুমে ঢুকে ওদের ভূত দেখার মতো দেখে চমকে ঠায় দাঁড়িয়ে যায়। এসো...এসো... তোমার খোঁজে এতকাল পর আমার কলেজে পা পড়েছে মিসেস নিতু সুলতানার।

গ্রীবা উচ্চকিত করে নিকুন্তিলা দেখে রূপকথার কোনো ছদ্মবেশী ডাইনির মতো অদ্ভুত হাসি হেসে মা বলে, স্যার, আমার মেয়েকে কেউ যখন প্রথম কিছু দেয়, তার প্রতিদান না দিলে আমার শান্তি হয় না। মিস্টার আকতার আহমেদ আমার খালি বাড়িতে এসে আমার মেয়ের বুকে হাত রেখে, তাকে চুমু খেয়ে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করেছিল।

সমস্ত ঘরে বাজ পড়ে। সব টিচারের মুখ ছাই হয়ে যায়।

লজ্জার সাথে সাথে নিকুন্তিলা বোধ করে তার বরফ আটকে যাওয়া কণ্ঠে কেউ যেন আইসক্রিম গলিয়ে ঢোকাচ্ছে। মিশ্র অনুভূতিতে জ্বর জ্বর লাগে তার। বজ্রাহত দাঁড়িয়ে আছে

আকতার।

সেদিন সে যদি ধর্ষিতা হতো— আমি আদালতে যেতাম। মা দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করে। আমি বোধ করতাম না ওর সতীত্ব চলে গেছে। সমাজ ছিঃ ছিঃ করলে আমি তাকে চির অবিবাহিতা রাখতাম! আমি ওকে সেভাবেই গড়ে তুলছি স্যার! কিন্তু আপনারা থাকতে আমি এই বয়সেই মেয়েটাকে খবরের কাগজ আর সামাজিক যুদ্ধের মধ্যে দেখতে চাই না। আর যেহেতু শৈশব থেকে আকতারের মধ্যে আমি এই রকম লালসা আগে দেখি নি। সামাজিকভাবে তার জীবন এত শিগগির নষ্ট হোক— তা-ও আমি চাই না। কিন্তু স্যার, দুঃস্বপ্নে আমার মেয়ের ঘুম হয় না। তার বাবা তাকে আদর করতে গেলেও সে কুঁকড়ে যাচ্ছে— তাবৎ পুরুষ জাতির প্রতি আমার মেয়েকে ভীত করে তোলার প্রথম পুরস্কার হিসেবে আমি এই ফুলগুচ্ছ তাকে উপহার দিতে চাই!

আকতার শিশুর মতো হাউমাউ কেঁদে নিকুন্তিলার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে— আমার মাথায় সেদিন ভূত ভর করেছিল।

সমস্ত টিচারেরা স্তব্ধ।

প্রিন্সিপাল এসে সস্নেহে নিকুন্তিলার মাথা বুকে রাখলে ডুকরে কেঁদে উঠে নিকুন্তিলা।

প্রিন্সিপাল ভূলুণ্ঠিত অবস্থা থেকে আকতারের চুল ধরে টেনে রাগে কাঁপতে কাঁপতে তার মুখে চড় বসিয়ে দেয়— ছিঃ!

রাতে বহুদিন পর মা'র সাথে ঘুমিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে নিকুন্তিলা— আমি যদি আর কোনোদিন তোমাকে ভুল বুঝি, তবে মা আমার যেন—।

চুউপ! মা ওর ঠোঁট চেপে ধরে।

মা! য়্যু আর গ্রেট!

এর পর গভীর বিস্ময়ে সে মা'র মুখের মধ্যে দেখতে পায় সংমিশ্রণ, কাঠিন্য এবং কোমলতার। ক্লান্তি অবসাদ থেকে বেরোনো উজ্জ্বলতা, অথবা বেদনা কিংবা তৃপ্তি, অতৃপ্তি। সে সিঁড়ি অতিক্রম করতে গিয়ে টের পায়, পায়ের মধ্যে বেঁধে দেয়া মস্ত ইটগুলো কেউ খুলে নিয়েছে।

হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা শেষে বাবা সুন্দরবন নয়, নিকুন্তিলাকে নিয়ে ময়মনসিংহ যায়। যেহেতু মা'র স্বপ্ন সুন্দরবন ঘোরার আর বাবার বিজনেসের কাজ ময়মনসিংহে— সেহেতু ওরা সবাই মিলে স্থির করে সুন্দরবনে মা ফ্রি হলেই ওরা যাবে। আর বিজনেসের কাজও অত বেশি সময়ের নয়। এক বেলাকার ব্যাপার। তখন না হয় বাবা নিকুন্তিলাকে সাথে নিয়েও গেল। বাকি সময় ব্রহ্মপুত্র, কৃষি ইউনিভার্সিটি, জয়নুল আবেদিনের সংগ্রহশালা। বাবা প্রথমদিন

গিয়েই ওইখানকার সবচাইতে ভালো হোটেলের রুম বুক করে সারা ঘরে এয়ার ফ্রেশনার ছড়িয়ে দেয়। মশা যাতে না লাগে তার জন্য জ্বালিয়ে দেয় কয়েল।

কী খাবি ?

নিকুন্তিলা বলে— পরোটা মাংস।

তা-ই অর্ডার দেয় বাবা। নিকুন্তিলা ওয়াকম্যান এনেছে সাথে, তার ভীষণ প্রিয় ইংরেজি গান, মা ইংরেজির ছাত্রী হলে কী হবে, রবীন্দ্রসঙ্গীত ক্লাসিক্যাল আর বাংলা পুরনো গানের প্রতি রয়েছে তার দারুণ মোহ। বাকি দুইটা তা-ও পছন্দ করে নিকুন্তিলা, কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক অসহ্য। একই কথা ঘুরে ঘুরে নানা ভঙ্গিতে বারবার। কী করে যে সহ্য করে মা!

সে মা'র পুরনো গান আর রবীন্দ্রসঙ্গীতও এনেছে। সুন্দর রুমটায় বাবার পাশে শুয়ে যখন কানে ওয়াক ম্যান— বাবা বলে, নিশ্চয়ই হিন্দি শুনছিস ? নিকুন্তিলার চোখ ভিজে ওঠে, সে মা'র সবচাইতে পছন্দের গানটা বাবার কানে চাপিয়ে দেয়— যদি জানতেম, আমার কীসের ব্যথা...!

কী রে ? এতো বিষণ্ন কেন ?

মা'র কথা খুব মনে পড়ছে।

আমারও পড়ছে। বাবা শাদা ছাদের দিকে তাকায়, কাল মিটিং শেষে ব্রহ্মপুত্রে যাব, তোর সাথে অনেক গল্প করব। এত ব্যস্ত থাকি! তোর সাথে বন্ধুত্বই হলো না। এই শহরটা অনেক প্রাচীন। নোংরা, খিচখিচে— তা-ও যেন কী মায়া আছে এই শহরে, এরা সব ভেঙে আধুনিক হওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত হয় নি...। নিকুন্তিলা পরোটা খেয়ে হাই তোলে।

ঘুম পাচ্ছে ?

মাকে মনে পড়ছে।

ধুর! এখন তুই আর আমি। তোর মাকে আমরা মজা করে গিয়ে যা ঈর্ষা লাগাব না!

বাবা, আই লাভ য়্যু।

আমিও!

বাবা যখন তার ক্লায়েন্টদের সাথে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত, এক কোনায় বসে নিকুন্তিলা তখন চুইংগাম খাচ্ছে। আকতার কাকু... পুষ্পস্তবক... মা'র অচেনা মুখ মনে পড়ে, মা সেই শোধটা নেয়ার পর সে বোধ করছিল, সে ক্রমশ রাজহাঁস। কে যেন বাতাসের তরঙ্গে তরঙ্গে শব্দ তুলেছিল, তোমার জীবনে রঙ আছে, সেই রঙ দিয়ে তুমি হোলি খেলো। রঙ মাখিয়ে দাও সব ক'টা বিষাদে। তারা হেসে উঠুক, নেচে উঠুক গেয়ে। চমক ভাঙা নিকুন্তিলা সেদিন দূর রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে চরাঞ্চলে পড়ে থাকা যে-কোনো ধর্ষিতা মৃতার যোনি অথবা সম্ভ্রমের যন্ত্রণায় পরম মমতায় মুখ রেখেছিল। সত্যিই মা রহস্যময়ী। আর ফোনের শব্দ শুনে মা'র ছুটে গিয়ে হতাশায় ভেঙে পড়া— মা আসলে রহস্যময়ী। মাকে তার সবটা আবিষ্কার করা না পর্যন্ত ভুল বোঝা ঠিক না। ছিঃ ছিঃ! সেদিন কিশোরীদের আলোচনার সময় মাকে তার ভণ্ড পর্যন্ত মনে হয়েছে। শেষে আকতার কাকুর ঘটনার পর সে তাবৎ পুরুষকে অবিশ্বাস

করেছে, এমনকি বাবাকেও। মা বলেছে, তার সবচাইতে বিপজ্জনক মুহূর্তে শান্তনু মামা তাকে সাহায্য করেছে। বাবাকে বিয়ে করার আগে কী কারণে জানি মা ছিল বিকারগ্রস্ত— মা'র বিয়ের আগে একদিন নাকি এমনও হয়েছে— মা মেক্সির চেইন খুলে বলেছে, শান্তনু, তুমি আমার বুকের বেদনা ছুঁয়ে দেখ। প্রচুর ঘুমের ঔষধ খেয়েছিল মা। শান্তনু মামা চেইন লাগিয়ে মাকে শুইয়ে গায়ে কাঁথা জড়িয়ে দিয়েছে। বাবা এবং মা'র বিয়ের ক্ষেত্রে শান্তনু মামার ভূমিকা ব্যাপক— নিকুন্তিলাকে মা বলেছে, প্রতিটি পুরুষের প্রবণতা, চরিত্র— আলাদা, একজনের পতনের জন্য অন্যের প্রতি অবিচার করার কোনো অর্থ হয় না।

জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালায় গিয়ে নিকুন্তিলা দেখে, কাক আর মানুষের হাড্ডিসার সংগ্রামের ছবি। বাবা প্রতিটি ছবির অর্থ বুঝিয়ে দেয়। অভাব— না খাওয়ার যন্ত্রণার সাথে নিকুন্তিলা পরিচিত নয়। ফলে সে সব বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু বাবা এত নিমগ্ন ছবিতে— নিকুন্তিলার কিছু বলতে ভয় হয়।

ওরা বেরিয়ে ব্রহ্মপুত্রের পাশে বসে। নদীতে কলকল জলের শব্দ। মাঝখানে কাশবন। নিকুন্তিলার ইচ্ছে হয় নৌকায় চড়ে— কিন্তু ঢাকায় ব্যস্ত বাবা নদীর পাশে বসে উদাস— আমাকে জন্ম দিতে গিয়ে আমার মা মরে গেল। বড় ভাইয়েরা বলত আমি অপয়া। তবুও বাবার স্নেহে আমি বড় হতে থাকলাম। ভাইয়েরা দেশের বাইরে চলে গেল, এক ভাই-ই তিনজনকে নিয়ে গেল। বুঝলি নিকু এই মাটির ঘ্রাণের প্রতি আমার এত মায়া— আমাকে ওরা নিতে পারল না। ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম... ধীরে ধীরে এই দেশেই শাইন করলাম। এর মধ্যে আমার চির বন্ধু বাবা মরে গেল।

যদিও বর্ষার দিন। আকাশ ফ্যাকাশে। বৃষ্টির দেখা নেই। দূর থেকে বিচ্ছুরিত আলোর ফুটকিতে কখনো ব্রহ্মপুত্রের ঢেউয়ের স্তন, কখনো মুখ, কখনো তলপেট উচ্চকিত... নিকুন্তিলা উজ্জ্বল চোখে সেই জলঢেউয়ের খেলা দেখতে থাকে।

তোর মাকে যখন প্রথম দেখি— বাবার এই কথায় নিকুন্তিলা ভূতল থেকে ওপরে উঠে আসে।

চাইনিজ রেস্তরাঁয় ?

তোর মা বলেছে বুঝি ?

না, তুমি বলো।

চাইনিজ রেস্তরাঁয় প্রথম প্রস্তাব রেখেছি। তার আগে শান্তনুর ছোট বোনের বিয়েতে পরিচয়। শান্তনু আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়, কিন্তু তোর মা'র সাথে বন্ধুত্ব বেশি। তোর মা'র সাথে যখন পরিচয় সে তখন প্রায় বিকারগ্রস্ত। কিন্তু ওর মুখটা আমার মনে এমনভাবে গেঁথে গেল, মনে হলো ওকে জীবনে না পেলে বাঁচার কোনো অর্থ হয় না।

মা বিকারগ্রস্ত ছিল কেন ?

নিকুন্তিলার এই প্রশ্নে বাবা হকচকিয়ে ওঠে, নিকুন্তিলা স্পষ্ট টের পায় বাবা মিথ্যে বলছে—

আসলে অনেকগুলো মৃত ভাই-বোনের মাঝখানে ওর বেঁচে থাকা তো— আমাকে পাত্তাই দেয় না, বলে, সারা জীবন একা থাকবে। আমারও তো নিকু ছ্যাচড়া স্বভাব না, ওর পেছনে

লেগে থাকব। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি তা-ই হয়ে গেলাম। এক বিকেলে শান্তনুর অফিসে গিয়ে সে-কী আমার কপালে ঘাম! আমাকে দেখে সে আকাশ থেকে পড়ে— গরিবের ডেরায় হাতির পা! অফিস শেষে এক চায়ের দোকানে বসে কত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তোর মায়ের কথা বলি। সে স্ট্রেট জানায়, কাউকে বিয়ে করার মতো নিতুর মানসিক অবস্থা নেই।

ব্রহ্মপুত্রের ঢেউ— ছায়া দৃশ্যও আছড়ে পড়তে চায় শরীরে। পাকা ইটের ঢালুর নিচে নদী— কী সাধ্যি, মানুষকে ছোঁয় ? তবুও দূর আঁধারের জলের মধ্যে মা'র মুখ দেখা যাচ্ছে— আকতার কাকুকে দেয়া পুষ্পগুচ্ছ... ধুর!

নিকুন্তিলা ক্যানে করে কোক খাচ্ছে। আর বাবা মিনারেল ওয়াটারের বোতলে করে স্প্রাইটের সাথে ভদকা মিশিয়ে এনেছে, যাতে আশেপাশের কেউ টের না পায়। সন্ধ্যা বাড়ছে। গাঢ় হয়ে উঠছে বাবার কণ্ঠ। বাবা এখন ক্রমশ শিশুর মতো সরল হতে থাকবে। নিকুন্তিলা আর বাবার মধ্যে কোনো দূরত্ব থাকবে না।

মহাজলের ওপরে বাবার চোখ বিদ্ধ— আসলে তোর মা'র জীবনে একটা দুর্ঘটনা আছে। আমি চাই, তুই এই বিষয়ে আমাকে কোনো প্রশ্ন করে অপ্রস্তুত করবি না। সেই দুর্ঘটনার প্রভাবেই সে মানসিক ভারসাম্য হারাচ্ছিল। আমি তাকে সেই দুর্ঘটনার ঘোর থেকে বাঁচাতে আকুল হয়ে উঠলাম। কোনো মানুষকে সহ্য করতে পারত না। ভালো স্টুডেন্ট... এম.এ-তে ড্রপ দিল বুঝলি নিকু— তোর মাকে দেখেই আমার মনে হলো, একেই আমি খুঁজছিলাম। আমার নিঃসঙ্গ জীবনের ও-ই একমাত্র আশ্রয়। ও ঘর অন্ধকার করে একাকী বসে থাকত। শান্তনু ছাড়া আর কারো সাথে মিশত না।

ইথারে ইথারে জলের ক্রন্দন। নিকুন্তিলার গলা ছাপিয়ে মাথার কোষে কোষে ছড়িয়ে যায়। কোকের মজায় তিতকুটে এক গন্ধ! দুর্ঘটনা ? মা'র ? সেদিন আকতার কাকার বিষয়টাকে যত সহজে মা ফেইস করেছে, সেই শক্ত মনের মা'র জীবনে কী এমন বিষয় ঘটতে পারে, যাতে করে মা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছিল ? আর তার এত কাছের বন্ধু মা, এই বিষয়ে এই পর্যন্ত নিকুন্তিলাকে কিচ্ছু আঁচ পেতে দিল না ?

বাবা গলায় জল ঢালার মতো করে ভদকা খায়— তখন আমার মনে হয়, ওর মধ্যে আশ্রয় খুঁজতে যাওয়া মানে ওর প্রতি অবিচার করা, বরং সেই দুর্ঘটনার হুল পিঠ পেতে নিয়ে আমিই ওকে ধীরে ধীরে আশ্রয় দিব। শান্তনুকে অনেক ধরে সেই চিনে রেস্তরাঁয় বসা হলো। মেয়ের দুশ্চিন্তায় তোর নানা নানুও তখন উন্মাদ প্রায়। তোর নানু আমার হাত ধরে বলল— আমার মেয়েটাকে তুমি বাঁচাও।

বৃষ্টির ঘোর ? নাকি এই অচিন রাত্তিরে জলের ওপর স্খলিত কুয়াশা ? ঝাপসা সব...। বাবা উষ্ণ হাতে নিকুন্তিলার হাত ধরে— আমি তখন ডিটারমাইন্ড— নিতুকেই বিয়ে করব। রেস্টুরেন্টে মাথা নিচ দিকে দিয়ে রেখেছে তোর মা। অস্বস্তি এড়াতে শান্তনু উঠে যায়। তখন অলরেডি শান্তনু আমার সম্পর্কে বলে বলে ওকে অনেকটা তৈরি করে এনেছে। সে নত মাথা তোলে না।

তোর মাকে দেখার আগে আমি ছিলাম শিশুর মতো— আমার জীবনে আর কোনো মেয়ে আসে নি।

আর... মা'র জীবনে ?

নিকুন্তিলার এই প্রশ্নে বাবা হকচকিয়ে যায়। নিজেকে সামলে বাবা বলে, তোর মা'র জীবনের প্রাইভেসি আমি নষ্ট করতে চাই না। তুই আরেকটু বড় হলে তোর মা যদি মনে করে সে-ই তোকে বলবে। আমি চাই না আমাদের কোনো অন্ধকার দিয়ে তোর জীবন নষ্ট হোক।

বাবা, আমিও তো প্রেমে পড়েছি।

বাবার গলায় এলকোহল আটকে যায়। বিস্ফারিত চোখে সে মেয়ের দিকে তাকায়।

আহ্হা অত ভয় পেয়ো না। নিকুন্তিলা হেসে মরে, পথের পাঁচালীর— অপুর।

তুই পথের পাঁচালী পড়ে ফেলেছিস ?

আমি আলেক্সান্দর ভেলায়েভের 'উভচর মানুষ' পড়ে, ইকথিয়ান্ডরের প্রেমেও পড়েছি। সব চাইতে আগে পড়েছি— তুষার কন্যার।

এটাকে বুঝি প্রেমে পড়া বলে— মাই ইনোসেন্ট লেডি!

থ্যাঙ্ক গড! লেডি বলায়!

যে মস্ত মস্ত বই পড়েছিস! গার্ল কী করে বলি!

তারপর মা কী করল ?

মাথা নত করে বসে থাকল।

এগোও বাবা! বারবার এক কথা বলছ। মা মাথা তোলে নি ?

দেখেছিস— কাশবন! যেন নৈশপ্রহরী! প্রাণের ব্রহ্মপুত্রকে আগলে রেখেছে— তোর মাকে খুব মিস করছি। ও ভীষণ প্রকৃতি কাতর!

আমিও মিস করছি বাবা। জানো, মা তোমাকে ভীষণ ভালোবাসে।

ভাগ্যিস! আমি ওর জীবনে এসেছিলাম। বাবা বলে, নইলে তোর মা'র জীবনটা নষ্ট হয়ে যেত! ওর জীবন নষ্ট হচ্ছে— এটা ভাবলে আমার বুক ব্যথা করে। আমি পিঠ পেতে সেদিন ওর দুর্ঘটনার দায়িত্ব নিতে চাইলে চীনে রেস্তোরাঁর আধো আলোয় তোর মা সাপের মতো ফণা তুলে আমার দিকে তাকাল, বলল, একজনের দুর্ঘটনার দায়িত্ব আরেকজন নিতে পারে না— এছাড়া এটাকে আমি দুর্ঘটনা বলতে চাই না।

আমি আমার মুঠোয় ওর হাত টেনে নিলে ও খুব কাঁদল। শান্তনু বলেছে, গত দু'বছরে ওকে

কেউ কাঁদতে দেখে নি। আমি তোর মাকে আমার একাকীত্বের কথা, নিঃসঙ্গতার কথা বলে এই প্রতিশ্রুতি দিলাম, আমি বেঁচে থাকতে ওর অমর্যাদা হতে দেব না।

আমাদের বিয়ে হলো। মুশকিল ছিল একটাই— আমি অত দ্রুত সন্তান চাইতাম না। আমি চাইতাম আমরা আমাদের জীবনটাকে আগে উপভোগ করব, তারপর চার-পাঁচ বছর পর সন্তান নেব। তোর মা বিয়ের পরেই কেমন শান্ত হয়ে এল। যে জেদি অহঙ্কারী মেয়েটাকে আমি ভেবেছিলাম বশে আনতে জান হারাম হয়ে যাবে, সে যেন আমাকে বোঝার চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে উঠল। কিন্তু জেদ সে করল একটি বিষয়েই— বিয়ের পরপর সে সন্তান চাইল।

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। নিকুন্তিলা বাবার সাথে দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে ওঠে।

রাতে চায়নিজ খেয়ে ডাবল রুমের সিঙ্গেল খাটটায় গায়ে চাদর জড়িয়ে নিকুন্তিলা বাবাকে প্রশ্ন করে— মা এখন কী করছে?

নিশ্চয়ই ইয়োসার 'দা অফ দি হিরো'তে ডুবে আছে?

বাবা, এই যে দুটো আঙুল বাড়ালাম, এটা ধর!

বাবা নিজের বিছানা থেকে উবু হয়ে হাত বাড়িয়ে নিকুন্তিলার একটা আঙুল ধরে।

হিঃ হিঃ, নিকুন্তিলা হাসে, মা এখন অনুবাদ রেখে বিছানায় শুয়ে তোমার আমার কথা ভাবছে।

তুই এসব বিশ্বাস করিস?

আরে না। এটা হলো এক ধরনের বিশ্বাস করার খেলা। বাবা মশা!

বাবা খানিকটা টলছে। খুবই মৃদু ছন্দে।... এরপর সমস্ত ঘরে স্প্রে ছড়িয়ে বলে, এই শহরে এর চেয়ে ভালো কোনো হোটেল নেই।

তোমার সবটাই দামি হওয়া চাই। আমি মা'র সাথে রাস্তার পাশে বসে ফুচকা খাই। তুমি তো মিনারেল ওয়াটার ছাড়া কিসসু বোঝ না, আমরা রাস্তার পানিও খাই।

বাবা প্রায় আঁতকে ওঠে— তোর মা তোর বারোটা না বাজিয়ে ছাড়বে না।

এই গরিব দেশে বাবা ক'জন এমন আলীশান জীবনযাপন করতে পারে। সব রকম অভ্যাস থাকাই ভালো।

মা-তো তোকে ভালোটাই শিখিয়েছে, কিন্তু নিকু জীবন একটা। যার যতটুকু সাধ্য ততটুকু এনজয় করার অধিকার সবার আছে।

আমি ফুটপাতের চটপটি এনজয় করি।

ম্যালা বকবক হয়েছে। কাল সকালে এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি ঘুরে বিকেলে ঢাকায় চলে যাব।

স-ত্যি ? নিকুন্তিলা লাফিয়ে ওঠে। মাকে হেভি সারপ্রাইজ দেয়া হবে। মা-তো জানে পরশু যাচ্ছি।

রাতে ঘুমের অতলে নিকুন্তিলার মাথায় ঘাই দেয় নদীর পাড়ে বসা বাবার কথাগুলো। বাবা কেন এত তাড়াতাড়ি চাইতেন না নিকুন্তিলার জন্ম হোক। সেদিন মা-ও বলছিল, কী এক কাহিনী আছে। বাবার ওপর অভিমান করবে সে ? আর দুর্ঘটনা ? কী ? মা যে দৌড়ে ফোন রিসিভ করতে যায়, এর সাথে তার কোনো সম্পর্ক আছে ? বাবা মাকে এত ভালোবাসে ? এত একজন স্বামীর সবটুকু উপুড় করা ভালোবাসাতেও একজন স্ত্রীর কষ্ট ঘোচে না ? তবে এটা ঠিক, মা তার বিশাল কোনো কষ্ট বাবার কাছ থেকে সন্তর্পণে আড়াল করে রেখেছে। এ মা'র এক মস্ত ক্ষমতা। বাবার যা প্রাপ্য, নিজের বিষ গিলেও তা থেকে বাবাকে সে বঞ্চিত করছে না। আর মা'র এলকোহল, রাত্তিরে জাগা, ভোরে বাবার নাস্তার টেবিলে না বসে ঘুমিয়ে থাকা— অনেক আধুনিক দম্পতি তার বাবা-মা।

অজন্তা সেদিন বিমর্ষ কণ্ঠে বলেছিল— আমি যে কী কুকুরের জীবনযাপন করি! তুই অনেক ভাগ্যবতী! একদিন আমি আকাশের তারার মতোন হারিয়ে যাব। অজন্তা এত চাপা কেন ? কী তার দুঃখ ?

বাবা, ঘুমিয়ে পড়েছ ?

নারে, আরেক পেগ খাব। কেমন যেন জুত হচ্ছে না। তোর ওয়াকম্যানটা দে, গান শুনি।

বাবা, সবই ইংরেজি আর হিন্দি।

এই জন্য লুকিয়ে শুনিস ? তোর মা বাংলা শেখায় নি ?

মা বলেছে অবদমন রাখতে নেই। এই বয়সের ক্রেজই নাকি এটা। রুচির ভিতটা যেহেতু মা বোধ করে আমার ভালো, সব শুনে পচে গেলে আমি নিজ থেকেই ক্ল্যাসিক্যালে ঝুঁকবো। মা'রও তাই হয়েছিল।

তবে যে কাল রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনালি ?

বাবা, ওইসব ব্যাগে রাখা, উঠতে ইচ্ছে করছে না।

ইংরেজি ভালো কী আছে ?

তোমার কার্পেন্টার্স ভালো লাগবে।

দে তাই দে।

নিকুন্তিলা স্বপ্নেও ভাবে নি, এই বয়সে তার মাথায় এমন আসমান ভেঙে পড়বে। অজন্তা খুন হয়েছে। পুরো স্কুল... পত্রিকার অফিসে মহা তোলপাড়। অজন্তাকে নিয়ে অনেকগুলো ভাইবোনসহ অজন্তার মা'র সাথে ওর বাবার বিয়ে হয়। পত্রিকাগুলো রসিয়ে সেই কিসসা লিখছে। অজন্তার সৎ বাবা অজন্তাকেও বিছানায় শুতে বাধ্য করত। মা সব দেখে বোকার মতো কাঁদত। একদিন অজন্তা চিৎকার করে বাধা দিলে রান্নাঘর থেকে বটি এনে সেই পুরুষ ওর গলা কেটে দেয়।

ঘুম ভেঙে কাতরে উঠতে থাকে নিকুন্তিলা... মা! মা! এত আলো কেন ? বাতি বন্ধ কর! বন্ধ কর! বাবা! বাতি জ্বালাও! এত অন্ধকার কেন ? বাবা! ওরা আমার লাশটাকে গুম করে ফেলবে, বাবা! আমার কবরে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ লাগিয়ে দিও! হায় হায়! আমার হাতে এত রক্ত কেন ? মাগো... ওই দেখো, ওই ইয়া বড় একটা দা... আমাকে বাঁচাও বাঁচাও... কে ? কে তুই ? না, আমি তোকে চিনি না, চিনি না... মাগো, তোমার আঁচলের তলায় আমাকে লুকিয়ে রাখো।

এই ঘর এত খালি কেন ? আমি অন্ধ হয়ে গেছি। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। সমস্ত ধূম্রময় ঘরে নিকুন্তিলার উড্ডীয়মান দেহ পাক খায়। ডাক্তার এসে ঘুমের ইনজেকশান পুশ করে। মা'র মুখ মৃতের মতো শাদাটে। কী অসহায় যন্ত্রণাময় মা'র জীবন। এই ডাক্তার বাবার সাথে বিয়ের আগে মা'র চিকিৎসা করেছে। নিকুন্তিলা জানে, বিয়ের পরও মাথার অন্ধকার জট কাটাতে মা এই ডাক্তারের পরামর্শ নেয়, বাবাকে না জানিয়েই, ডাক্তার ড্রয়িংরুমে গিয়ে বাবাকে বলে— মেয়েটা সাংঘাতিক মানসিক আঘাত পেয়েছে। ওর তো আর কোনো বন্ধু ছিল না। আপনি এ নিয়ে নিকুকে কোনো রকম মানসিক আঘাত করবেন না। ও নিজেও খুব সেনসেটিভ! আপনার দেয়া কোনো আঘাত ও সহ্য করতে পারবে না।

তাই বলে মেয়েটা প্র্যাকটিক্যাল হবে না ? বাবার আহত স্বর, একটা দুর্ঘটনা সামলে উঠার মতো মনের জোর থাকবে না, সারা জীবন চলবে কী করে ?

সবে সেভেনে উঠেছে একটা মেয়ে, ডাক্তার বলে, ওর কোমল মনটাকে আপনি বিবেচনা করবেন না ? স্কুলে পুলিশ এসে ওকেও জেরা করেছে, যেহেতু ও অজন্তার ক্লোজ বান্ধবী ছিল। আপনার নিজের বন্ধু বা বান্ধবীকে কেউ জবাই করলে আপনি নিজেও কি সুস্থ থাকতে পারতেন ?

আমারই ভুল হয়েছে, বাবা বলে, ভালো একটা এসোসিয়েশনে ওর ফ্রেন্ডশীপ হোক, এই ব্যাপারে ওকে প্রভাবিত করা উচিত ছিল।

কোনটাকে আপনি ভালো এসোসিয়েশন বলছেন ? ডাক্তার বলে, মৃত মুক্তিযোদ্ধার একমাত্র কন্যাকে খুন করে নি এই দেশের হাই সোসাইটিতে বাস করা লোক ? প্রতিদিন খুন ধর্ষণ

কি কেবল নিম্ন শ্রেণীতেই ঘটছে ? আপনি কিছু মনে করবেন না, শরীরের মতো মনটাও মানুষের অস্তিত্বের একটা প্রধানতম অংশ। মানসিক রোগীকে পাগল বলা পাপ। মাথার ওপর ইট ভেঙে পড়লে মাথা যেমন রক্তাক্ত হয়, মনের মধ্যে তেমন কিছু বিদ্ধ হলে মনও ভাঙে। এক্ষেত্রে আমরা যারা প্যাসেন্টের পাশাপাশি থাকি, আমাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল হতে হবে। ওর কোনো ছেলে বন্ধু আছে ?

মা আহত মাথা তোলে— অজন্তা ছাড়া ওর কোনো বন্ধুই ছিল না।

আমরা একটা জিনিস ভুল করি, ডাক্তার বলে, ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েকে আলাদা করে দিই, ফলে বড় হলে পুরুষদের মেয়েদের প্রতি একটা লালসার এটিচ্যুড তৈরি হয়। আপনারা ধনী আধুনিক মানুষ, নিকুন্তিলা সুস্থ হলে ওকে কোনো একটা কো-এডুকেশন স্কুলে ভর্তি করে দিন।

ডাক্তার সাহেব, এই বয়সটা বিপদজনক, বাবা বলে, কো-এডুকেশান পড়া ছেলেদের মানসিকতা এই দেশে অত উদার নয়।

তার দায়িত্ব আপনার মেয়েই নেবে, ডাক্তার বলে, শুধু মা-বাবার বন্ধুত্বে একজন সন্তানের সব ঘাটতি পূরণ হয় না। আপনার মেয়ে দেশের বাইরে গিয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখে। যে মেয়ে ছোটবেলা থেকেই পল পল করে একটা ছেলের মনস্তত্ব বুঝবে না, সে এই দেশের ভার্সিটিতে পড়েও ভুল করবে। বিদেশে আধুনিক ছেলেদের পাল্লায় পড়ে খেই হারাবে। ওই যে লোকটা, নিজেকে তৈরি না করেই পাঁচ সন্তানের মাকে বিয়ে করল। শেষে যখন বোধ করল ওই বয়স্ক মহিলাকে দিয়ে তার সেক্সুয়াল নিড পূরণ হচ্ছে না, সে হাত বাড়াল সৎকন্যার প্রতি— কোথাও তার সুশিক্ষা নেই। সে খুনের মতো একটা বিপদজনক কাজ না করে স্ত্রীকে ডিভোর্স দিতে পারত। কিন্তু সে সেই সুশিক্ষার অভাবে অজন্তার পাশাপাশি নিজের ক্ষতিও কম করে নি... আজ তার জেল হবে, ফাঁসি হবে... মিস্টার ইউসুফ, আমার কথায় দুঃখ নেবেন না। আমি অনেক ছোট থেকেই নিতুর ফ্যামিলির সাথে জড়িত। আপনাদের বিয়ের সময় আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, নিতুকে ভালো করতে। আপনি একজন অচেনা লোক হয়ে সেই মুহূর্তে যদি নিতুর পাশে দাঁড়াতে পারেন, এই কোমল মতি মেয়েটার বাবা হয়ে এইরকম সাংঘাতিক মুহূর্তে ওর পাশে দাঁড়াবেন না ?

কাকাবাবু! মা ডুকরে কেঁদে ওঠে!

বাবা ডাক্তারের হাত চেপে বলে, আই এ্যাম সরি! আমি আপনার পরামর্শ মতোই কাজ করব। আপনি আমার পাশাপাশি আমার মেয়েটার দায়িত্ব নিন।

নিকুন্তিলার আধো ঘুমন্ত শরীর ক্রশ করে বাবার আঙুল প্রথমে মা'র চুল, পরে মা'র নিম্ন নাভিতে গিয়ে ঠেকে— এই স্কুলে নিকুন্তিলাকে আর রাখব না।

মা যেন নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গেছে— এমন অনড়, নির্বাক।

নিতু, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ ?

মা নিজক্রোড়ে নিকুন্তিলার কম্পিত দেহকে তুলে নিলে সে ঘুমের মধ্যে গোঙাতে থাকে— মা... বাবাকে বাঁচাও... ওরা বাবাকে খুন করবে।

মা'র হাত নিকুন্তিলার মাথায়।

বাবার হাত মা'র উষ্ণ-শীতল হাতের ওপর।

নিকুন্তিলা স্বপ্নে দেখে, ওর বাবার হাত-পা কাটা। মুণ্ডুটা আলাদা হয়ে আছে। সারা মেঝেতে রক্ত। বাবা বেঁচে আছে, মা নির্বিকার মুখে বলছে, তোর বাবা এভাবেই কিছুদিন বাঁচবে। হাত-পাহীন বাবা কাঁপছে। মুণ্ডু কাঁপছে। নিঃশব্দ আর্তনাদে ঘুম ভাঙলে নিকুন্তিলা ওদের বেষ্টন থেকে বেরিয়ে আসে ঘরে। মেঝেতে বসে হাঁপাতে থাকে। কী জান্তব স্বপ্ন! সে বাবা মা'র দিকে তাকায়। ওরা ঘুমিয়ে আছে। ওর জরাগ্রস্ত প্রাণ অন্ধকার ছাদে নিবদ্ধ হয়। ছায়ার আবিলতা ছিঁড়ে সে মেঝেতে বসে কেবল কাঁপতে থাকে। চোখ বন্ধ করতেই সেই হাত-পাহীন বাবার ছটফট কম্পন। আমাকে বাঁচাও! ভেতর থেকে চিৎকার ওঠে। কাকে জাগাবে সে ? স্বপ্নের বিকারের জন্য মা-বাবাকে জাগানো ঠিক নয়... মৃত্যু মৃত্যু... অজন্তা... তোর গলায় যখন লোকটা দা বসিয়েছিল, আমার মুখটা কি একবারও তোর মনে পড়েছিল ?

তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। যেন মৃত্তিকা মন্থন করে— ধর্ষণ কী ? আকতার কাকুর ঘটনার আগে মা ওকে নানাভাবে বলেছে। বাবা নিকুন্তিলার কে হয় ? তাও বলেছে— তুইতো কফি বানানো শিখেছিস, বানিয়ে নিয়ে আয়, খেতে খেতে বলি। শেষে মা এক সন্ধ্যায় পুরুষের স্পার্ম... তার মধ্য দিয়ে সন্তানের ভ্রূণ— সেই স্পার্মের অপরিহার্যতা, তা থেকেই কী করে সন্তানটি বীজ থেকে মনুষ্য আকৃতি নেয়— মা সব স্বলাজ মুখে বলেছে, সব তোর জানা দরকার...। রক্তাভ হয়েছে নিকুন্তিলাও— বাবা মা'র শারীরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তার এই মনুষ্য আকৃতি ?

হায়! হায়! এখন বাবার মুখের দিকে কীভাবে তাকাবে সে ? লজ্জায়, কম্পনে জড়সড় হয়ে উঠেছিল নিকুন্তিলা।

মা বলত দুঃস্বপ্ন দেখে উঠলে মনটা ঝরঝরে হয়ে যায়, মনে হয় ভাগিস! বাস্তবে ঘটে নি। কিন্তু নিকুন্তিলার মনে হয়, সুখের স্বপ্নই সুন্দর। রাতে সুখের কোনো স্বপ্ন দেখলে প্রাণে কেমন যেন একটা আরাম হয়। হোক সকালে দেখল, স্বপ্নটা সত্যি নয়, তারপরও। ও গভীর একটা দুঃস্বপ্ন দেখে এটা আবিষ্কার করে, সারারাত একটা হিম ভয় শরীর অবশ করে রাখছে। তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। চোখ খুললেও তার রেশ যাচ্ছে না। দিনেও তার রেশ যায় নি।

বছরের মাঝখানেই বাবার উঁচু লেবেলের সোর্স ধরে নিকুন্তিলা অন্য একটা স্কুলে ভর্তি হয়। অজন্তার কারণে এই স্কুলটা ওর কাছে অশরীরী হয়ে উঠেছিল। মাঝে পড়ার অনেক ক্ষতি হয়েছে ওর। এটা কীভাবে কভার করবে এই নিয়েই দিনরাত টেনশানে ভোগে সে। বিকালে টিচার এসে রোজই ওকে আশ্বস্ত করে, একটু বেশি সময় ধরে পড়ে পুষিয়ে নাও, এত

টেনশান করে লাভ তো কিছু হবে না।

খুব ভোরে আজানেরও আগে নিকুন্তিলা টেনশানে কাঁপতে কাঁপতে বাতি জ্বালায়। শ্যাড ল্যাম্পের নিচে বইয়ের অক্ষরগুলো উকুনের মতো। চোখে, মাথায় গাঁথে না, কেবল হাঁটে। স্কুলে নতুন বান্ধবী হয়েছে। বিন্দু। চমৎকার উচ্ছ্বল মেয়ে। ক্লাস দাবড়ে বেড়ায়। খুব সহজে এক মিনিটের পরিচয়ে একজন মানুষকে কী করে রাজ্যির চেনা করে ফেলা যায়, বিন্দুকে না দেখলে ধারণা করতে পারত না সে। বিন্দুর সোর্স ধরে আরো তিনজন ওর প্রাণের কাছের মানুষ হয়ে যায়। মুশকিল একটাই, বিন্দু যতটা সহজে ছেলেদের পিঠে ঘুষি দিয়ে চলতে পারে, নিকুন্তিলা পারে না, সে কেমন আড়ষ্ট বোধ করে। আর ছেলেরা মেয়েদের বন্ধু মনে করে না। হুটহাট প্রেমে পড়ে যায়। চিঠি চালাচালি করে। মেয়েরাও। স্কুলটা যেন একটা প্রেমের আখড়া। বিন্দু এসব আমলে আনে না। ওর প্রেমে ক্লাসের অনেক ছেলেই দিওয়ানা। তার যেন কোনো বিকারই নেই। নিকুন্তিলাকে বিন্দু বলে, তুই একটা পদ্য! মেয়েদের স্কুলে পড়ে গায়ে একশো ভাগ মেয়েলি গন্ধ মেখে রেখেছিস। প্রেমে পড়ুক না ছেলেরা। তোর কী ? তুই না পড়লেই হলো।

ক্লাসের ছেলেগুলো পাজির হাড্ডি! একেকজন টিচারের একেক নাম দিয়েছে। যেমন মিস্টার বিন স্যার, খাদ্যপুষ্টি আপা, বোয়াল মাছ আপা, টুক্কু দাড়ি স্যার... আনরুলি আপা ক্লাসে এসে নাক কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বলে, এ্যাই ছেলেঁমেয়েরা তোঁমাদের কোনো লজ্জাঁ নেঁই। আজকাল ছেলেঁমেয়েদের যে কী হঁয়েছে, রুল মানে না। লজ্জাঁ শঁরম সব বাসায় রেখে আসে। কত্তগুলো পাঁজি মেয়ে ওদের সাথে তাল দেয়। টুক্কু আলী স্যারের থুতনিতে এক ফোঁটা দাড়ি... সে কেমন কোমর বাঁকা করে করে হাঁটে ক্লাসের তানভির যে-ই দেখাতে যাবে স্যার স্বয়ং এসে হাজির। কোমর বাঁকা অবস্থায় বিমূঢ় বিস্ময় ঢোক গিলে তানভির ফ্রিজ! ক্লাসে চাপা হাসির হল্লোর। স্যার চিকন কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, স্টপ স্টপ।

সারা ক্লাসে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকে তানভির। ক্লাসে তার প্রেমিকা লিমার সামনে তার ব্যক্তিত্ব ফিনিস।

শুধু এটা না। লিমা-তানভির স্কুল ড্রেস পরে ভার্সিটি চত্বরে বসে বাদাম-প্রেম করছিল। ওদের পাহারা দিচ্ছিল তানভিরের এক বন্ধু। পুলিশ এসে স্টেইট দু'জনকে থানায় নিয়ে যায়— স্কুল পালিয়ে ভার্সিটি এলাকায় কী হে ? ওই বন্ধু দূর থেকে সব দেখে সটকে পড়ে। পরে তানভিরের বাবার কাছ থেকে ওই বন্ধু তিন হাজার টাকা এনে দুজনকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।

দিন রাতের মধ্যে প্রতিনিয়ত নির্মাণ আর ক্ষয়ের যুগল খেলা। ধরিত্রী জননীর ভূতল ফুঁড়ে ওঠা নিকুন্তিলা মা'র সাথে এসব গল্প করে আর হেসে মরে। বলে— তোমরা যে আমাকে কী চিড়িয়াখানায় ঢুকিয়েছ!

বয়স কম তো, মা বলে, আরেকটু বড় হলে সবাই বন্ধু হয়ে যাবি। ছেলেমেয়ের ভেদ থাকবে না, আর প্রেমের কৌতূহলটাও এই বয়সে বেশি থাকে।

বলো কী মা ? মা'র বুকে এত বড় হয়েও লম্বা হয়ে সে শোয়। বিন্দু বলেছে, ওরা যখন প্লে গ্রুপে, তখন নাকি ছেলেরা মেয়েদের পাশে বসত না। একদিন নাকি ক্লাসে একটা পুঁচকে ছেলে সিট নেই দেখে কর্নারে দাঁড়িয়ে থাকলে এক টিচার বলে, ওই যে মেয়েদের পাশে সিট আছে। ওখানে গিয়ে বসো। পুঁচকে কী বলে জানো, মেয়েদের পাশে আমি বসব না। কয়টা ছেলে মাঝে মাঝে মাসল দেখায়— তোমরা মেয়ে, অবলা দুর্বল! সমান হওতো আসো, লড়ি। বিন্দু খুব ডাকাবুকো। ওর সাথে মারপিটে ছেলেরাও পারে না। ও মেয়েদের অহঙ্কার।

মা একটু বিমর্ষই হয়— নিকু এটা আমাদের ফ্যামিলি এবং স্কুলের দায়িত্বহীনতা। একটা ছেলে ফ্যামিলি থেকেই মাকে দুর্বল আর বাবাকে সবল চোখে দেখে বড় হয়। সে দেখে, মা সব ব্যাপারে বাবা-কে ভয় পাচ্ছে। তোয়াজ করে চলছে। এই বোধ নিয়েই ও সত্যিকার শিক্ষাটা পায় না। আর ক্লাসে ছেলেমেয়েরা আলাদা বসবে কেন ? এটা টিচারদের চোখে পড়ে না ? যে টিচার পড়া না পারার জন্য, একটা ভেংচির জন্য একটা ছেলেকে কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখার শক্তি রাখেন, তিনি ছেলে আর মেয়ে যে ভাইবোন হতে পারে, বন্ধু হতে পারে, যুক্তি দিয়ে এটা বুঝিয়ে দুই গ্রুপের মধ্যে দূরত্বের ভেদটা মুছে দিতে পারেন না ?

নিকুন্তিলা প্রসঙ্গ ঘোরায়— মা, তোমার জীবনে বাবাই একমাত্র মানুষ ? আর কোনো পুরুষ আসে নি ? নিকুন্তিলাকে মা আলগোছে শরীর থেকে সরিয়ে দেয়। নিকুন্তিলা স্পষ্ট দেখে, মা'র অকর্ষিত মুখ কেউ যেন লাঙ্গল দিয়ে ফালা করে দিচ্ছে। মা'র বুকে ব্যথা ওঠে। অসহায় বোধে ছটফট করে নিকুন্তিলা— মা ? কী হয়েছে ?

মা যেন নিজেকে টেনে হিঁচড়ে বারান্দায় যায়, আর মাতৃক্রোড় থেকে বিচ্যুত নিকুন্তিলা কিছুক্ষণ হতবিহ্বল থেকে নিঃশব্দে মা'র পেছনে দাঁড়ায়। খোলা রোদ্দুরে হেমন্তের লালিমা। কিছু কাক হুজ্জত করছে কৃষ্ণচূড়া গাছে। আর পিচ পেতে দেয়া রাস্তার মসৃণ বুকের ওপর নারী পুরুষের হাঁটাহাঁটি।

মা ধীরে পাঠ করে—

'এই শীতে আমি যদি মরে যেতে পারতুম
এই শীতে,
গাছ যেমন মরে যায়,
সাপ যেমন মরে থাকে
সমস্ত দীর্ঘ শীত ভরে।'

নিকুন্তিলা পেছন থেকে মাকে জড়িয়ে ধরে উত্থিত কান্নায় মা'র চুল ভিজিয়ে দেয়। মা! মা আমাকে ক্ষমা করো, আর কোনোদিন এই প্রশ্ন করব না।

রাতে পড়ার অক্ষর ঝাপসা। এমন কোনো প্রশ্ন নেই— যা করে মা'র কাছ থেকে উত্তর মেলে না। এমন কোনো বিষয় নেই সে মাকে লুকায়। ঠিক এই প্রসঙ্গেই মা কেন এত আপসেট

হয়ে পড়ে ? বাবার বলা সেই দুর্ঘটনা কী ? মা'র জীবনে যদি এর আগে কোনো প্রেম এসেই থাকে, নিকুন্তিলাকে মা চেনে না ? মাকে ও কখ্খনো ভুল বুঝবে ? তবে ? ক্লাসের কত ছেলেমানুষী গল্প সে করে— ওরা চার বান্ধবী পরস্পরকে স্বামী স্ত্রী বানিয়েছে বলে— ক্লাসের ছেলেরা ওদেরকে 'লেসবিয়ান' বলে। সে কোনো বান্ধবীর কাছে এর অর্থ জানতে চায় নি। মা-র কাছেই চেয়েছে। কেননা সে জানে, যে-কোনো গোপন বা প্রকাশিত বিষয়ের ঠিক ব্যাখ্যাটা সে মা'র কাছ থেকেই পাবে। ওর ছেলেবেলা থেকে মা নিজের মধ্যে নিমগ্ন থেকেছে ঠিকই, কিন্তু ওর রুচির ভিতটা তৈরি করে দিয়েছে। ফলে কড়াকড়ি শাসনে থেকেও ছেলেমেয়েরা যখন বোম্বের চটুল হিরো হিরোয়িনদের বিষয়ে ক্রেজি...ঘরে নায়ক নায়িকার পোস্টার টাঙায়... চুম্বনরত ভিউকার্ড বইয়ের মধ্যে রাখে— তখন নিকুন্তিলা একলা মাঠ ধরে হাঁটে অপার্থিব আকাশকে ডাকে... আয়-আয়।

সমকামিতা, নরনারীর সম্পর্ক... পিরিয়ড.. একজন ছেলেমেয়ে নেই যারা গার্জেনদের কাছ থেকে এইসব বিষয় জেনেছে, ফলে এরা এসব সম্পর্কে যখন বলে তখন নিকুন্তিলা লক্ষ করে এর বেশির ভাগ অনেকটা মিথ্যা— অনেকটা রঙচঙে ভরা। যারা এইসব বিষয় জানে না, কৌতূহলে তাদের ফাটো ফাটো অবস্থা— নিকুন্তিলা একদিন মাকে অনুযোগ করে বলেছেও, তুমি আমার সব কৌতূহল নষ্ট করে দিয়েছ। মা বলেছে, কৌতূহলের বিষয় পৃথিবীতে অনেক আছে নিকু...এসব প্রয়োজনীয় বিষয়। প্রয়োজন কখনো কৌতূহলের বস্তু হতে পারে না।

ধুঁকছে অসহায় রাত্রি।

আজ সত্যিই জীবনের প্রথম নিকুন্তিলার দুর্মর কৌতূহল— বাবার সাথে বিয়ের আগে মা'র জীবনে কী ঘটেছিল ?

ইতোমধ্যে অদ্ভুত একটা ছেলের সাথে পরিচয় হয় নিকুন্তিলার। ক্লাসের সব অগভীর ছেলের মধ্যে একমাত্র শান্ত ছেলে, টিফিন পিরিয়ডে সে কবিতা নয় সিরিয়াস কোনো উপন্যাসে ডুবে থাকে। বয়সের চাইতে বেশি লম্বা। নীলাভ চোখ। নিকুন্তিলা মাঝে মাঝে লক্ষ করে, সবাই যখন টিফিন টাইমে নানা হুল্লোড়ে মগ্ন... ছেলেটা উপন্যাস রেখে ওর দিকে শান্ত চোখে চেয়ে আছে।

নিকুন্তিলার বুকের মধ্যে এমন এক হিমহিম তরঙ্গ বয়ে যায়, যা সে এর আগে অনুভব করে নি। ছেলেটিকে ক্লাসের সবাই সক্রেটিস নাম দিয়েছে। নিকুন্তিলার রাত্তিরের ঘুমে আশ্চর্য এক যন্ত্রণা ঢুকে যায়। চোখ বুজলেই সেই নীলাভ ঠাণ্ডা চোখ তীব্রভাবে তাকে বিদ্ধ করে।

এক রাতে মনে হয়, বিষয়টা মাকে লুকিয়ে সে ভয়ানক পাপ করছে। খুব আয়োজন করে কফি বানিয়ে সে পড়ার ফাঁকে মাকে ডাকে, কিছুক্ষণ সে কিছু বলতে পারে না। মাও তাকে অস্থির না করে বেশ খানিকটা সময় নিয়ে বলে, কী ?

নিকুন্তিলা রক্তাভ— মা, আমার ক্লাসের একটা ছেলের চোখ খুব নীলাভ আর ঠাণ্ডা।

তো কী হয়েছে ?

সে প্রচুর ভালো ভালো বই পড়ে।

তো ?

মাঝে মধ্যে আমার দিকে শান্ত চোখে চেয়ে থাকে।

বলতে বলতে নিকুন্তিলা প্রচণ্ড শীতেও ঘেমে ওঠে। সে ভাবে, মা তাকে ইয়ার্কি করে বলে বসবে— তাহলে তুইও প্রেমে পড়েছিস ?

মা বলে অন্য কথা— ওর সাথে তোর কথা হয়েছে ?

না।

আশ্চর্য! ক্লাসমেটের সাথে কথা পর্যন্ত হয় নি ?

না মা, ও তো বলে নি।

তাহলে তুই বলে ফ্রি হয়ে যা। ভালো বই পড়া ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব হওয়া খুব সুন্দর ব্যাপার।

আমি সেধে গিয়ে হেংলামো করে কথা বলব ?

তুই এত লাল হয়ে যাচ্ছিস কেন ? বিন্দুর সাথে যখন সেধে কথা বলছিলি, তখন হ্যাংলামো লেগেছিল ?

নিকুন্তিলার মুখ আঁধার স্রোতে ঢেকে যায়। সে মাকে জড়িয়ে ধরে... মা মাঝ রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি সমুদ্রের পাশ দিয়ে আমরা হাঁটছি... ও হঠাৎ একটা কুচকুচে কালো, নোংরা এক শিশু হয়ে গেল। সাথে সাথে ইয়া মোটকা এক মহিলা এসে ওকে কাপড় কাচার মতোন আছাড় মারতেই ও হয়ে উঠল ফুটফুটে এক রাজপুত্র... তারপর মা সে ইকথিয়াস্ডরের মতো সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে মিলিয়ে গেল। ঘুম ভাঙার পর বুকে এত ব্যথা হলো!

মা'র মুখে ছায়া। মা আত্মনিমগ্ন। শীত আঁধারের চক্র ছিঁড়ে মা নিকুন্তিলাকে নিজের শালের ওমে নিয়ে বলে, একটি বয়সে এমন হতে পারে। যা হোক, তুই ওর সাথে কথা বলে ফ্রি হয়ে যা। তোকে শিখিয়ে দিচ্ছি, কাল টিফিন পিরিয়ডে ও কী বই পড়ছে জানতে চাইবি— তারপর তুইও তোর পঠিত কোনো গ্রন্থের কথা বলবি। তাহলে হ্যাংলামো হবে না। দেখবি, বন্ধুত্ব হলে বুকের ব্যথা কমে যাবে।

মা ও যদি ফোন করতে চায় ?

কথা বলবি।

উঃ মা! আমার হাত পা কাঁপছে! ইউ আর গ্রেট!

সেই ছেলেটি, নাম বিজন... ইতোমধ্যে বিন্দুর সাথে ওর বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। বিন্দুর সোর্স ধরে নিকুন্তিলার সাথে! একমাত্র ওর সাথে কথা বলার সময় শরীরে এত কাঁপুনি হয়!

বিজন মাঠে বসে প্রশ্ন করে— নিকুন্তিলা নামের অর্থ কী ?

নিকুন্তিলা ভ্যাবাচেকা খায়— সেই অর্থে অর্থ নেই। মা'র ভাষায় অর্থ একটা আছে, বাবার কাছে শ্রুতিমধুর মনে হয়েছিল। মা'র নামের প্রথম অক্ষর নিতু'র নি...কুন্তল মানে

চুল...এ-ই আর কী... 'জোড়াপট্টি' দিয়ে... মোট কথা শ্রুতিমধুরতা...। এতদিন নিকুন্তিলা বিন্দুর মধ্যে বুঁদ হয়ে থাকত। ফোনে বিন্দুর সাথে কত কথা, ওদের ফ্যামিলিটা অতিরিক্ত সুশৃঙ্খল। মাথাব্যথায় ফেটে গেলেও ওর মা ঔষধ খাওয়ার ঘোর বিরোধী। বিন্দুর এত প্রিয় চকলেট, ফার্স্টফুড সব নিষিদ্ধ। মা'র এসব বাতিক নেই। মা'র ভাষ্য, সারা পৃথিবীর সুস্থ কর্মজীবী মানুষ টিকেই আছে ফার্স্টফুডের ওপর। অতিরিক্ত তুতু করে সন্তান বড় হলে সামান্য ঠাণ্ডা বাতাসেই সর্দি হয়ে যাবে। মা নাকি ছোটবেলায় নিকুন্তিলাকে ঠাণ্ডা মেঝেতে গড়াতে দিত।

মা! মা! শিশুবেলার গল্প বলো না!

তোর যখন মাঢ়িতে ঈদের এক ফালি চাঁদের মতো দাঁত উঠল... কী আনন্দ তোর বাবার, দুনিয়ার মিষ্টি কিনেছিল। তুই জীবনের প্রথম যে শব্দ বলেছিলি, সেটা ছিল— বা... বা... বা..বা। তোর বাবার অবস্থাটা বুঝে দেখ। নয় মাস পেরোতেই হাঁটতে শিখলি। তোকে নেংটো দেখতেই আমার খুব ভালো লাগত।

ধেৎ! অন্য গল্প বলো!

তিন বছর বয়সে তুই দেখলি এক জায়গায় বর্ষার জল জমে আছে। তুইতো অবাক— মা, মা! দেখো, আকাশটা মাটিতে পড়ে আছে।

সেই নিকুন্তিলা মা'র ভাঁজ ভেঙে ক্রমশ ফোনে বিন্দুর সাথে কথায় ডুবে থাকে। ইদানীং যুক্ত হয়েছে বিজনও। নিকুন্তিলা অস্বস্তিতে ভোগে— মা, আমি যখন বিজনের সাথে কথা বলি, প্যারালাল সেটে তুমিও শুনো আমরা কী বলি!

ছিঃ নিকু!

না, মা আমার ভেতরে কথা বলার সময় সারাক্ষণ এক খচ্ ঢুকে থাকে। মনে হয় তুমি ভাবছ আমরা না জানি কী গল্প করছি!

আমি মোটেই এ নিয়ে ভাবিত নই।

মা, ওর মা এদেশের মস্ত বড় সাহিত্যিক। অনেক পুরস্কার পেয়েছে। দেশের বাইরে গেছে। সেদিন বিজন বলল, সে নিজেকে রবিনসন ক্রুসো মনে করে। এছাড়া সত্যজিৎ রায় ভীষণ পড়ে। আমিও সত্যজিতের ভক্ত জেনে খুব জমে গেল। সোনার কেল্লা, ফেলুদাকে নিয়ে এত বিস্তর আলোচনা! মা তোমার অনুবাদ কদ্দূর ?

প্রায় শেষ!

তাঁহলে সন্তানের ন'মাস হলো, এখন ভূমিষ্ঠ হবে।

ভালোই তো কথা শিখেছিস।

মা, বিজন তোমার সাথে কথা বলতে চায়।

আচ্ছা! বলব!

ইতোমধ্যে ক্লাস সেভেনের ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্টে নিকুন্তিলা খুব খারাপ করে। যে মা সারাবছর তার পড়ার কোনো খোঁজই রাখে না, রেজাল্ট শীট হাতে নিয়ে উদ্যত খরগের মতো কথার বাণে সে নিকুন্তিলাকে ফালাফালা করে ফেলে, তোকে বেশি স্বাধীনতা দিয়েছি তো— যা, বিন্দুর পায়ের ধুলো নিয়ে আয়, অমুক নায়ক তমুক নায়ক বলে যারা ক্রেজি, তারা তালে ঠিকই আছে— আমিই হতভাগ্য মা, মেয়েকে ট্রাস্ট করে ভুল করেছি— তোর বাবাকে মুখ দেখাবি কোন সাহসে ? ছিঃ নিকু ছিঃ... বলতে বলতে নিকুন্তিলাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে মা কাঁদতে থাকে, এই জীবনে আমার সুখ হবে না, একটাই মাত্র সন্তান... শেষে হিসহিসে চোখে নিকুন্তিলার নিথর অস্তিত্বের সামনে শেষ বর্শার ফলাটা গেঁথে দেয়— আসলে তুই প্রেমে পড়েছিস! বিজন তো ঠিকই ভালো করেছে। গাধা!

যথারীতি মা'র এত সব তিরস্কারের পর এক ফোঁটা শব্দ না করে নিকুন্তিলা নিজের আধারময় কক্ষে একাকী নিথর পড়ে থাকে। দীর্ঘসময় পেরিয়ে যায়, মা বারান্দায় বসে থাকে। খাওয়ার সময় পেরিয়ে যায়— নিষ্ঠুর মা'র দেখা নেই। শীতে সে যখন কুণ্ডুলী পাকিয়ে বরফ... দরজায় শব্দ। মা যেন নিঃশব্দ এক মর্গে প্রবেশ করেছে এরকম পায়ে ঢুকে জানালার পর্দা সরালে স্ফটিক আলোয় নিকুন্তিলা কুঁকড়ে।

নিকুন্তিলার চুলে মা'র হাত। মা চমকে দেখে নিকুন্তিলার নিঃশব্দ কান্নায় তার চোখ ডুমুর দানার মতো হয়ে গেছে। মা'র স্পর্শ পেয়ে সজোরে হিচকি তুলে নিকুন্তিলা ফিসফিস গোঙানিতে বলে— আমাকে মেরে ফেলো মা!

মা ওকে জড়িয়ে অজস্র চুমুর বন্যায় ভরিয়ে দেয় নিকুন্তিলার মুখ— আই এ্যাম সরি মা!

নিকুন্তিলার সেই ছেলেবেলার মতোন নিঃশব্দ কান্না— মা, আমাকে বিশ্বাস করো, আমি প্রেমে পড়ি নি।

বললাম তো সরি...।

মা আমাকে বিন্দু রেজাল্ট শীট নিয়ে কাঁদতে দেখে তিরস্কার করেছে। বলেছে, পরীক্ষার আগে যত হেল্প করব, পরীক্ষার পর রেজাল্ট খারাপ করে যে কাঁদে তার সাথে আমি নেই। এ বছর মা আমি কোনোদিকে তাকাব না। ওদের আমি দেখিয়ে দেব, আমি গাধা ছাত্রী না। আর... আর মা, তোমাকেও...। ঘাই সাঁতার, ডুব সাঁতার, চিৎ সাঁতার... মা ইচ্ছে মতো নীল জলের ওপর যেন বা মীন এইভাবে পাক খাচ্ছে। মা'র শরীরে ফিনফিনে গেঞ্জি, টাইট টাইলস্... তার পাতলা দেহটা কী মোহময়... মা'র প্রতিটি বিষয়ই যেন নান্দনিক হওয়া চাই... মা এমনভাবে জলের সাথে কখনো যুদ্ধ করে, কখনো শঙ্খচিলের মতো শরীর ছেড়ে দিয়ে ভেসে থাকে... জল তার স্তন, গ্রীবা সব উপচে উপচে ছড়িয়ে পড়ে স্রোতের কিনারে কিনারে, মনে হয় মা জল নয়, যেন বা ছবিতে দেখা কোনো নায়কের সাথে রঙ্গলীলা করছে,

অথবা প্রেম... সবচাইতে দুর্নিবার হয়ে ওঠে বৃষ্টি হলে, সমস্ত সুইমিংয়ের এক পাশে অন্য মেয়েরা... মা গভীর জলে... সবার অলক্ষে মা গেঞ্জি অর্ধেক খুলে বৃষ্টিটাকে বুকের স্পর্শ পেতে দেয়— কী যে হিবিজিবি বলে মা... আমি ছিলাম মত্ত জলের অর্জুনে মগ্ন, ওপর আকাশ থেকে কৃষ্ণ এসেছে।... মা... মা... জলকে ভীষণ ভয় করে আমার।

নিকু আয়... কিছুদিন দেখ, আমি কী করি, প্রথমে ট্রেইনারদের অনেক কিছুই তোকে মানতে হবে। জল যখন তোর আয়ত্বে বুঝবি... তখন তুই বাজপাখি।

বাবা রাতে এসে নিকুন্তিলার ফোলা চোখ দেখে মাকে সে-কী বকা! হঠাৎ এক বছর রেজাল্ট খারাপ হওয়া উপলক্ষে নিকুন্তিলাকে নিয়ে বাবা বাইরে খেতে যায়।

এই রকম শীত যায়, বসন্ত আসে। নিকুন্তিলা অস্বাভাবিকভাবে ডুবে যায় পড়ার মধ্যে। বিজনের ফোন আসে। নিকুন্তিলা টেবিল থেকে বলে— মা, ওকে বলে দাও আমি ব্যস্ত আছি!

ছিঃ নিকু... ছেলেটা ফোন করেছে।

করুক! বলে নির্বিকার নিকুন্তিলা ফের পড়ায়।

বিজনের কণ্ঠ ভেজা ভেজা— আন্টি, ও এমন বদলে গেছে। ক্লাসে আমার সাথে কথাই বলে না। আমি কী দোষ করেছি?

বিজন, ও খুব সেনসেটিভ! কয়েকটা দিন যেতে দাও, এমনিই ঠিক হয়ে যাবে। আসলে বিজন, হঠাৎ ওর স্কুল চেঞ্জ... ওই স্কুলেও ফার্স্ট সেকেন্ড হত, নিজেকেই এখন নিজে আর মানতে পারছে না। তুমি বরং একদিন আমাদের বাসায় আস। আমি সব ঠিক করে দেব।

থ্যাঙ্ক ইউ আন্টি!

মা'র এলকোহল খাওয়া কমে এসেছে। একটা বিষয়ে মা খুব ডিপ্রেস্ড— প্রকাশক মা'র অনুবাদ বইটা করে নি। বলেছে, আপনি বরং মার্কেসের 'অটাম্প অফ দ্য পেট্রিআক'টা শেষ করে দিন।

মা বলে— ওরা বলছে 'দ্য অফ দি হিরো'টা অশ্লীল। এদেশের রক্ষণশীল পাঠক নেবে না। শ্লীলতা অশ্লীলতা বিষয়টাই এখানের অনেকে বোঝে না।

উপন্যাসের থিমটা কী মা?

হোস্টেলের একদল ছাত্রকে নিয়ে। ওরা অদ্ভুত সব কাণ্ড করে, এর মধ্যে একটা হলো, একটা মুরগিকে কয়েকটা ছেলে রেপ করে সেই মুরগি দিয়েই তারা স্যুপ রান্না করে খায়।

ষাই বলো, বড় আজব।

পৃথিবীর সাহিত্যে কত রকম কাজ চলছে— সবটাই আমাদের জানা দরকার অথচ ইয়োসা ল্যাতিন আমেরিকার সাংঘাতিক পাওয়ারফুল রাইটার!

এভাবে দিনগুলি যায়!

ক্লাস এইটে সাংঘাতিক ভালো রেজাল্ট করে নিকুন্তিলা। ক্লাসে ফার্স্ট হয়। ক্লাসের সবাই তাজ্জব বনে যায়! বিন্দু বলে— যা দেখালি তুই! সারাবছর ফোনের কথায় বুঝতেই দিস নি,

এত পড়ালেখা করছিস। বিজন বলে— কনগ্রেচ্যুলেশন! এইবার মিস নিকুন্তিলা আমাদের পাত্তা দিলে হয়।

বাবা ঘরে এসে এমনভাবে নিকুন্তিলাকে মাথার ওপরে উঠিয়ে ফেলে, যেন সে ছোট খুকি।

মা ক্রেডিট নিতে চায়— শুধু তো ভাবো, আমি মেয়েটার কিচ্ছু লক্ষ করি না!

আহা! তুমি যেন হাতে ধরে পড়িয়েছ ওকে!

হাতে ধরে তো কত মা-ই পড়ায়। ক'জন এই রেজাল্ট করে? আমি চিরদিন ওরটা ওর ওপর ছেড়ে দিয়ে ওকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে চেয়েছি।

তা অবশ্য! বাবা হাসে, তোমার নিজের তাতে অবশ্য অত ধকল পোহাতে হয় নি, তুমিও বেঁচে গেছ, মেয়েটাও আমার সব বিষয়ে স্বাবলম্বী হয়েছে!

বাবার সেই বান্ধবী মাঝে মাঝে ফোন করে। বাবা মাকে নির্দ্বিধায় বলেছে, আমরা ক্লাসমেট ছিলাম। ওর প্রতি আমার দুর্বলতা ছিল। কিন্তু আমরা যখন অনার্সে তখন রেবেকার বিয়ে হয়ে যায়। ওর হাজব্যান্ড দেশের বাইরে থাকে। ও ছেলেমেয়ে নিয়ে এদেশে চলে আসে। বেচারি এই দেশে একা। ছেলেমেয়ে দুটো ইউরোপিয়ান কালচারে বড় হয়েছে।

মা'র সূক্ষ্ম ঈর্ষা— এখনো সেই দুর্বলতা আছে?

আরে ধুর! বাবা হাসে, দুর্বলতা প্রকাশ হতে হতেই তো ওর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। ভেতরে কিছু দানা বাঁধতে পারে নি বলে কবে মন থেকে ওসব ধুয়ে মুছে গেছে। ছেলেবেলা থেকে এক সাথে বড় হয়েছি। বন্ধুর মায়াটা আছে বলে মাঝে মাঝে ফোন করি। মা'র ইচ্ছায় রেবেকাকে নিমন্ত্রণ করা হয়। ভারী মায়াবী মুখ। মা'র সাথে রীতিমতো ভাব হয়ে যায়। রাতে ওরা শেরাটনে খেয়ে ঘরে ফেরে।

বাবা রাত দশটায় ঘুমিয়ে গেলে মা এক অদ্ভুত কাণ্ড করে। ভদকাতে টমেটো আর কী সব মিশিয়ে স্ক্রুড্রাইভার করে নিকুন্তিলার হাতে তুলে দেয় এক গ্লাস! আজ তোর নতুন এক অভিজ্ঞতা হোক।

নিকুন্তিলা ভূতল থেকে ওঠে, না মা! আমি খাব না! প্লিজ!

এই সোসাইটিতে কোনোদিন যে স্পর্শ করবি না, তাতো নয়। আমি চাই, তোর সব প্রথম আমার মাধ্যমে হোক।

মা! আমার ভয় করছে!

ভয় কীসের?

যদি মাতাল হয়ে যাই! উল্টা পাল্টা করি? বাবা বাড়িতে... ।

আমি তোর নার্ভ চিনি, জীবনেও তুই মাতাল হবি না। উল্টা পাল্টা কিচ্ছু করবি না।

যদি করি?

সেই দায়িত্ব আমার। আমি শুধু আজ তোর অনুভূতিটা দেখতে চাই।

মা, যদি তোমার মতো এডিকটেড হয়ে যাই?

নিকু, আমি মোটেই এডিকটেড নই। আমি এই পৃথিবীতে কারো কাছে পরাজিত হয়ে বাঁচার জন্য জন্মাই নি। যদি টের পাই, কেউ আমার প্রাণের ওপর উঠে আসছে, আমি নিষ্ঠুরের মতো তাকে প্রাণ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারি। এলকোহল তো মানুষের চেয়ে বড় নয়।

তবে কেন খাও তুমি ?

জানি না। এবং অজানাটাই আমার এখন পর্যন্ত ভালো লাগছে। আমি ছোট থেকে বাবা মা'র তেমন স্নেহ পাই নি। ছেলেবেলা থেকে দেখেছি, বাবা মদ খায়, কিন্তু আমি বাবার ফ্যামিলিতে থাকতে কখনো ওটা স্পর্শ করার আগ্রহ বোধ করি নি। এর কারণ এই নয় যে, বাবা মদ খেয়ে আমার প্রতি অবিচার করেছে। বাবার ন্যাচারটাই ছিল অমন, মদ খেয়েও গম্ভীর। মদ খেয়ে মা'র ওপর বাবা কোনো অত্যাচার করে নি, ওরা দুজনই ছিল অনেকগুলো মৃত সন্তানের বাবা-মা, স্বাভাবিক এটাই ছিল, এতগুলো সন্তান মৃত্যুর পর আমাকেই তারা আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইবে...জীবনটাকে এইখানেই বড় আজব লাগেরে নিকু... তারা যেন আমাকেও মৃত ভাবত অথবা অন্য যন্ত্রণার সমস্ত প্রকাশ আমার প্রতি অবহেলা করে ঘটাত। আমি বলা যায় বুয়ার কাছে বড় হয়েছি।

একদিন, মনে পড়ে, ভাত খেতে গিয়ে প্লেট ভেঙে ফেলেছিলাম বলে, মা আমাকে বেত দিয়ে দরজা বন্ধ করে এমন পিটিয়েছিল! আমার পিঠে এখনো ফালা ফালা দাগ আছে। বাবা সব শুনে মাকে মৃদু তিরস্কার করেছিল মাত্র! কল্পনা করা যায় ?

বুঝলি নিকু, একটা বিষয়েই বাবা ছিল দৈত্যের মতো, টিচার রেখে দিয়েছিল বাড়িতে, কখনো আমার নিজের পড়া সে চেক করত, বলত আমি যদি রেজাল্ট খারাপ করি, তবে আমাকে চিরজীবনের জন্য ঘর থেকে বের করে দেবে। বাবার ভয়ে একা ঘরে কাঁদতে কাঁদতে আমি পড়তাম, আর রেজাল্ট ভালো করতাম। বাবা মা'র এইসব ব্যবহারের কারণে আত্মীয়রা বলা যায় তাদের ত্যাগ করেছিল! একদিন বাবার এক ভাগ্নে গায়ে হাত দিলে ভয়ে আমার জ্বর উঠে গিয়েছিল। কিন্তু কাউকে বলতে পারি নি। কেননা তারা ওই ভাগ্নেকেই বিশ্বাস করত, মনে করত নিশ্চয়ই আমি কোনোভাবে তাকে উস্কেছি... যাক নিকু, আজকের এই দিনে ওইসব কথা বলে তোর মন নষ্ট করতে চাই না— চিয়ার্স...।

নিকুন্তিলা বলে, চিয়ার্স।

এরপর সে নাক ধরে একটানে এক পেগ খেয়ে ফেলে। কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে যায়।

মা জিজ্ঞেস করে, কেমন লাগছে ?

কেমন যেন ঝিমঝিম লাগছে।

মা আরেক পেগ দেয়। নিকুন্তিলা ভয়ে ভয়ে টান দেয়। ইতোমধ্যে যেহেতু মা শেরাটনে

খেয়ে এসেছে, তাকে বেশ ধরেছে! মা বলছে, ওই দেখ নিকু, দার্জিলিংয়ের পাহাড় থেকে দেখা হিমালয়। যেন তুলো থেকে স্বর্ণখণ্ড ঝরছে!

ধেৎ! বলে নিকুন্তিলার কী হয়, সে ঢুলতে থাকে... বলে, মা আমার শরীরটা আমার মধ্যে নেই, মনে হচ্ছে আমি জলের মধ্যে বসে আছি— বলে দাঁড়াতে যাবে, ধপাস— মেঝেতে পড়ে যায়... হি...হি... হি... নিকুন্তিলাকে হাসির ভূতে পেয়ে বসে, সে বারবার দাঁড়াতে চায়, আর ধপাস পড়ে যায়।

নিকুন্তিলার কাণ্ড দেখে মা হেসে মরে, কীরে কেমন লাগছে!

হি... হি... হি... তোমাকে বোঝাতে পারব না... মনে হচ্ছে, শরীরটা একটা খোল। কোনো মাংস নেই... বারবার আমার উড়তে ইচ্ছে হচ্ছে, অথচ যখনই দাঁড়াতে যাচ্ছি...পড়ে যাচ্ছি... হি...হি...হি... মা, আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি তোমার বুকের দুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি ?

হেমন্তের কাঁচা পথ তো নয় যেন বহুদূর ধরে ক্ষীণকোমর নারীর মতো কেবলই ধাবিত হচ্ছে দ্রাক্ষালতা— ফিনফিনে আকাশে ঢেউ খাচ্ছে পাখি— আর শস্যের মহাওপার থেকে ক্ষীণশব্দে ধেয়ে আসছে এমন এক গন্ধ... যার আবেশে ইচ্ছে হয়, আর হাঁটা নয়... শরীরটা হয় ধুলোয় নয় সবুজে, নয় বাতাসের ওমে ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে— মা'র রাঙা মুখ, মাতাল চোখে নিকুন্তিলা এই আবেশ দেখে, আর ক্ষণে ক্ষণে চমকে ওঠে, গর্ভের মধ্যে দুটি শিশু যেমন এক উত্তাপে বাড়তে থাকে... আজ এই পথে মা আর সে নিকু আর নিতু— যমজ... মা'র মুখের রং, শরীরের তরঙ্গ তার মধ্যেও সঞ্চারিত হচ্ছে। এই রকম আবিষ্টতার মধ্যে পড়ে শহুরে বাবার মধ্যেও ঘোর। তার দ্রুততম পা-ও ক্রমশ শিথিল!

নিকুন্তিলার মা এবং বাবার পূর্বপুরুষরা শহরেরই বাসিন্দা। ফলে গ্রামের সাথে ওদের চির যোগাযোগ বিচ্ছেদ।

সুজলা সুফলা— এইসব গ্রন্থেই পড়েছে চিরকাল নিকুন্তিলা। বাবার কঠিন ব্যস্ততা, ফলে ছুটি ছাটায় ওরা ঢাকার বাইরে বলতে সমুদ্রে পাহাড়ে গিয়েছে। এইবার বাবার ব্যস্ততা একটু কমলে নিকুন্তিলা বাবাকে আঁকড়ে ধরেছে, একেবারে ঘুটঘুটে হারিকেনগ্রামে যাবো।

সব গ্রামেই প্রায় ইলেকট্রিসিটি চলে এসেছে— বাবা বলেছে, আমি দূর আত্মীয়দের সুবাদে যে গ্রামকে চিনতাম, গ্রামে সেই আবহ আর নেই।

শান্তনু মামা সব শুনে কিছুক্ষণ সান্ধ্য বারান্দায় চুপ থেকে ধোঁয়া কাপে চুমুক দেয়। এই ব্যাপারে মা'রও আগ্রহ নিকুন্তিলার চেয়ে কম নয়। শান্তনু মামা কিছুক্ষণ নিজের মধ্যে বুঁদ থেকে বলে, আমাদের গ্রামটা এখন পর্যন্ত সত্যিকার অর্থেই অন্ধকার গলি ঘুপচির মধ্যে

আছে। ট্রেন, বাস, রিকসা কাঁচা পথ নানা ঝক্কি পেরিয়ে একেবারে সন্ধ্যায় যেখানে পৌঁছতে হয়।

বিশ্বাস করো শান্তনু, আমাদের কষ্ট হবে না— মা আকুল হয়ে বলে, তাছাড়া যতোই আমরা শহরে বড় হই, আমি, আমার এই বৃহৎ গ্রামসর্বস্য দেশের গ্রাম্য আঁধার কোনোদিন দেখবো না ?

বাবা কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু— অনেক কষ্ট হবে তোমাদের। শান্তনুর কাছে যে রাস্তার বর্ণনা শুনছি, গিয়ে তো ফেরা যাবে না, রাতে মশার কামড়...।

তাছাড়া— এইবার শান্তনু মামা বলে— সব ঘর মাটির আর নেংটো অনাহারী পোলাপান... গ্রাম থেকে কালে ভদ্রে যে-ই আসে, সে-ই বলে গত তিরিশ বছরে এই দেশের সাথে তাল মিলিয়ে কৃষ্ণপুর গ্রাম এক পা-ও এগোয় নি।

এইবার মা, শেষ অস্ত্রটা ছোঁড়ে— আসলে তুমি চাইছো না, তোমাদের গ্রামে যা-ই।

রক্তাভ শান্তনু মামার মুখ। বাবা অপ্রস্তুত... শান্তনু, যত ধুলো বাতাসই থাকুক... জানো, আমি বাস্তবে দেখি নি কোনোদিন, কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে আমাকে হেমন্তের গ্রাম টানে। কত... কত হেমন্তে আমি আচ্ছন্নের মতো ছাদে দাঁড়িয়ে কল্পনায় দেখেছি জীবন্ত সেই দৃশ্য... খালি পায়ে আমি সবুজ ধানের ভেতর মোড়ানো চিকন আলের পথ ধরে ধরে দূর সূর্যাস্তের দিকে চলে যাচ্ছি।

সন্ধ্যামিহি কোলাহলের সাথে মেতেছে নগর না দেখা গ্রামীণ পক্ষীকুল। ধানের ডগার কণ্ঠে এখনও কাস্তের কোপ পড়ে নি। তবে ফাটি ফাটি ভরন্ত বয়সের হলুদ ধান এক গোছা তুলে মা যখন নিকুন্তিলাকে বলে— খোসা ভেঙে দেখ—!

নিকুন্তিলা মা'র গা ঘেঁষে বলে, তুমি ভাঙো, আমি গন্ধ পাচ্ছি! আশ্চর্য, মা'র সাথে সাথে তার পা থেকে জুতো খুলে যাচ্ছে, খুলে যাচ্ছে চুলের রাবার আর অবারিত উন্মুক্ত কৈশোরিক নাচের ছন্দ... ওর শরীরটা কি ক্রমশ এই ঘাসবালু শুকনো পথে মা'র শরীরের সাথে এঁটে যাচ্ছে ? মা যেন তার চেনা সহস্র বছরের পুরনো গোধূলি দেখছে এই ভঙ্গিতে নির্জন পথের এক জায়গার বিস্তৃত মাঠের সামনে দাঁড়ায়, মা'র বিমূঢ় মুখ দেখে বাবা বড় অবাক করা কণ্ঠে বলে, তুমি নিশ্চয়ই হুবহু এই সূর্যাস্তটাই দেখতে, কল্পনায়, তুমি—!

ইউসুফ! প্রায় চমকলাগা কণ্ঠে চেঁচায় মা, বিশ্বাস করো কোনোদিন আমি গ্রামের এই সত্যিকার সূর্যাস্তটা দেখি নি, কেবল মাঝে মধ্যে, টিভি স্ক্রিনে, পর্দায়... তবে তাজ্জব লাগছে কেন জানো, আমি কল্পনায় এই দৃশ্যটা দেখার সময় যেমন ঘ্রাণ পেতাম নাকে, হু...বহু... এখন হুবহু সেই গন্ধটা পাচ্ছি।

শান্তনু মামা বলে, তোমার ইমাজিনেশন ক্ষমতার প্রশংসা করছি। তুমি অনুবাদক না হয়ে লেখক হলে সম্ভবত শাইন করতে!

ধেৎ! মা যখন তার সহজাত হাসিতে মুখ ঢাকছে লজ্জাহাতে, তখন নিকুন্তিলার মধ্যে শিরশির... আশ্চর্য! এমন কেন হচ্ছে! মনে হচ্ছে এই সূর্যাস্তটা আমিও এর আগে কল্পনায় দেখেছি। আমি কি আর কিছুক্ষণের মধ্যে জীবনের প্রথম দেখা অচেনা পৃথিবীর মধ্যে মা'র সত্তার সাথে বিলীন হয়ে যাব ?

আমি অবাক হচ্ছি নিকুকে দেখে, শান্তনু মামা বলে, এত জার্নি করে আমার শরীরই যেখানে ভেঙে আসছে—।

বাবা বলে, ইহা উনি উনার মা'র সত্তা হইতে পাইয়াছেন। তুমি দেখলে না, আমাকে তোয়াক্কা না করে ট্রেনে কেমন ভেজাল তেলের চানাচুরগুলো চেটেপুটে খেল। এরপর মা'র দিকে কটাক্ষ চোখ হেনে বাবা বলে, ওর মা তো মনে করে জীবনের সব রকম পরিবেশের সাথেই সবার মিলিয়ে চলতে পারাটা দরকার। আজ রাতে দেখা যাবে, যখন কুমড়ো ক্ষেতে শেয়াল ডাকবে, গন্ধ ভরা কাঁথায় শুয়ে মশা বিছার কামড়...।

ইউসুফ! মা প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে। রাতেরটা রাতে দেখা যাবে। তুমি কেন এইসব বলে সূর্যের রঙটাকে নষ্ট করছ!

নিকু... আমরা সারারাত হারিকেনের পাশে বসে শান্তনুর চাচাতো বোনদের সাথে গীত গাব!

বাবা বলে, তুমিই বলেছো শান্তনু, ওদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ, একটা খবর না দিয়ে সন্ধ্যায় তোমার চাচাদের বিপদে ফেলে...।

মা বলে, ওরা যা খাবে আমরা তা-ই খাব!

অজ গ্রামের হাটবারের খবর জানো ? সপ্তাহে একবার হাট। হাটবার না হলে কচুর ঘেটুও খুঁজে পাওয়া যায় না। আমি নিজেদের খাওয়ার কথা ভাবছি না, ভাবছি শান্তনুর চাচা যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে না পারলে কেমন কষ্টে পড়বে! এইসব বিষয়ে শান্তনু মামা কেমন যেন নির্বিকার— বলে দাদা দাদি মরেছে কোন জন্মে! সেই শৈশবে এই গ্রামে কয়েকবার এসেছি! আমি ঠিক জানি না, চাচা মানুষটা কেমন। তার ছেলেরা বিপদে আপদে আমার কাছে সাহায্য চাইতেই গিয়েছে। এরপর নিকুন্তিলার হাত টেনে শূন্যে উঠিয়ে সে বলে, অত বুদ্ধু আমাকে ভাবিস না। মনাখাঁ চাচা বাবার ছোটবেলার বন্ধু। আমি লোক দিয়ে তাকে খবর দিয়েছি। ঢাকায় গেলে তিনি আমার ওখানেই ওঠেন।

বাবা কী একটা বলতে যাবে, শূন্য মাঠের মধ্যে ডুবতে থাকা সূর্যাস্তটা দেখে মা চিৎকার করে ওঠে, শান্তনু দেখছো, মেঘটা কেমন সূর্যটাকে ঢেকে দিল, তুমি এখন একটা আশ্চর্য মিরাকল দেখবে, সূর্য ডোবার আগেই মেঘ সরে যাবে... বলতে বলতে মা চোখ বুজে নেতিয়ে পড়ে বাবার কাঁধে... স্তম্ভিত হয়ে সবাই দেখে, সূর্যের ওপর থেকে সত্যিই মেঘটা সরে গেল, কিন্তু চোখ বন্ধ থাকায় এই অপার্থিব দৃশ্যটা মা দেখলো না।

মা-কে বোঝে না নিকুন্তিলা। ওরা যখন শান্তনু মামার চাচার দরজায়, তখন বারোটা ন্যাংটো ছেলে এক লাইনে দাঁড়িয়ে পুকুরের দিকে পাছা দিয়ে সবে জল ছাড়তে শুরু করেছে... মা এতক্ষণ কী অজানা বেদনায় সূর্যাস্তের ফেরে ডুবে ছিল, এখন ছেলেগুলোকে দেখে অভিভূত কণ্ঠে বলে, দেখেছো ইউসুফ! বারোটা চম্পা কলার মতোন নুনু। আহা! ঢাকায় এতগুলো নুনু এক সাথে আজকাল দেখা-ই যায় না।

ছেলেগুলো কেউ কেউ অর্ধ কাজ সমাপ্ত রেখেই লজ্জায় বসে পড়েছে। শান্তনু মামার চাচাতো ভাইয়ের উদাত্ত আহ্বান দেখে নিকুন্তিলা ধরেই নেয়, খবর এখানেও আগেই পৌঁছে গেছে। রং উঠে যাওয়া সদ্য ধোয়া শার্টটা গায়ে চাপানো শান্তনু মামার চাচার, সন্ধ্যার ঝিঁঝিঁ ডাক ছাড়তে শুরু করেছে, ছোট্ট মাটির ঘরটায় ওদেরকে নিয়ে ঢুকতে ঢুকতে তিনি প্রায় কেঁদে ফেলেন— আমি কেমনে যে তুমাগোরে আপ্যায়ন করি!

ওদের দুটো ছোট মেয়ে মেহমান আসা উপলক্ষে মাথায় ফিতে, ঠোঁটে লিপস্টিক লাগিয়ে পর্দার ওপারে চোখ পিটপিট করছে। নিকুন্তিলা ওদেরকে ডেকে পাটির মধ্যে বসায়। ইতোমধ্যে দরজার সামনে গ্রামের মানুষের ভিড় জমে গেছে।

রান্নাঘরের ধোঁয়া ঠেলে শান্তনু মামার চাচি বেরিয়ে এসে জবুথবু বসে... মনা খাঁর বাড়িত দাওয়াত হুনছি... কিন্তুক... নিকুন্তিলা স্পষ্ট দেখতে পায় ঘোমটার আড়ালে তার ঠোঁট কাঁপছে। সারাঘর জুড়ে মরামাটি আর সোঁদা কাঁথার গন্ধ। দুটি ঘরের মধ্যেই লেপটা লেপটি করে থাকে সবাই। শান্তনু মামার চাচা এমন আসামির মতোন মাথা নিচু করে আছে কেন ? নিকুন্তিলা ভেবে পায় না। তার চাইতে মা'র মতোন আসন্ন শীতের সন্ধে অথবা রাত্রি বাতাসের ঘ্রাণ নেয়া যাক। নৈঃশব্দের আস্তরণে বাঁধা পড়েছে প্রতিটি মানুষ... মা ছটফট করে উঠে চাচিকে উদ্ধার করে, আপনি যা রান্না করেছেন তা-ই আমরা খাব।

ভয়ে চমকে ওঠে চাচা— কিন্তুক মনা খাঁ...।

সেখানে না হয় আমরা রাতে ঘুমিয়ে সকালে নাস্তা করে যাব...।

চাচির ঘোমটা খসে পড়ে বিহ্বল আতঙ্কে। তার জাগ্রত জ্বলন্ত চোখে এক ফোঁটা আনন্দ খেলে গিয়ে পরমুহূর্তে তা নিভে যায়— তিনি বাড়িতে রান্না করার ব্যবস্থা করেছেন। এইখানে খাইলে তেনার ওপর বেয়াদপি...।

আপনি কি চাইছেন না আপনার এখানে আমরা খাই ?

কালো কালো বাতাস ভাঙা তোড়ন ভেদ করে কোষে কোষে শীত ঢুকতে চায়। যেন এক ভয়াবহ অন্ধকারময় বিলোরিত অবস্থা থেকে চাচা কোঁকড়ানো ঠোঁট খোলে— শান্তনু, বাবা, তুমরার চাচি জানে, তুমরা খাঁ বাড়িতেই খাইবা, তা-ও হেয় আমারে ঘরের জিনিস বেইচ্যা বাজার করাইছে, নিজ আনন্দে রানছে... কইছে, খাউক ওরা খাঁর বাড়িত— আমার শান্তনু মেহমান লৈয়া আইছে, আমার রান্ধা আমি রান্ধি!

শান্তনু মামার মাথা নত হয়ে যায়।

সূর্যাস্তের ঘেরা টোপ থেকে বেরোনো মা'র চোখে এখন সরতে থাকা মেঘপুঞ্জ। তমসের কামড়ে যেন ছটফট করে ওঠে বাবা।

বাইরে মনা খাঁর বাড়ির ডাক!

অভিভূত চোখে বাবাকে দেখে নিকুন্তিলা... চাচার হাত জড়িয়ে ধরে বলছে— আপনি আমাদেরকে খাবার দিতে বলেন।

চাচার চোখের আতঙ্ক আর ভয় দেখে বাবা বলে— মনা খাঁর সাথে আপনার বেয়াদপি হবে না— তাকে বোঝানোর দায়িত্ব আমি নিলাম! মা কি আবার সূর্যাস্তের ফেরে পড়েছে? শান্তনু মামা বিমূঢ়! মুরগি... সরষে শাক... পুঁটি মাছের গন্ধ! দুটি ফুলবাঁধা মেয়ের স্পর্শের প্রজ্জ্বলনে জ্বলে ওঠা নিকুন্তিলা ওদেরকে তুমুল খুশিতে ভাসিয়ে বলে, বাবা, আজ রাতটাও আমরা এই বাড়িতেই থাকব। সারারাত... হারিকেন জ্বেলে...।

নিকুন্তিলার এই বছরটা যায় সাংঘাতিক ব্যস্ততায়। সে স্কুলে যায়, বিন্দু-বিজনদের সাথে আড্ডা দেয়। বাসায় এসে ঢুকে পড়ে গভীর পড়াশোনায়। বুয়ার রেখে যাওয়া দুধ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এবার মা'র উল্টো চেহারা— নিকু... নিকু... আমার বুকে আয়।

মা! আমি পড়ছি।

অত পড়ে কী হবে? পৃথিবীটা আনন্দেরও। এই সুন্দর বয়সটা যদি পাঠ্যপুস্তকেই কাটিয়ে দিস!

তুমি যে কী বলো মা!

নিকু... নিকু... তোর ফোন...

কে মা?

বিন্দু!

প্যারালাল সেট উঠিয়ে মহা আয়েশি নিকুন্তিলা বিন্দুকে প্রশ্ন করে— হাই ডার্লিং, তোমার হিরোরা কেমন আছে?

ডুবজল খাচ্ছো তুমি, আর আমাকে...। অবশ্য রেজাল্টেও তুমি কম তাক লাগাও না!

আমি ডুবজল খাচ্ছি? আহা! আহা! সেই জল কেমন গো?

সে তুমি আর বিজনই জানো!

বি..ন্দু... তুইও যদি ছেলেমেয়ের বন্ধুত্বকে অন্যচোখে দেখিস! স্বীকার করছি, প্রথম দিকে ওর ব্যক্তিত্বটা আমাকে টেনেছিল... কিন্তু বুঝলি, আমি বোধহয় জাতে হিজড়াই। কোনো নায়ক, কোনো ছেলে আমার মধ্যে তোদের মতো তরঙ্গ তৈরি করে না!

আমরা তো বেশি ফাটাই... হাসে বিন্দু, দেখবি আমাদের দিয়ে কিসসু হবে না। তুমি একদিন এমন কাণ্ড করবে!

মাও তাই বলে... নিকুন্তিলা হেসে মরে, বলে, খুব তো ভালোমানুষি দেখাচ্ছিস আমাকে... কোনদিন যে কোন মাস্তানকে ধরে এনে আমার মাথার ওপর দরাম করে রেখে দিয়ে বলবি— একে আমি বিয়ে করব। এ-ই আমার জীবনের সব।

আন্টি ঠিকই বলে।

ধুর! তুইও সিরিয়াসলি নিলি। শান্তনু মামা বলে— অন্যের কাছে যেটা বিষ, মা'র কাছে সেটা জল। আমার মা'র কাছে পৃথিবীর খারাপ মন্দের তেমন কোনো ভেদ নেই। বলে, একটা মানুষ খারাপ কাজ করলেই তাকে ফেলে দিবি না নিকু... সে ভালো কী করেছে, সেটাও বিবেচনায় আনবি। মাকে না জানিয়ে আমার কিছু করার দরকারই পড়বে না...।

এইভাবে বর্ষা, শীত... সব পেরিয়ে বসন্ত আসে।

মা এক রাতে বাবা যখন ঘুমিয়ে, পরদিন শুক্রবার— নিকুন্তিলার ইস্কুল নেই, ওর বিছানায় শুয়ে বলে, একদিন বলেছিলাম না, তোর বাবা অত তাড়াতাড়ি সন্তান চায় নি, তার একটা কাহিনী আছে। আমি যে কী সন্তান পাগল ছিলাম, সে তীব্রভাবে সেটা জানত না। বিয়ের এক মাসের মাথায় যখন তুই গর্ভে এলি, তখন আমরা হানিমুনে। আমার কন্ডিশন দেখে তোর বাবা ইউরিন টেস্ট করিয়ে অবাক— তুমি ঠিকমতো পিল খাও নি? বুঝলি নিকু, আমি আসলে সারামাস কোনো পিলই খাই নি। আমি আমার ভেতরের আনন্দ উচ্ছ্বাস চাপা দিয়ে বললাম— খেয়েছি তো! কখন ভুল হলো!

তোর বাবা ছিল খুব রোমান্টিক। আমরা যখন সমুদ্রের স্রোতের শব্দ শুনছি তখন সে বিষণ্ন, আমার সাথে কোনো কথাই বলছে না।

মা'র উষ্ণ বুকে শুয়ে নিকুন্তিলা অনুভব করে, তার কঠিন শীত লাগছে।

উঠি— তোর বাবা বলল, শীত লাগছে।

আমি আমার নিজের গায়ের শাল ওর জ্যাকেটের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইলে তোর বাবা আপত্তি করে, আহা! শীত কি আমার একার লাগছে?

আমার মধ্যে তুমুল জিদ— আমার লাগছে না।

সে তুমি ভেতরে ক্ষেপে আছ বলেই— তোর বাবা বলে, এরপর শালটি আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলে— সারারাত এখানেই থাকবে?

থাকব। আমি স্তব্ধ কণ্ঠে বলি।

আমার কী হয়... মনে হয়, সমুদ্র আমাকে ডাকছে... আমি অশরীরী শরীর নিয়ে এগোতে চাইলে তোর বাবা বলে, নিতু, আমি চাই না, এক্ষুণি চাই না, তুমি বুঝতে পারছ না সবে আমাদের বিয়ের দেড় মাস হয়েছে।

তোর বাবা আপসেট, মানে সে তীব্রভাবে চাইছিল, ঘুরে ফিরে আনন্দ করার পর আমাদের বাচ্চা হোক। কিন্তু আমি অনড়— আমার আগে সন্তান, পরে ঘুরে ফিরে আনন্দ হলে হবে, নয়তো না।

প্রচণ্ড বেদনা নিয়ে ফিরে এলাম। আমরা কেউ কারো সাথে কথা বলি না। এক গভীর রাতে মরাকান্না পাশের ফ্ল্যাটে। তোর বাবা খোঁজ নিতে যায়। ফিরে আসে লাল চোখ, বিধ্বস্ততা নিয়ে। গর্ভের মধ্যে পাঁচ মাসের বাচ্চাটি মরে যাওয়ায় এক মহিলা উন্মাদের মতো কাঁদছে।

নিকুন্তিলার শক্ত হাত চেপে মা কষ্টে আনন্দে উচ্চারণ করে— তোর বাবা আমাকে গভীর মমতায় জড়িয়ে ধরে বলে... নিতু... নিতু... আমিও চাই সন্তান। ওকেই, যে তোমার গর্ভে এসেছে। সেই তোর বুকে যদি আজ কেউ গুলি ছোঁড়ে— তোর বাবা সামনে গিয়ে দাঁড়াবে।

নিকুন্তিলা যখন মেট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে, পরীক্ষার শেষদিন মা নিকুন্তিলাকে এক সন্ধ্যায় অস্ফুট থরথর ওষ্ঠ কম্পনে বলে, তোর বাবার সাথে বিয়ের আগেও আমার আরেকটা বিয়ে হয়েছিল।

নিকুন্তিলার গলায় বরফ আটকে যায়। কথাটা বলেই মা খালাস, বিস্তৃত বারান্দায় বসে সন্ধ্যাতারা দেখছে। নিকুন্তিলার মধ্যে ঘাই খেয়ে ওঠে কিছু দৃশ্য— দিনের পর দিন বছরের পর বছর ফোনের শব্দ পেলেই ছুটতে ছুটতে গিয়ে মা'র ফোন রিসিভ করা, নিকুন্তিলা প্রশ্ন করলে— একদিন ঈশ্বর আমাকে রিং করবে, আমি চাই না সেই ফোন অন্য কেউ রিসিভ করুক। এলকোহল খেয়ে চূড়ান্ত বিপন্ন মা'র চরম আর্তি— আর কত অপেক্ষা ? নিজেকে শক্ত করে নিকুন্তিলা মায়ের পরবর্তী বাক্যের জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু মা ছায়াচিত্র। বাইরের শীত বাতাস ওদের অপূর্ব গোলাপগুলোর ঠোঁট ছুঁয়ে যাচ্ছে। আর মেঘেরা... কোথায় যাচ্ছোগো তোমরা ? হে উত্তরের মেঘ, কৃষ্ণরে গিয়া কইও... সোয়াচান পাখি, আমি ডাকিতাছি তুমি ঘুমাইছ নাকি... মা সেই ছেলেবেলার রূপকথার মতো করছে। যখন রাক্ষস বা সাপের মুখে কোনো বিপন্ন মানুষ— সেই পর্যন্ত বলে মা চুপ।

মা! মা! তারপর কী হলো ? আজ সত্যিই নিকুন্তিলা বোধ করে অনেকটাই বড় হয়ে গেছে সে। কৌতূহল যন্ত্রণায় প্রাণ ফেটে যাচ্ছে, অথচ নিঃশব্দ অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু পারছে না।

মা যেন তার কোটি বছরের সিন্দুকের জং ধরা বাক্সে জমানো কান্নার বাক্স খুলতে বেদনায় ফেটে যাচ্ছে। স্পষ্ট সান্ধ্য আলোয় নিকুন্তিলা দেখে, মা'র মুখ নীলচে হয়ে উঠছে। লম্বা একটা নিঃশ্বাস টেনে মা যেন অন্য কারও গল্প করছে, এইভাবে বলে, প্রচণ্ড ভালোবাসার বিয়ে ছিল সেটা। আমি কোনোদিন কাউকে একতরফা ভালোবাসতে পারতাম না। কিন্তু ওকে আমি যেদিন প্রথম দেখি তখন ছিল সন্ধ্যা, আমি পাবলিক লাইব্রেরি থেকে বেরিয়েছি, মাঝ সিঁড়িতে ওকে দেখি। শ্যামলা মুখ, গুচ্ছ চুল কপালে এলোমেলো। আমার দিকে তাকিয়েছে। অমনি আমার মধ্যে থর কম্পন। নিকু সে কী গভীর চোখ! আমি বোকার মতো

চেয়ে আছি, সে হতচকিত হয়ে লাইব্রেরির ভেতর ঢুকে যেতে থাকে।

সিঁড়ি দিয়ে নামছি, হঠাৎ মাথাটা টাল খেয়ে ওঠে। আমি একটা সিঁড়ি বেশি টপকে যেই ঘুর খেয়ে পড়ে যেতে নেব, বিদ্যুতের মতো সে আমাকে ক্রশ করে আমার সামনে এমনভাবে দাঁড়ায়, আমি ওর বুকের ওপর আছড়ে পড়ি, নিকু সেই মুহূর্তের মাদকতা আমি মৃত্যুর আগেও ভুলব না। সে পরম স্নেহে কী অনুভবে আমাকে কিছুক্ষণ ওর সুঘ্রাণময় বক্ষে হাত দিয়ে চেপে রেখে শান্ত হতে সাহায্য করে। আমার মনে হয় চারপাশের জাগতিক জগৎ হারিয়ে আমি স্বপ্নের মধ্যে পড়ে আছি। ও আমার হাতটা সজোরে চেপে ধরে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলে— আপনাকে এর আগে আমি দেখিনি কেন বলুন তো ?

আমার কম্পনময় আঙুলের খামচিতে ওর শার্টের প্রথম বোতামটা ছিঁড়ে গিয়েছিল, কী পাজি ছিল দেখ, আমাকে অনেক পরে বলেছে, বাসায় গিয়ে তার মনে হয়েছে, ও আমার সবগুলো বোতাম ছিঁড়ল না কেন ?

মা কি যোজন দূরের কোনো মানুষ ? মা এটা কার গল্প বলছে ? মিথ্যে রূপকথা নয় তো ? নিকুন্তিলা কাঁপতে থাকে। বাবার কথা মনে পড়ছে। তার মনে হচ্ছে মা তার স্বভাব হেঁয়ালিতে মেতে উঠেছে। সবশেষে বলবে, আরে বুদ্ধু, এটা তোর বাবার গল্প।

না। মা মোটেই তেমন হালকা চালের বাতাসে ঢেউ খাচ্ছে না। তার মুখে শত বছরের বেদনার ভাঁজ। আজানের শব্দের সাথে সাথে তরঙ্গিত হচ্ছে শীতের বাতাস।

বুঝলি, একেবারে ছবির মতো প্রথম দেখায় প্রেম। এরপর পাবলিক লাইব্রেরিতে প্রায়ই দেখা। পরিচয় হলো। আমি তখন অনার্স পাশ করেছি। সে ফাইনাল ইয়ারে পড়তে পড়তে ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানানোর ধান্দা করছে। সে কথা বলত খুবই কম। আমার আঙুল কম্পন দেখে সে কী বোকা দেখ, আমাকে বলে, তুমি কি খুব বেশি স্লিপিং পিল খাও ?

আমি আঙুল লুকিয়ে গ্রীবা উচ্চকিত করে বলি— না!

কিন্তু রাতভর কী ছটফট! মনে হতো আলোর পথে পথে নিকষ মৃত্যুর আভাস। ওর ঠাণ্ডা স্থির চাউনির মধ্যে কেবল দেখা। কিছু যেন দেখছে অথবা খুঁজছে, আমাকে কিছুতেই ন্যূনতম প্রকাশ করছে না, কতটুকু পছন্দ করে। আমি সারা রাত ধরে বই থেকে নানা কথা মুখস্থ করে তার সামনে যাই। ভাবি অন্য রেফারেন্স দিয়ে নিজের কথা প্রকাশ করি। কিন্তু তার সেই অদ্ভুত চোখের সামনে বসে সব ভুলে গিয়েই বলে উঠতাম, আচ্ছা! আজ তাহলে যাই। সে কী নিষ্ঠুর নিকু! শান্ত কণ্ঠে বলে— যাও। তুই বিশ্বাস করবি, রাগে জেদে একদিন আমি আমার এক ক্লাসমেটের কাছ থেকে গাঁজা জোগাড় করে লাইব্রেরির সিঁড়িতে বসে তার সামনে ধরালে তার নাক কুঞ্চিত হয়ে ওঠে— এটা কী ?

গাঁজা।

তুমি এসব খাও ?

খাই!

বাসায় গিয়ে খাও। এটা লাইব্রেরি! এর একটা পবিত্রতার ব্যাপার আছে। তাছাড়া আশেপাশে আরো মানুষ আছে।

আমি এখন থেকে প্যাথেড্রিন নেব।

সবই চেনো দেখছি। তা এসব আমাকে শোনাচ্ছ কেন ?

আমার ভেতর থেকে স্তম্ভিত চিৎকার ওঠে... আমি প্রায় চিৎকার করে উঠি— আপনি কিচ্ছু বোঝেন না ? কিচ্ছু না ? ছিঃ! আমি কান্না চেপে বাড়ি এসে জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ি। মা পাগল হয়ে ওঠে। আমি আধমড়ার মতো বলতে থাকি— জুবায়ের! জুবায়ের!

জুবায়ের— এইবার বাবার নামের বাইরে আরেকটা নাম পাওয়া গেল। নিকুন্তিলা প্রচণ্ড শীতেও ঘামতে থাকে। এইবার নিকুন্তিলা যেন মা, মা এক কিশোরীর মতো আধঘোরে তার এক অজানা জীবনের পথ খুলে খুলে দিয়ে যাচ্ছে।

এরকম চার-পাঁচ দিন টানা জ্বর শেষে আমি ভার্সিটি, পাবলিক লাইব্রেরি সব জায়গায় যাওয়া ছেড়ে দিলাম। আমাকে নিয়ে মা কেঁদে মরে, কোন সেই ছেলে, তার বৃত্তান্ত বল্, আমি তার কাছে গিয়ে ওকে বুঝিয়ে বলি।

মা, এটা কি বুঝিয়ে বলার বিষয় ?

হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে ফোন— আমি ওর 'হ্যালো' শুনে অসাড় হয়ে বলি, জীবনের প্রথম কারও 'হ্যালো' শব্দ আমার আত্মা ভেদ করে শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। ও বিস্মিত— আত্মার চাইতেও কারও শরীর যদি তীব্র হয়...। আমি অস্ফুটে থরথর করি, আমিতো আত্মা দিয়েই চলি, কাউকে কেন্দ্র করে এই জীবনে আমার শরীর তরঙ্গিত হয় নি, বিশ্বাস করুন, বহুকাল ধরেই আমার শরীরটা জাদুঘরে রাখা—। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় সে ফোন রেখে দেয়।

আমি কেমন বোবার মতোন হয়ে উঠলাম বুঝলি নিকু, চূড়ান্ত বিপন্ন মুহূর্তে কাউকে ভালোবাসতে নেই। এটা পুরুষদের রাজত্বের পৃথিবী। সর্বস্ব উজাড় না করে কিছু হাতে রাখতে হয়, তাহলে আর জীবনের ওই দশা হয় না। কিন্তু এই যুক্তি মন বুঝলে তো ? আমি ভূতের মতো ছাদে একাকী বসে, বিছানা ছেড়ে কেবল তার চোখ দুটি দেখতে পেতাম। আমার মধ্যে কী খুঁজত ? ও কী দেখত ? এক নির্ঘুম স্বপ্নবালিকার অসহ্য তড়পানি।

নিজেকে শান্ত করে একদিন ঘর থেকে বেরোনোর জন্য দরজায় দাঁড়িয়েছি, সামনে জুবায়ের। আমার ভূকম্পন শুরু হয়। আমি কী বলার জন্য হাঁ করতেই সে আঙুল দিয়ে আমার ঠোঁট চেপে ধরে— অনেক বলেছ তুমি, এইবার আমার বলার পালা।

সেই থেকে শুরু।

তারপর হাঁটিয়াছি কত মাঠ। নাচিয়াছি কত উঠোনে। কত ধ্বংস; কত রক্তপাত; ওর কণ্ঠের মাটির গন্ধের মতো সোদাময় গান— 'তুমি রবে, নীরবে হৃদয়ে মম, নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনী সম।' অসহ্য জেদের... রক্তাক্ত প্রকাশ... যন্ত্রণা... যন্ত্রণা... ফের গান— মাঝে

মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না, কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না ? তারপরও সাজাইয়াছি কত নিঃশব্দ কথার মালা। নিকু, আমাকে সে বলত, তোমার মধ্যে সাংঘাতিক এক বুদ্ধিদীপ্ত চপলতা আছে, চপলা চপলা হরিণী, তোমার বলা কঠিন, কোমল পাপপুণ্যর সম্পর্কিত প্রতিটি কথার পেছনে খুব যৌক্তিক বিশ্লেষণ থাকে। অতঃপর একদিন আমাদের বিয়ে হলো।

নিকু! আমার বুকে ভীষণ ব্যথা করছে! আমাকে একটু ধরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিবি ?

এই বিশাল পৃথিবীতে নিকুন্তিলা একা হয়ে যায়। মা আজ তার কাছে বহুবার পঠিত অথচ একবারও না পঠিত কোনো উপন্যাস। এরপর বিয়ে হয় গেল ? এরপর ? সেই মানুষের সাথে কি হলো ? সেই ঘটনার পরও বাবার সাথে অত সুন্দর দাম্পত্য জীবন! সম্ভব ? আর বাবা ? এত বছরে কত ছায়া অন্ধকার গেছে। মা ড্রিংক করে ক্রোধে কখনো হামলে পড়েছে বাবার ওপর— তুমি আমার যোগ্য নও! যোগ্য নও! বাবা তো একবারের জন্য হলেও সেই মানুষের খোঁটা দিয়ে কিছু কথা বলতে পারত! নিকুন্তিলার মনে হয়, সে এই সংসারে নয় কোনো অজানা জঙ্গলে আদিমের মতো বেড়ে উঠেছে। বাবা-মা কাউকে সে চেনে না। মা আবার তার মাথায় আকাশ ভেঙে দিয়ে বলে উঠবে না তো— তুই জুবায়েরের সন্তান!

না! না! একা ঘরে কান্নায় ভেঙে পড়ে সে, মা খুনি, যে শত শতাব্দী ধরে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে একটা বিষয় ঢেকে রেখে নিকুন্তিলাকে বুকে ছুরি বসানোর মতো করে পিরিয়ড, শারীরিক সম্পর্ক... এইরকম জীবনের একটা একটা সত্য বলে এসেছে, তার পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়!

বাবার ছবি বুকে চেপে ফুঁপিয়ে ওঠে নিকুন্তিলা— আমি যেন তোমার সন্তানই হই। আমি মা'র কাছ থেকে আর কোনো সত্য শুনতে চাই না।

নিকু নিকু মেঘপুঞ্জের মতো ভাসো... ভাসো... কোনো নাইটিঙ্গেল যেন নিকুন্তিলার কানের কাছে ফিসফিস বলে, দেখো জীবন কত রহস্যময়। বুকের বসন খুলে আয়নার সামনে দাঁড়াও। দুই স্তনের ভাঁজে হাত রেখে স্পর্শ করো মা'র বুকের বেদনা! স্পর্শ করো... নিকুন্তিলা... স্পর্শ করো...!

বান্ধবীদের আড্ডায় নিকুন্তিলার আর প্রাণ নেই। একটা অশরীরী হিম ভয় তাকে সারাক্ষণ ছেঁকে রাখে। সে বাবার মুখের দিকে তাকাতে পারে না। কাউকে তার আর তেমন সরল মনে হয় না। তার সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়, মা-বাবা কি আদৌ বিবাহিত ? কষ্টপাটির খাঁজে খাঁজে নিকুন্তিলার গড়ানো পিঠ রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। সে ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে ওঠে— না! মিথ্যে! সব মা'র বানানো মিথ্যে গল্প!

রজাইয়ের নিচে শুয়ে নিজের বুকের ধুকপুকানিতে হাত রেখে সে মা'র সেই জুবায়েরের ঠাণ্ডা চোখ দেখতে পায়। মোমের মতো গলতে থাকে সে... আর মাকে কেন্দ্র করে তার গান— তুমি একজনই শুধু বন্ধু আমার, শত্রুও একজন তাই—। 'এইবার আমার বলার পালা।' জুবায়েরের সেই না শোনা কণ্ঠ, না শোনা কথার প্রতি তীব্র রোমাঞ্চ বোধ করে সে। না, বাবা মোটেই অত গভীর রোমান্টিক না।

একদিন পুরনো ঢাকার ঘিঞ্জি গলি পেরিয়ে ওরা বুড়িগঙ্গার তীরে গিয়ে বসে। বিকেল গড়াচ্ছে। না, এ ক'দিন মা'র সাথে তার তেমন কথা হয় নি। বাবা আসার আগেই মা ঘুমের ঔষধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভোরেও বাবার সাথে মা'র দেখা হয় নি। মা কি সবার কাছ থেকে পালাচ্ছে ? নিকুন্তিলার সেই ক্ষুদে বয়স থেকে মা'র টেলিফোন অস্থিরতা। এ ক'দিন কাঙ্ক্ষিত ফোন ভেবে অস্থিরভাবে রিসিভ করে ছোট নিকুন্তিলার সামনেই বাবার বার খুলে মা'র প্রথম মদ খেয়ে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ... খালামণি তবে সব জানত। আত্মীয়রাও কি জানত না ? তারা নিকুন্তিলাকে লুকিয়েছে। অবশ্য তার দাদা-দাদি কেউ নেই। চাচাদের জন্মের পর থেকেই দেখে এসেছে দেশের বাইরে। এক ফুপু— সেও খুলনায়। নানা-নানু... তারা কেন এসব বলবে নিকুন্তিলাকে ? ভেতরে দুর্মর ঝড়— মা'র সেই জুবায়ের এখন কোথায় ? কেন বিচ্ছেদ ? সেই বিচ্ছেদের প্রতিটি চাবুকের ঘা মা একা খেয়ে বাবাকে দিয়ে এসেছে বছরের পর পর নির্মল ওম! অপার্থিব আদর! গাড়ির মধ্যে মা'র ঠাণ্ডা হাত নিকুন্তিলা নিজের গালে নিলে মা কেঁপে ওঠে।

দীর্ঘ নয়না নদী। চোখের মধ্যে কালো পুঁতির মতোন ঢেউয়ের ঘূর্ণি। কোন পথে মা শুরু করবে ? নিকুন্তিলা অপেক্ষা করে। পেছনে রাজ্যির মানুষ। সমুদ্রের কথা মনে পড়ে নিকুন্তিলার— ঝিনুক কুড়াতে গিয়ে বাবার, মা'র সাথে সে-কী হুল্লোড়। কে বেশি কুড়াতে পারে। জলের মধ্যে বসতেই নোনা ঢেউ এমন ধাক্কা দেয়, এক মুহূর্ত স্বস্তি নেই। নিকুন্তিলার ইচ্ছে হয় মাকে বলে, চল চেঞ্জে যাই। সমুদ্রের পাশে বসে তোমার জীবনের সেই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শুনব। কী কপাল! উসখুস করে মা শুরু করতে যাবে, শীতকালের অকাল বৃষ্টি শুরু হয়। কাঁপতে কাঁপতে দু'জন গাড়িতে গিয়ে বসে। সারা শহরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। মানুষগুলো পাগলের মতো ছুটছে। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করে, ম্যাডাম, কোনদিকে যাব ?

মা বলে, শেরাটনে।

নিকুন্তিলা বলে, না বাসায়। দু'জন বৃষ্টি কমলে বারান্দায় বসে কফি খাব।

প্রচণ্ড যানজট। শীতে হি হি কাঁপে নিকুন্তিলা। মা নিজের গায়ের শাল নিকুন্তিলার শোয়েটারের ওপর চাপালে সে তা ফেরত দেয়— তোমার বুঝি শীত করবে না ?

নিকু তুই অনেক বড় হয়েছিস।

সে তো তুমিই করেছ। অল্প বয়সে পাকা পাকা কথা শিখিয়েছ।

কিন্তু তা তুই কারও সামনে জাহির করিস নি, তুই সব জানিস— এটাই তোর গ্রেটনেস। আমি খুব অস্থির নিকু। তোর মতো যদি শান্ত হতে পারতাম!

জানালার গ্লাস ধেয়ে জল নামছে। ক্যাসেটে বাজছে— বেণীমাধব বেণীমাধব... তোমার

বাড়ি যাব... মা অস্পষ্ট ঢেউ খেলে আঁচল দিয়ে চোখের সন্তর্পণ জল মোছে— জুবায়ের ছিল আমার শরীর এবং আত্মার এক বড় অংশ। আমি এত অবিচার করেছি ওর প্রতি— সারা জীবন তোর বাবাকে— বলে মা'র চোখ যায় ড্রাইভারের দিকে।

তবে কি বাবাও মা'র আগের বিয়ের খবর জানত না ? নিকুন্তিলা অসীম গহ্বরে প্রায় তলায়— ধ্যাৎ! তা কি হয় ? বাবা ঠিকই জানত। ব্রহ্মপুত্রের পাশে বসে নিকুন্তিলাকে বলা বাবার কথাগুলো ওর মাথায় ঢেউ খেয়ে ওঠে— দুর্ঘটনা! বাবা বলেছিল, বিয়ের আগে মা বিকারগ্রস্ত ছিল। তার একটা দুর্ঘটনা হয়েছিল। বাবার সাথে দেড় মাস পর বিয়ের মাথায় নিকুন্তিলা মা'র পেটে আসায় ওকে বাবা নষ্ট করে ফেলতে চেয়েছিল।

নিকুন্তিলার মাথা বনবন করতে থাকে— তবে কি সেই স্পার্ম জুবায়েরের ছিল ? বাবা— বাবাগো আমার হাতটা ধর... আমি নিচে পড়ে যাচ্ছি...। নিকুন্তিলা বোধ করে তার পায়ের নিচে মৃত্তিকা নেই... ওপরে আসমান নেই। সারা রাত অস্থির যন্ত্রণায় ঘুম হয় না।

মা আবার অ্যালকোহলে ডুবে গেছে। ফোন বাজলে ক্রেজি হয়ে ছুটে যাচ্ছে! এ-কী দশার মধ্যে পড়ল সে!

এক বিকেলে গাড়ি করে এয়ারপোর্টের কাছাকাছি এক জঙ্গল ঘেরা নির্জন জায়গায় দু'জন গিয়ে বসে। দু'জনই স্তব্ধ। মার মুখ বিক্ষত, নীলচে। ধীরে ধীরে মা শুরু করে— জুবায়েরের সাথে যখন বিয়ের কথা হচ্ছে, তখন সে ডকুমেন্টারি, বিজ্ঞাপনচিত্র বানানো নিয়ে মহাব্যস্ত। আমি জ্বরতপ্ত বসে থাকি তার অপেক্ষায়। প্রায়ই বলত সন্ধ্যায় আসবে। মধ্যরাতে ফোন করে জানাত, কাজে আটকা পড়ে গিয়ে আসতে পারে নি। সে কী অসহ্য জেদ তখন আমার! ওর ফোনের অপেক্ষায় মধ্যরাত অব্দি ঠায় বসে থাকতাম! ও ফোন করলে হিসহিসে ক্রোধে ফেটে পড়তাম... আমাকে নিয়ে খেলতে খুব ভালো লাগছে! ভারি একটা খেলার পুতুল পেয়েছ!

আমি ওর চোখে গভীরতার পাশাপাশি ঘোর সন্দেহ দেখতাম। জুবায়ের বলতো— প্রথম দেখেই কেউ কারও এতো প্রেমে পড়তে পারে ? নিতু, আমার প্রবণতা উল্টো, তোমার মতো, কোনো রাজপুত্র এসে দাঁড়িয়েই তার ধাঁধালো সৌন্দর্য দিয়ে কাউকে জয় করে নেবে— এমন বিষয়টা আমি বুঝি না, আমার অনুভূতিটা গাঢ় হয়, চলতে চলতে... বুঝতে বুঝতে—।

ও আরেক বন্ধুর সাথে পার্টনারশিপে ফিল্ম তৈরির কাজ করত, যদিও বেশিরভাগ শেয়ার ওর বন্ধুর ছিল। আমি ওর যুক্তি মানি না। জেদ করে ক্লাস করি না। কোনো কাজে যাই না। ও আমাকে একদিন নিয়ে যায় একটা শুটিং স্পটে। বেটাক্যাম পড়েছে এক অত্যুজ্জ্বল সুন্দর নারীর ওপর। সে নানা কায়দায় পাক খাচ্ছে, জুবায়ের তাকে কখনো কোমরে কখনো

হাতে ধরে দেখিয়ে দিচ্ছে, কেমন পোজ হবে। সোলার, বেবি, এইসব লাইটে মেয়েটা নানা কায়দায় শরীর ঘোরাচ্ছে, আমার চোখ টিভি স্ক্রিনে... কিছুতেই শট ও.কে হচ্ছে না। কখনো মেয়েটার মেকআপ স্ক্রিনে উৎকট লাগায়, মেকআপম্যান পাফ দিয়ে ওর সজ্জা ঠিক করে দিচ্ছে। আমি যে কী ছিলাম নিকু, কাউকে কিছু না বলে ছুটতে ছুটতে রাস্তায় নামি। ও পেছন থেকে আমাকে চেপে ধরলে আমি অগ্নিশর্মা হয়ে ওকে বলি— এই রঙ্গলীলা কাজে ব্যস্ত থাক বলেই আমাতে তোমার মন টানে না। আমি এই জীবন চাই না! চাই না! আগেই বলেছি নিকু তোকে— আমার মা অন্য সন্তানগুলো হারিয়ে খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র সন্তান হিসেবে আমাকে কোনো শিক্ষা, কোনো বন্ধুত্বই সে দেয় নি। বরং আমি মেজাজ করলে প্রচণ্ড মারত। বাবাও ছিল গম্ভীর... রাশভারি। আমি কারও সাথে জেদ করে, অন্যায় আবদার করে ক্ষমা পাই নি বলে ভয়ে ভয়ে বড় হয়েছি।

যখন শান্ত হতাম, খুব যুক্তি দিয়ে এসব ওকে বুঝিয়ে বলতাম।

ক্ষীণকায়া এক ফালি জলের ধারা সামনে। ক্ষীণ কটি নারী যেন। তারই ওপরে বক বহরের দর্পিত গ্রীবা। মা'র ঠাণ্ডা হাত ধরে নিজের ভেতর থেকে কেঁপে ওঠা কম্পন চাপছে নিকুন্তিলা। ছায়া নামছে মন্থর গতিতে রোদ্দুরের লালিমা চেটে। গাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে বসে থাকা মা যেন প্রস্তরমূর্তি... কোনো রিহার্সেলের বাক্য আউড়ে যাচ্ছে— ও ছিল তার ছবি বানানোর ব্যাপারে আধ পাগল। ফলে, সে প্রায়ই সময় মেইনটেন করতে পারত না। অপেক্ষা প্রথম আমাকে রোমাঞ্চিত করতে করতে শেষে দোযখের আগুনে নিয়ে ফেলত, সে কখনো দেরিতে এসে, কখনো টেলিফোনে ক্ষমার পর ক্ষমা চাইত। একদিন বিকারগ্রস্তের মতন আমি ওর শার্ট খামচে একাকার করে বলেছিলাম, ভেবেছ বাবা-মা'র সংসারে কষ্ট পেয়ে বড় হওয়া মেয়ে, তুমি যা ব্যবহার করবে, তা-ই সহ্য করে তোমার পথ চেয়ে বসে থাকব ? তুমি আমার অহঙ্কার চেনো না। আমি তোমার জীবনে আর থাকব না, দশ পুরুষ নিয়ে ঘুরে বেড়াব, সেই রূপ আর শরীর দুই-ই আমার আছে। আরেকদিন তার নিস্তব্ধতার মুখে আছড়ে পড়েছি— তুমি অন্তত আমাকে তোমার রক্ষিতার স্থানে নিয়ে বসাও। আমি এর চেয়ে বেশি কিছু তোমার কাছে চাই না। সে বধির, আমার কোনো কথার প্রত্যুত্তর করে না। আমি চিৎকার করি, 'রক্ষিতা' শুনে আহত হয়েছ ? আমার চেয়ে তার মূল্য অনেক বেশি। একজন রক্ষিতার কাছে একজন পুরুষ সমাজের কাছে ছোট হয়ে, স্ত্রীর কাছে ছোট হয়ে তার আকর্ষণে তার কাছে ছুটে আসে।

আমার অবদমন যে কত সাংঘাতিক হয়ে উঠছিল আমি টের পাই নি, আমার ভেতর সভ্যতার মাঝখানে যে এক গলিত জন্তু বিচ্ছিরি জংলি বাস করছিল, আমি জানতাম না। আমি ওকে বিকারগ্রস্তের মতো বকে যেতাম... ও হাত পা ধরে অসহায়ের মতো আমাকে জড়িয়ে ধরে শান্ত করত।

একদিন আমি মিনিট গুণে বলে দিলাম, পাঁচটা এক মিনিটে আমি ক্রিসেন্ট লেকের সামনে থাকব। পৌনে পাঁচটায় আমি গিয়ে পৌঁছলাম। পাঁচটা দুই মিনিটে দূরে তাকে দেখে আমি স্কুটারে চেপে বাড়ি চলে আসি।

সে বেল টেপে কিছুক্ষণ পর। বাবা মা বাইরে, আমি দরজা খুলি না। বুয়াকে কঠিন নিষেধ

করি। একটানা বেল টিপে সে চলে যায়! কিছুক্ষণ পর ফোন এলে রিসিভার কানে নিয়ে আমি চিৎকার করে বলি— পামট্রির ঠিক নিচটায় তোমার পাঁচটা একে থাকার কথা ছিল।

নিতু...।

তোমার তাচ্ছিল্যের শোধ আমি কী করে নিই দেখ, এখন আমি ব্লেড দিয়ে আমার পায়ে পাঁচটা মাঝারি এবং একটা বড় আঁচড় বসাব... বাড়িতে কেউ নেই। আমি রক্তের স্রোতে গড়াতে থাকব।

নিতু... নিতু তোমার পায়ে ধরি... জুবায়ের ফোনে পাগল হয়ে ওঠে... আমার মৃত্যুর দোহাই তুমি এই কাজ করো না— আই এ্যাম সরি নিতু।

তুমি এসে আমার লাশ দেখে যেও। বলে ফোন রেখে উদ্‌ভ্রান্তের মতো তা-ই করি। বুয়া রক্ত দেখে চেঁচাতে থাকে। ডাক্তার যখন এসেছে, আমি অচেতন!

মা এসে রাগে ক্ষোভে পাগল প্রায়... ও মরুক মরুক।

জ্ঞান ফিরলে জুবায়েরকে খুঁজি... ততোক্ষণে গ্লানি আর ভালোবাসায় আমার মন ভরে উঠেছে। কিন্তু ও লাপাত্তা! ভয়ে আমি আধমরা হয়ে যাই— ও যদি না আসে ?

একদিন পর সে আসে। উস্কোখুস্কো মুখ। উদভ্রান্ত চুল। সাথে সে কয়েকজন বন্ধু নিয়ে এসেছে। জুবায়ের কাজিকে খবর দিতে বলে। শান্তনুকে খবর দিই আমি। আমার অবস্থা দেখে মা আর আনুষ্ঠানিকতার মোহে যায় না।

সেদিন কয়েকজন আত্মীয়র সামনে আমাদের বিয়ে হয়।

নিকুন্তিলার নরম হাতে মা'র শক্ত হাত কাঁপছে। সামনে জল মথিত করছে স্রোতদল। নিকুন্তিলা স্তব্ধতায় বিমূঢ়— এ সে কার গল্প শুনছে ? মাথার ওপর পাখির কিচিরমিচির। কী জ্বলন্ত অগ্নি... কী বিষাক্ত বন্যার স্রোত সারাজীবন বুকে বাঁধ দিয়ে মা তাকে বড় করেছে।

বিয়ের রাতে ঘটল মূল সর্বনাশ... ওর বন্ধুরা ফুল দিয়ে ওর বিছানা সাজিয়ে দিয়ে গেল, এর আগে ওর স্পর্শের মোহে আমি ছটফট করেছি। সেই রাতে আমি যখন সেই ঘোরে কম্পিত... দরজা ভিড়িয়ে আমাকে আলতো করে চুমু খেয়ে সে বলল— ঘুমিয়ে পড়ো!

ওর স্পর্শের তৃষ্ণায় আমার শরীরের ভেতরে গনগনে আগুনের স্ফুলিঙ্গ। আমি ঘোরের মধ্যে ওকে জড়িয়ে ধরলে ও প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, তোমার পায়ে সাংঘাতিক ব্যান্ডেজ। নিতু, তোমার বিশ্রাম দরকার!

আমি ফুলশয্যা না হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছি!

নিতু... এই আমিই তো আছি... তোমাকে বিয়ে করেছি। তুমি আগে সুস্থ হও!

কিন্তু এই রাতটা প্রতিটি মানুষের কাঙ্ক্ষিত রাত... আমি জুবায়েরকে আকুল হয়ে জড়িয়ে ধরি... এই রাতের সুখ অন্য রাত দিয়ে পূরণ হওয়ার নয়।

আমারও তো তোমাকে নিয়ে একরকম স্বপ্ন আছে নিতু... ওর গভীর শ্যামলা মুখে ছায়া,

প্রথম স্পর্শটা যদি আমার এই ভয়ে কাটে, তুমি পায়ে ব্যথা পাচ্ছ...। লক্ষ্মী নিতু, তুমি সেরে ওঠো!

আমাকে জড়িয়ে ধরে ও ঘুমিয়ে পড়ে।

মা, মানুষকে বোঝার এত ক্ষমতা তোমার! সেসময় ছিল না ? নিকুন্তিলা প্রশ্ন করে, তাহলে কী করে আবিষ্কার করেছিলেন তিনি, তোমার প্রতিটি কথার পেছনে বিশ্লেষণ থাকে ?

মা বলে— ওকে আঘাত করার পর শান্ত আমি কী প্রেমে যে ওকে আঁকড়ে ধরে প্রতিটি বিষয়ের বিশ্লেষণ করতাম, তুই দেখ নিকু, যে আমার প্রতিটি কথার যৌক্তিক বিশ্লেষণের ঘোরে পড়েছিল, আমি প্রেমে অন্ধ হয়ে কী অযৌক্তিক আঘাতই না করতে শুরু করলাম। আমি মর্মান্তিক জেদে বিষয়টাকে এইভাবে নিলাম, আমার প্রতি ওর করুণা আছে, মায়া আছে... প্রেম কিংবা রোমাঞ্চ নেই। আমার স্টকে সব সময় স্লিপিং পিল থাকত। ওকে জব্দ করতে সেই রাতে আমি তিরিশটা স্লিপিং পিল খাই।

মা! আর্তনাদ করে ওঠে নিকুন্তিলা... উনি কি মানুষ ছিলেন না অন্য কিছু ? আমি আর সহ্য করতে পারছি না মা, আমার বুকে খুব ব্যথা হচ্ছে। বাকি ঘটনা পরে বল মা... পরে বল! নিকুন্তিলার ফোঁপানো জল সন্ধ্যার আলো-আঁধারির মধ্যে মিশে যায়।

নিকুন্তিলার চিন্তার কোষ হিমাঙ্গ থেকে হিমাঙ্গে ছড়ায়। নিজেকে বিন্যস্ত করতে পারে না সে। তার স্পন্দনে প্রাণের ধরক ধরকের মধ্যে চাবুক খাওয়া এক আহত মানুষের ছবি। চাবুক হাতে বিকারগ্রস্ত মা... কী করে বাবাকে এতকাল সুখী রেখেছে ? এত বিষ বুকে চেপে ? সেই চাবুক খাওয়া মানুষটার স্তম্ভিত চিৎকার ঘুমের মধ্যে তাকে চমকে দেয়।

কম্পিউটারের মধ্যে নিজেকে সুস্থির করতে গিয়ে জট পাকিয়ে যায়। প্যারানয়েডের বল বারবার পড়ে যাচ্ছে এক লেভেলেই। ত্রিশ লেভেল পার করা নিকুন্তিলা হাঁপিয়ে ওঠে। টেরিজ...! তাও হিমশিম। মাথা চক্কর দিতে থাকে। আর কিছু দেখতে পায় না।

যে মা জুবায়ের মানুষটার একটি বিজ্ঞাপনচিত্রের মেয়েকে সহ্য করতে পারে নি সেই মা'র সাথে বাবার ছেলেবেলার বান্ধবী প্রায়ই ফোনে কথা বলে। দু'একদিন মা বাবার সাথে ওর বাড়িতেও গেছে। মা বাবার এখানে এসে এত আমূল পাল্টে গেল, কেন ? তবে কি মা বাবার কাছে কিছু প্রত্যাশা করে না ? মা'র নৈঃসঙ্গবোধ নিকুন্তিলাকে কুরে কুরে খায়।

পাশের ঘরে শান্তনু মামার গলা— নতুন কোনো ঝামেলা হয়েছে ? নিতু, তোমাকে এত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন ?

নিজেকে চারপাশে লুকাতে মা'র আজকাল জুড়ি নেই— আচ্ছা শান্তনু, তুমি কি আজকাল হস্তকে নারী বানিয়েছ ?

ওসব ছাইভস্ম আমি ভাবনায় আনতে পারি না।

বিয়ে করছ না, ফিজিক্যাল ক্রাইসিস বলে একটা ব্যাপার আছে তো, প্রস্টিটিওটে যাও ?

নাহ্! এইডসের ভয় আছে না!

বিয়ে করে ফেল! আর কত একা থাকবে ?

তোমার মতো মেয়ে পেলে—।

আমার মতো মেয়ে ? মা হেঁয়ালি বাতাসে উড়তে থাকে। আমার ভালোবাসার বিষ যে কত ভয়ঙ্কর! এত জানো! তারপরও ?

ফোন আসে। মা ছুটতে ছুটতে এসে হাঁপাতে থাকে। শেষে অন্য কারো গলা শুনে লাইন কেটে রিসিভার উঠিয়ে রাখে।

সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত বাড়ছে। বাবা ট্যুরে। মা এসে গুটিশুটি নিকুন্তিলার লেপের নিচে শোয়।

তারপর ? নিকুন্তিলার স্পষ্ট প্রশ্ন।

মায়ের মধ্যে যেন ফিনকি দিয়ে দিয়ে উঠছে অবিন্যস্ত স্মৃতি— বিয়ের আগের একটা ঘটনা মনে পড়ছে, আমি চাইতাম ও আমাকে চুমু খাক। একদিন এক নতুন পরিবেশে যখন এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও শুধু আমার হাত ধরে নিষ্পলক চেয়ে থাকল, আমি ওর সামনে আমার এক ক্লাসমেটকে ফোন করে বললাম, বাসায় আমি একা। তুমি এক্ষুণি চলে আস। আমি ন্যুড হয়ে তোমাকে নাচ দেখাব। অ্যাই, তুমি নপুংসক নাতো ?

নিকুন্তিলা লেপের তলায় কাঁপতে কাঁপতে বলল, তারপরও কেন সে তোমাকে বিয়ে করেছিল ? মা'র চোখ আজকাল ক্রমাগত ভেজে— সে বোধ করত, এই পৃথিবীতে এই অত্যাচার আমি একমাত্র তার সাথেই করতে পারি। সবচাইতে তাকেই ভালবাসি। সে আমার মা'র পেটানো প্রহারের দাগ বিয়ের আগে দেখেছে। বিয়ের পর জিভ দিয়ে স্পর্শ করেছে। এখন মা আমার জন্য পাগল! আমি গেলেই অস্থির হয়, কিন্তু তার প্রতি আমার কোনো টান নেই। যা হোক, বিয়ের রাতের পর এক সপ্তাহ গেছে। এক রাতে ও হাত বাড়ালে আমি ওকে বলি, আমার স্বপ্ন মরে গেছে, শরীর মরে গেছে। তুমি যদি আমাকে কোনোদিন স্পর্শ করো, আমি গলায় দড়ি দেব।

আমার এইসব কাণ্ডে সাহসী মানুষটা ক্রমেই নিজে মানসিক ভারসাম্য হারাতে শুরু করে। আমাকে রক্ষার জন্য সে ডকুমেন্টারিতে নিজেকে যুক্ত করার স্বপ্নের কাজ বাদ দিয়ে ন'টা পাঁচটার চাকরি নেয়, যাতে সময় মতো ঘরে ফিরতে পারে। একটা বিষয় হলো, ওকে আঘাত দেয়ার পরই সাংঘাতিক অনুতপ্ত হতাম আমি, চুমোয় চুমোয় ওকে ভরিয়ে বলতাম, আমি একটা অসভ্য জন্তু! আমাকে জুতো দিয়ে পেটাতে পারো না ? আর একটা কথা, ঘোরের মধ্যে প্রায়ই কখনো ওর কাঁধের সুগন্ধে মাথা রেখে কখনো ওর দু'হাত চেপে ধরে বলতাম— আমাকে কোনোদিন ছেড়ে যাবে না তো ? কোনো দিন না ? সস্নেহ আদরে আমাকে চেপে ধরে সে কী প্রবল আস্থার উত্তর তার— না।

ফলে সে হয়ে উঠত দ্বিধাগ্রস্ত! যে রাতে ও হাত বাড়ালে আমি স্পর্শ আর আত্মহত্যার হুমকি দিলাম, তার পরপরই তার নির্জন অসহায় চোখ দুটো দেখে আমার সে-কী অনুতাপ! আমি

পুরো পোশাক খুলে আধোবাতি খুলে তাকে ডাকলাম, জুবায়ের... সরি সোনা, উইথড্র করলাম আমার কথা। কিন্তু তার তখন সাংঘাতিক বিপদ! আমাকে বুঝে উঠতে পারছে না। ভাবছে, আমি বুঝি ছল করে তাকে দিয়ে শরীর সম্পর্ক করিয়ে সেই ব্যান্ডেজবাসর রাতের কঠিন শোধ নেব। আবার আমার ডাকে সে যদি সাড়া না দেয়, তাহলেও আমি সাংঘাতিক কোনো কাণ্ড করে ফেলতে পারি। একজন স্বাপ্নিক পুরুষের প্রথম সঙ্গম হলো প্রচণ্ড এক হিম ভয়ে। আমি অপ্সরীর মতো নিজেকে নানা কায়দায় বিন্যস্ত না করলে সেই রাতে হয়তো সে ব্যর্থ হতো!

সব শেষে সে যখন নিথর আমার ওপরে, আমি ওকে কাঁপিয়ে দিয়ে বলি— আজ রাত্তিরের স্পর্শে যেন আমার ভেতরে সন্তানের জন্ম হয়। সেদিন আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম— যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটাই, সেই ভয়ে সে সারা রাত আমার পাশে জেগেছিল।

সে কোনো অভিযোগই করত না তোমাকে ? নিকুন্তিলার প্রশ্ন।

করত, বলত, ওর স্বতঃস্ফূর্ত বাঁচার জীবনটা আমি নষ্ট করে দিয়েছি। আমার কান্না পেত। ওর বুকে আছড়ে পড়ে ক্ষমা চাইতাম... এই দেখো, আমার বুক, নখ, চুল এইসব তোমার! তুমি আমাকে ভয় পেয়ো না।

ও সময়মতো ঘরে ফিরত। আমরা বাইরে বেড়াতে যেতাম। ক্রমে ক্রমে অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে এলাম আমি। কিন্তু জুবায়ের নিজের মধ্যে গুটিয়ে যেতে থাকল। এমনিতেই সে কম কথা বলত। কিন্তু প্রথম দিকে হঠাৎ হঠাৎ নিজ থেকে বলত এমন মধুর, কানে লেগে থাকার মতো। যেমন হেই রাজকন্যা... হেই রিনিকঝিনিক... তুমি নক্ষত্র, জ্যোতিষ্ক ছাড়া যার মধ্যে আলো জ্বলে না। হেই কচ্ছপ নারী, ওপরে বর্ম কঠিন ভেতরে ততোটাই নরোম, তাই তোমার দায়িত্ব নিতে ভয় পাই, আমার এত সাহস কই— জ্যোতিষ্কের দায়িত্ব নিই ? এরকম অনেক নামে আমাকে ডাকত। আমাকে বলত, ভাগ্যিস তুমি জন্মেছিলে, নইলে এই সম্পদ আমি কোথায় পেতাম ? আমি ওর শার্ট খামচে ধরে কখনো যখন বলেছি, ওই যে ছিন্নভিন্ন মেঘ উষ্ণতার তাপে যে বারবার রূপ বদল করে, জুবায়ের, তুমি সেই মেঘ। সে বলত, তুমি কি জানো নিতু, তুমি সেই আকাশ, অসীম যার দিগন্ত। আমি বলতাম, মেঘ না থাকলে আকাশ তো একঘেয়ে, একই রঙ, স্থির, তার চাইতে যতই ভাঙুক মেঘ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ নিয়ে আমাকে সাজিয়ে দিয়ে যায়। নিতু... নিতু... কী করে এইভাবে ভাবো তুমি ? তোমার চোখে সেই মেঘ কখনো সরল, কখনো গভীর মাদকতা তার মধ্যে। কাজলের কালি উপচে তার মধ্যে এত ভাষা খেলা করে, আমি ভাষা হারিয়ে তখন চুপ! তখন তুমি আমার ঘোর আক্রান্ত নিশ্চুপতাকে নিস্পৃহতা মনে করে কেবলই বল, আমি স্তুতি শুনতে পছন্দ করি, জুবায়ের, আমার কী তোমাকে আকর্ষণ করে, কী সুন্দর শব্দাকারে বলো!

ও বলত, এইসব কি শব্দ করে বলা যায় ? ক্রমশ এইসব কথা আমাদের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল।

ক্রমে ক্রমে শুধু আমার প্রশ্নের উত্তর দিত। নিজ থেকে কিছু বলত না। ধর নিকু, দক্ষিণের হাওয়া বইছে, বারান্দায় অপলক আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে সে, আমি প্রশ্ন করলাম, আমার কী সুন্দর ?

স-ব!

আহা! তবুও ভেঙে ভেঙে বলো!

আমি আলাদা করে বলতে পারি না!

একটু পেরে দেখো না!

তাহলে তো সব খুলে দেখে দেখে বলতে হবে!

ধেৎ!

ধেৎ কী ?

বলো না, কি সুন্দর ?

চোখ!

আমি দেখতে কেমন ?

পরীর মতো!

কোনোদিন বলত ঠোঁট, কোনোদিন গ্রীবা, কোনোদিন স্তন... সবই প্রশ্ন করলে। আমার খুব অভিমান হতো কিন্তু ওর বলার ভঙ্গিটার মধ্যে থাকত এত রোমাঞ্চ আমি অভিভূত হতাম।

বলতে বলতে মা লম্বা একটা নিঃশ্বাস টেনে, যেহেতু এলকোহল খেয়েছে, ঘুমিয়ে পড়ে।

এ যেন এক ধারাবাহিক উপন্যাস। তীব্র বেদনার কাহিনীও মানুষ অনেক সময় রসিয়ে রসিয়ে পড়ে, কেউ পড়ে এক নিঃশ্বাসে। নিকুন্তিলা রসিয়ে পড়ার পক্ষে। কিছুটা পড়বে, শেষ না করে তার পরিণতি, ডালপালা নিয়ে বহুবর্ণ ধারণায় আক্রান্ত হবে। মা যদি ক্রমে ক্রমে ঠিকই হয়ে গিয়েছিল, তবে মানুষটি চলে গেল কেন ? ওর রূপ, সহিষ্ণুতা, মা'র প্রতি অপার প্রেম নিকুন্তিলাকে মানুষটির এত নৈকট্যে নিয়ে যায়, সেখানে ইদানীং বাবাকে, মাকে অনেক দূরের মানুষ মনে হয়। মনে হয়, ওই মানুষটাই তার বহুযুগের চেনা। ফিনফিনে মেঘের মতো তার ঘরে উড়ছে... হাত বাড়ালেই ছুঁতে পাবে।

সকালে চা খেতে খেতে মা বলে— তোর বিজনের খবর কী ?

এই আর কী, চলে যাচ্ছে। যতই বলো, বয়সটা একটা ফ্যাক্টর। কিছু পড়াশোনা করেছে বলে অবচেতনেই জাহির করার প্রবণতা বেশি। ভেতরে অত গভীরতা নেই। ভান করে শান্ত থাকে।

এত বুঝিস তুই... মা লিকারে পট থেকে চিনি ঢেলে নাড়তে থাকে। তুইতো তারই বয়সী। ছেলেরা একই বয়সে মেয়েদের চাইতে কিছুটা ইমম্যাচুর্ট তো হয়— নিকুন্তিলা বাটার টোস্টে

কামড় বসায়, অবশ্য পার্সন টু পার্সন ভেরি করে, তুমি আমাকে যেভাবে বড় করেছ, সেই ব্যাপারটা পুরোপুরি আলাদা। তুমি ছাড়া এই পৃথিবীতে কেউ আর ধারণা করতে পারবে না, আমি কতটা এই বয়সেই বুঝি, আমার সাথে কতটা শেয়ার করতে পারে একজন পরিণত মানুষও, আমিও নিজেকে শো করতে পছন্দ করি না।

জহির কাকুকে নিয়ে খালামণি আসে... ওদের একটা পিচ্চি ছেলে হয়েছে। বয়স এখন দেড়। মা-তো অবাক— এত সকালে ?

কী করব ? দস্যুটা রাত থেকেই নিকু নিকু করে মুখের ফেনা তুলে ফেলছে। নিকুন্তিলাকে দেখে বাচ্চাটা ওর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সলজ্জ মুখে খালামণি বলে— আমি আবার কনসিভ করেছি।

সে-কী, এত তাড়াতাড়ি ? কনগ্রেচ্যুলেশন!

জহির কাকু বলে, হিসেবি মহিলা, বলে— দুটো এক সাথে বড় হবে। এক সাথে স্কুলে যাবে...।

নিকুন্তিলার এখনো মেট্রিক পরীক্ষা শেয়। নিকুন্তিলা ঝাড়া হাত পা। ক্লান্তিতে... অবসরে, নিজের ঘর নিজে গোছানোর কাজে, গান শুনতে শুনতে তার মস্তিষ্কে এক চিন্তার সরোদ টানা বেজে যায়... কোথায় সেই মানুষ! যে মা বছরের পর বছর একটা কণ্ঠ শোনার তৃষ্ণায় পাগলের মতো আছড়ে পড়েছে রিসিভারে, কেন সেই সহিষ্ণু মানুষটি মাকে সারাজীবনের এই কঠিন শাস্তির মধ্যে ফেলেছিল ? কেন ?

যে বয়স নিকুন্তিলার আমকুড়ানির, শৈশব কৈশোরের আবিলতায় সময় যে নিকুন্তিলার, তার পৃথিবীতে জুবায়ের নামের এক ভয়ঙ্কর পরিণত অধ্যায়, অন্ধকারের মদিরতা অনন্য হয়ে উঠলে, তাকে অনেকটাই বুড়িয়ে তোলে।

সন্ধ্যায় বাতি চলে যায়।

মা মোমের শিখা জ্বালায়।

আজও মা এলকোহল খেয়েছ ? কী লাভ মা নিজের এত ক্ষতি করে ?

আজই শেষ! হালকা রশ্মি বহুবর্ণ কাঁকড়ার মতো সারা দেয়াল জুড়ে নাচতে থাকলে মা বলে, আজ অ্যালকোহলের জল দিয়ে বুকে আটকে যাওয়া জায়গাটার শেষ মুখটা নরম করে বহুদিন পুঁতে রাখা অন্য এক আমাকে তোর হাতে তুলে দিয়ে শান্ত হয়ে যাব।

নিকুন্তিলার ভেতরে সজোরে উচ্চারিত হয়— মা, আমার হাত এত ছোট। এত ভার বইবার শক্তি কি আমার আছে ? কিন্তু অনুচ্চারিত স্তব্ধতায় তার মনে হয়, যা-ই বয়স হোক তার—

মা'র দায়িত্ব নেয়ার সময় এসেছে। তাকে অন্তত ভেঙে পড়লে চলবে না।

মা'র মুখে এক ফালি আলো। শীত কুয়াশার মিশেলে আজ এই আলোটা অপার্থিব ঠেকছে। যন্ত্রণাময় বিষাদময় মা'র কণ্ঠ— পরদিন সকালে আমাকে হতবাক করে দিয়ে জুবায়ের বলে, আমি সেই রাতেই সন্তান চেয়ে সঙ্গমের আনন্দকে তুচ্ছ করেছি। আমি তার রচিত স্বপ্নকে হত্যা করেছি।

তোমার সন্তানই তো চেয়েছি জুবায়ের, আমার গর্ভের উত্তাপে আমাদের প্রথম মিলনের সন্তান বড় হবে— আমার এই আকাঙ্ক্ষাকে তুমি ছোট করে দেখলে ? আমি বলি, তুমি তো জানোই, আমি কেমন সন্তান পাগল। আমার মা'র এই বিকারটা আমার মধ্যে ঢুকে গেছে— অনেক সন্তানে ভরে যাবে আমার ঘর।

কিন্তু দুটি ভালবাসার মানুষের স্পর্শের মধ্যে যে মানুষ সন্তানের হিসেব মাথায় রাখে... জুবায়ের আপসেট, তার নান্দনিক সৌন্দর্য নিয়ে আমার মধ্যে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে। তার রহস্যময়তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে, মানুষ কি জমি, দুজন মিলে বীজ পুঁততে থাকলাম গাছ আর ফলের প্রত্যাশায় ? তুমি একটার পর একটা কাঁটা ঢুকিয়ে আমার মাথাটা রক্তাক্ত করে তুলছ। স্পর্শ হবে... রোমাঞ্চ হবে... অনুভব হবে... তার মধ্য দিয়ে সন্তান যদি আসে, সে-ই হবে ভালোবাসার সন্তান। সন্তানের হিসেব এত আগে কেন ? তাছাড়া ঘর ভর্তি সন্তান... এ-কি কবুতর বা খরগোসের বাচ্চা... ঘর ভর্তি দেখে শুধু আনন্দ পাওয়া ? প্রতিটি সন্তানের জন্মের সাথে জড়িত তার সুস্থ স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা, তার পড়াশোনা, বাবা-মার তৈরি করে দেয়া সুন্দর ভবিষ্যৎ। এত অর্থ কি আমার আছে ? তুমি কি তার যোগ্য সুস্থ মা মনে করো তোমাকে ?

আমার মাথার মধ্যে ফের চিড়িক দিয়ে ওঠে রক্ত... নিকু... আমি বিকারগ্রস্থের মতো চেঁচাতে থাকি... আমি অসুস্থ ? আমি অসুস্থ ? খুব তো ভণ্ডামি করে পিঠ পেতে আমার যন্ত্রণা সইতে... তোমার ভানের মুখোস খুলে যাচ্ছে... বলে এক দৌড়ে গিয়ে দেয়ালে এতে জোরে মাথা ঠুকতে থাকি... সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই রক্তে আমার কপাল ভেসে যায়।

তোমার শ্বশুর শাশুড়ি ননদ দেবর ছিল না ?

ছিল। ওরা ছেলের বিয়েটাকে মেনে নেয় নি। ওরা বলত জুবায়ের একটা অসুস্থ পাগল মেয়েকে বিয়ে করেছে।

আমাকে জুবায়ের বলত, যেখানে তোমার সম্মান নেই, তাদের সাথে আমি সম্পর্ক রাখব না।

নিকুন্তিলা টেনে গায়ে শাল জড়িয়ে মোমের শিখাটা সামনে থেকে সরিয়ে নিলে মা যেন কিছুটা সহজ বোধ করে, হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে ফের শুরু করে, সে আমার কপালে বেন্ডেজ করে দিয়ে চুমো খেয়ে বিছানায় আমাকে শুইয়ে দিয়ে বলে, এভাবে আমাকে কষ্ট দিয়ে কী আনন্দ পাও ?

আমি তো আমার শরীরে অত্যাচার করি, তোমাকে তো কষ্ট দেই না।

এই যে খালি পিঠ পেতে দিলাম— বলে জুবায়ের ওর শার্ট খুলে আপেল কাটার ছুরিটা নিয়ে আসে... যত খুশি দাগ বসাও... রক্ত ঝরাও... যা খুশি আমার দেহে করো, বলতে বলতে

বুঝলি নিকু সেই প্রথম সে কেঁদে দেয়, দয়া করে নিজের ওপর অত্যাচার কর না। তোমার শরীরটা আমার কাছে আমার নিজের শরীর, আমার সমস্ত অস্তিত্বের চাইতে আপন!

আমার মধ্যে কী এক বিবর্তন ঘটে... ওকে জড়িয়ে আধ পাগলের মতো কাঁদতে থাকি... শেষবারের মতো ক্ষমা করে দাও... আর করব না।

সেই রাতে মধুর শারীরিক সম্পর্ক হয় আমাদের।

আমি ওকে বলি, দেখো আমার একটা ছেলে হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি আর তোমাকে জ্বালানোর সময়ই পাব না।

ও বলে, আমি চাই মেয়ে।

এরপর একটা সন্তানের আকাঙ্ক্ষা ওর মধ্যেও ভর করে। আমরা সমুদ্রে হানিমুনে যাই, কী আনন্দ নিকু... কী সুখ... আমি জলের সাথে ধাক্কা খেয়ে বারবার পড়ে যাই, ও শুধু আমার দিকে অপলক চেয়ে থাকে। কখনো সশব্দে হাসতে থাকে। ও আমার জন্য কেনে একটা ক্ষুদ্র হীরের নাক ফুল! তোর বাবাকে বিয়ের পর আমি ওর দেয়া একটি ব্লাউজও সাথে আনি নি। কিন্তু এই নাক ফুলটা আমি কিছুর বিনিময়ে নাক থেকে খুলতে পারি নি। এখনো চোখ বুজে এটাতে হাত দিলে আমি ওর শরীরের গন্ধ পাই। নিজেকে আমি নিজেই তখন ভয় পেতে শুরু করি। আমার মনে হয়, আর একটিও দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ওকে যেন আমি ফের ভীত না করি। ও এলে নিজ হাতে শার্ট খুলে দিই... ভোরে নিজ হাতে নাস্তা বানাই ওর পছন্দের, আমার কথা কমে যায়।

এত সূক্ষ্ম চোখ ছিল ওর, বলে, তুমি বদলে যাচ্ছ, তুমি ট্র্যাডিশনাল মহিলাদের মতো হয়ে যাচ্ছ।

তবে সেটা বুঝি সুন্দর ছিল, নিজেকে আঘাত করা ?

সেটাও সুন্দর না। তবে তুমি একদম অভিযোগ করা ছেড়ে দেবে, আমার সেবা করবে, অস্থির হয়ে নখ খুটবে না, গ্রীবা বাঁকিয়ে, মুখ চেপে হাসবে না— না না, এই বদলে যাওয়া তোমাকে আমার চাই না!

কী আশ্চর্য চরিত্র, না নিকু ? সে-ই আমাকে শেষে বুদ্ধি দেয়, তোমার ইংরেজি খুব ভালো, তুমি অনুবাদে ঢুকে যাও।

মা থেমে যায়। ইলেকট্রিসিটি চলে এলে দু'জনের চোখই ধাঁধিয়ে যায়। নিকুন্তিলার তুমুল হৃদকম্পন! যেন রূপকথার কোনো রাজপুত্রের গল্প শুনছে এই ঘোরে বলে, মা বাতি নিভিয়ে দিই। হুইস্কির গেলাসে ফের চুমুক দিয়ে মা বলে, তোর ঠোঁট নীল হয়ে গেছে। আমি তো মদের ঘোরে শীত টের পাচ্ছি না! আচ্ছা নিকু, খুব কি অসংলগ্ন বলছি ? না হয় বলছি, তোর বাবাকে এখন আকুলভাবে মনে পড়ছে, ওর সাথে আমার বিয়ের রাতে আমার নিজেকে মনে হয়েছিল নারীত্বহীন। আমার শরীরে কোনো তরঙ্গ ছিল না। ও পরম স্নেহে সেই বিষয়টা মেনে নিলে ক্রমে ক্রমে আমরা সহজ হয়ে এসেছি।

নিকু... নিকু... তুই হিটারটা ছেড়ে দে।

মা, আজ চাঁদ উঠেছে!

চল ছাদে যাই।

মা যেন আধো আলোর ঘোরে সাঁতার কেটে কেটে ছাদে ওঠে। ছাদে রাত্রির খয়েরী মাতামাতি। ওরা ফ্ল্যাটের সবচাইতে ওপর তলায় থাকে। কতদিন এমন হয়েছে ঘোর রাতে বাবাকে ঘুমে রেখে সুরাক্রান্ত মা বৃষ্টির টানে ভূতের মতো ছাদে গিয়ে একা একা নেচেছে।

মেঝেতে পাটি বিছিয়ে দু'জন বসে। চাঁদ ঠিক মায়ের মাথা বরাবর... স্বৈরিনী শীতের সাথে দুধ মিশে জ্যোৎস্না ছাদের ওর খিলখিল হেসে লুটাচ্ছে। যোজন ব্যাপী অমৃত আলোর চরখি খেলা। সেই পরিভ্রমণরত আলোর নিচে নিকুন্তিলাও যেন ভাসতে থাকে।

জ্বলজ্বলে চোখ মা'র, অস্ফুট কণ্ঠ— এক বছর এভাবেই কেটে যায়। আমি প্রচুর ইংরেজি সাহিত্যের বই পড়ি। অনুবাদ করি। তারপরও কী এক শূন্যতা! এমনও রাত গেছে আমরা দু'তিনবার করে থেকেছি! সারা মাস সে-কী অস্থির প্রতীক্ষা! আমার পিরিয়ড ঠিক টাইমলিই হতো। মাস ফুরলে রক্ত দেখে আমার অস্থির কান্না, তার বিষণ্নতা।

কিন্তু মা, আমার মনে হয়, সে তোমার স্নায়ুর ভাষা তেমন বুঝত না। সে নৈঃশব্দ দিয়ে তোমাকে উন্মাদ করে তুলত। বাবা তোমাকে যত প্রকাশ্যে গুরুত্ব দেয়, ততটা গুরুত্বের প্রকাশ সে ঘটাত না। এ হয়তো তার প্রবণতা...

নিকু, তুই হয়তো অনেকটা ঠিকই বলেছিস। আমি অনেক বেশি প্রেমের প্রকাশ দেখতে চাইতাম ওর কাছে। যা হোক, এভাবেই দিনগুলি যাচ্ছিল। এর মধ্যে অফিস থেকে ওর দেশের বাইরে যাওয়ার একটা প্রস্তাব এল। এক মাসের জন্য যাবে। ঠিক সেই মাসের শেষ দিকে আমার সে-কী বমি বমি... মাথা ঘোরায়... কিচ্ছু খেতে পারি না... এদিকে জীবনে আমার পিরিয়ডের ডেটের হেরফের হয় না, সে মাসে এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। খবর নেই।

নিকুন্তিলার শিরদাঁড়ায় হিমস্রোত বয়ে যায়।

মাথার মধ্যে মুহূর্তে টনটন করে খোল করতাল।

মা বলে— জুবায়ের আনন্দে পাগলের মতো হয়ে যায়। কী রকম পাগল... বলে, আমি দেশের বাইরে যাব না। এরপর এক রাতে একটা অপূর্ব সুন্দর পরীর মতো ঝাঁকড়া এক ফুলেল, পুচকে শাদা ফ্রক নিয়ে আসে। আমার তলপেটে মাথা রেখে বলে— যে নদীর পাশে আমার জন্ম, প্রথম দিন এই ফ্রক আমার জাদুকে পরিয়ে— আমি ওকে সেই নদীর নামেই ডাকব, সোমেশ্বরী!

বুক ঠেলে কান্না উঠছে নিকুন্তিলার। উত্তুরের হাওয়া ভয় উচ্ছ্বাসে মৃতপ্রায় হয়ে ওকে চাঁদআসমানের নিচে ঠেসে রাখে। বাবার মুখটা তীরের মতো তার বুকটা ফালা করে দিয়ে যায়, আর কয়েক মিনিটের অপেক্ষা... মা ঘোর ঢুলে বলে উঠবে— তুই জুবায়েরের সন্তান! ভেতর থেকে বোবা চিৎকার ওঠে— মা থামো! থামো!

মা গ্লাসের তলানিটা গলায় ঢেলে ভুতুরে স্বরে হেসে ওঠে। কুয়াশার আবছায়ায় মা'র শাদা

মুখটাকে মনে হচ্ছে ছদ্মবেশী, ডাইনি... যেন নিকুন্তিলার সামনে ফণা উঠিয়ে বসে আছে সাপ! নড়ামাত্র— ছোবল।

মা বলে, ভোরে আমার কাপড়ে রক্তের ঢল!

নিঃশ্বাস টেনে বেঁচে নিকুন্তিলা ডিগবাজি খেয়ে মা'র দোযখের আগুনে গিয়ে পড়ে।

হতভম্ব হয়ে যায় জুবায়ের। আমার প্রতি মিনিটের পলপল অপেক্ষা... মুহূর্তে আমার মধ্যে ভিড় করে সেই পিশাচ— যন্ত্রণায় কুঁকড়ে আমি দৌড়ে দেশলাইয়ের কাঠি মেক্সির প্রান্তে জ্বালিয়ে দেই। জুবায়ের উন্মাদের মতো ছুটে এসে কম্বল চেপে আমার গায়ে উঠতে থাকা দাউদাউ আগুন নেভায়। পা এবং উরুর পোড়া দাগে কিছুদিন ভুগে ডাক্তারের কাছে যাই। ডাক্তার আমাদের দু'জনকে টেস্ট করে।

চন্দ্রালোকে চিৎকার করে ওঠে মা— ডাক্তার জানায় সমস্যা জুবায়েরেরই, ও কোনোদিন বাবা হবে না।

মা! মাগো মাগো! আমি আর সহ্য করতে পারছি না... এইবার নিকুন্তিলা কাঁদতে থাকে।

মা নিজের মধ্যে নিমগ্ন— আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। জুবায়েরের মুখের দিকে তাকাই না! কথা বলি না। সারাদিন কী এক নেশায় বুঁদ হয়ে থাকি।

শেষে আমাকে একদিন পেথেড্রিনের ইনজেকশান নিতে দেখে, সে ঠায় চোখে এমনভাবে আমার দিকে তাকায়, যে দৃষ্টি লাইব্রেরিতে প্রথম দিন তার মধ্যে দেখেছিলাম। সে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত! আমাকে বাধা দেয়ার শক্তিও যেন তার নেই। সেই আমাদের শেষ দেখা। অপার আসমানের দিকে স্তব্ধ মা চেয়ে বলে— রাতের আঁধারে আমাকে ঘুমন্ত রেখে সে বেরিয়ে যায়। আমিও ক'দিন নেশার ঘোরে আক্রান্ত হয়ে থাকি। তার খোঁজ নিই না। বেশ কিছুদিন পর আমার মাথায় আসমান ভেঙে দিয়ে বিদেশ থেকে ডিভোর্স লেটার আসে।

সাথে চিঠি—

> 'অন্য কাউকে বিয়ে করো। কন্যার মা হও। আমি আর কোনো দিন দেশে ফিরব না। যখন তোমার কন্যা সন্তান জন্মের খবর পাব, এই পৃথিবীর পথে হেঁটে হেঁটে আমি জানব, আমি বাবা হয়েছি। মেয়েটিকে জন্মের পরই আমার দেয়া সেই ফ্রকটি পরিও।'

নিকুন্তিলা মা'র বুকে আছড়ে পড়ে— পরিয়েছিলে মা?

না।

না?

মা'র দর্পিত মাথা জ্যোৎস্নালোকে এইবার টানটান— তোর বাবার বিয়ের রাতের প্রধান শর্ত ছিল, আজ থেকে অতীতকে মুছে আমাদের ভবিষ্যৎ যাত্রা। যতদিন বেঁচে থাকব কোনো প্রসঙ্গে কোনো ঝগড়ায়, কোনো আলোচনায় জুবায়ের নামের কেউ থাকবে না। আমি প্রমিজ করছি নিতু, তুমি শত অন্যায় করলেও অন্তত তার নাম ধরে আমি তোমাকে কোনো খোটা দেব না।

নিকুরে... মা এইবার ছাদের ওপর নিকুন্তিলার হাঁটুর ভাঁজে মুখ রেখে ডুকরে কেঁদে ওঠে, ওইরকম একটা মানুষকে তোর বাবা আমার বুকে জ্যান্ত কবর দিয়ে দিল। তাই অহর্নিশি তার নখ, তার গোঙানি, তার রক্তপাত, মিহি আর্তনাদ একাকী আমাকে তাড়িয়ে বেরিয়েছে। যদি তা না করে জুবায়েরের কান্নাটা ও নিত... বলতে দিত তার কথা... তাহলে হয়তো অনেকটা হালকা হয়ে আসতাম আমি। মানুষের ঈর্ষা বড় ভয়ঙ্কর নিকু... তারপরও কোনো দিন ওর নাম নিয়ে তোর বাবা আমাকে আঘাত করে নি... এ ওর মহা উদারতা।

তন্দ্রাহীন কানে নিকুন্তিলা শোনে সেই অস্ফুট ধ্বনি— সোমেশ্বরী! 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব...।' ধবল আলো ছিঁড়ে খুঁড়ে সে আয়নার সামনে দাঁড়ায়, শিশু ডাকার ভঙ্গিতে সেই লোকটি নিকুন্তিলার দিকে হাত বাড়ায়... অস্ফুট কান্নায় গুঁড়িয়ে পড়ে নিকুন্তিলা... বাবা... বাবা! তার নিজের বাবার পাশাপাশি আরেক মানুষের সমান সমান প্রতিচ্ছায়া! কিন্তু তার বেদনার টান যেন আজ আরো জোরালো... আরো...। ওকে বঞ্চিত করে মা বাবাকে সুখী করেছে।

এরপর সত্যিই আমি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ক্লিনিকে ভর্তি হই... মা'র কথাগুলো এখন কবিতার মতো হতে থাকবে, নিকুন্তিলা জানে। রাত বাড়বে, মা'র কথার মধ্যে ঘোর চক্কর খেতে থাকবে,— বুঝলি নিকু, জুবায়ের চলে যাওয়ার পর আমার মধ্যে ঘনঘন আত্মহত্যা করার প্রবণতা দেখা দিত। আর ভেতরে চলত পাগল অপেক্ষা, এই বুঝি ও এল! মা বলে, একদিন হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পথে বেরিয়ে ট্রাকের ধাক্কা খেলাম। মাথায় একটু চোট লেগেছিল। সেই তখনই বেশ ক'দিন ক্লিনিকে থাকতে হয়েছে। একদিন আঁধার ঘনিয়ে এসেছে ক্লিনিকের করিডোরে। বকের ডানার মতো শরীর বিস্তার করছে কুয়াশা, শীত। আমি বিমূঢ়! কিছু দেখছি, অথবা আমি কিছুই দেখছি না। শান্তনু আমার পাশে এসে দাঁড়ায়। স্তব্ধ থেকে একসময় সে কিছু বলার জন্য উশখুশ করে। সেটা টের পেয়েই কি-না আমি শান্ত স্বরে বলি, আমি এইবার সত্যিই আত্মহত্যা করবো। জানো শান্তনু, যতবার মরতে চেয়েছি ততবারই ভেতর থেকে ঠেলে উঠেছে ধিকি ধিকি এক বোধ, যদি সত্যিই দেহটা ছেড়ে প্রাণটা চলে যায়, তবে ইহ জীবনেও আমি জুবায়েরকে দেখতে পাবো না। কিন্তু শান্তনু, সেদিন, যেদিন সন্ধ্যায় ঘর থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আমি ট্রাকের ধাক্কা খেলাম, যদিও মাথার কোষগুলো ঠিক মতো কাজ করছিল না, তারপরও ভেতরে সুপ্ত এক বাঁচার লোভ ছিল, যার মধ্য ছিল সূক্ষ্ম চালাকিও। তার মানে জুবায়ের যদি শোনে, আমি আত্মহত্যা করতে গিয়ে মৃত্যুশয্যায়... ও আমাকে দেখতে আসবে। আমার আসাড় দেহটা জড়িয়ে ধরে রাতদিন বসে থাকবে। কিন্তু, কিন্তু, তারপরও কতদিন কেটে গেল, ও এলো না!

ইজি চেয়ারে হেলান দেয়া মা'র দেহটা যেন শূন্যে ভাসছে। নিকুন্তিলা নিথর বসে থাকে।

শান্তনু আমাকে বলেছিল, নিতু, পৃথিবীতে এমন একজন মানুষও নেই, যার সবটা জুড়েই সারাক্ষণ অন্ধকার থাকতে পারে। কোনো মানুষ যদি নিশ্চিত করে জেনে যায়, মাস খানেকের মধ্যেই সে ক্যান্সারে মারা যাবে, তার মধ্যে বাঁচার লোভ প্রবল থাকলেও ক্ষণিকের জন্য হলেও কোনো ঘাসের মধ্যে ফড়িং লাফাতে দেখলে সে তার মৃত্যুর কথা ভুলে আনন্দিত হয়ে উঠতে পারে। নিতু, অন্ধকারের গল্প ছাড়া তুমি কি কখনই আর কোনো গল্প জানবে না ?

কোনো একটা ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে আসা তরমুজের ফালির মতো ক্ষীণ কান্নার ধ্বনি সামনের কুয়াশা কুণ্ডলীর মধ্যে রক্ত ছড়াতে থাকে। এর মধ্যে মিহি হাওয়ার ঝিরঝিরে শীত।

বুঝলি নিকু, আমার চোখে তখন ভাসছিল শান্তনুদের বিরাট মাঠে ডুবতে থাকা সূর্যটা।

শান্তনু আমাকে বলে, নিতু ভেতরে চলো!

শান্তনু, তোমার কি মনে হয় জুবায়ের দেশের বাইরে গিয়ে অন্য কাউকে বিয়ে করে ফেলেছে ?

না!

নড়ে ওঠে নিকুন্তিলা! মা'র সারামুখে অপ্রকাশিত রক্তাক্ত ক্রন্দন। মা বলে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি কেবিনের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকতাম! এক সকালে দেখি কাঁচা রোদ্দুর হাতড়ে হাতড়ে জানালা দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। শান্তনু রাতে চলে গিয়ে প্রতিদিনই সকালে আসতো। একমাত্র, ওর সঙ্গ ছাড়া আমি আর কারও সাথে একবিন্দু সহজ বোধ করতাম না। আমার মা সব গুছিয়ে চলে যেতে যেতে বলেন, শান্তনু, নিতুর মাথার চোটটা প্রায় সেরে উঠেছে। কিন্তু ওর মনের মধ্যে চেপে বসা চোটটার চিকিৎসা কী করে করব, বাবা ?

মা চলে গেলে শান্তনু আমার মুখোমুখি বসে, করিডোর দিয়ে যেতে যেতে তোমার মা বলল, তুমি মৃত্যু ভয়ে স্বপ্নের মধ্যে চিৎকার করো ?

নিকুন্তিলা হিমহিম কণ্ঠে প্রশ্ন করে— তুমি তা-ই করতে ?

না। বরং আমি অদ্ভুত চোখে ওর দিকে তাকাই, ধুর ছাই শান্তনু, আমি কি ঘোড়ার ডিম মৃত্যুকে ডরাই ? এই যে আমার হাতের তালু দেখছ, মৃত্যুকে আমি মাঝে মাঝে এইখানটায় বসাই, জান শান্তনু, তখন আশ্চর্য একটা কাণ্ড ঘটে, আমার তালুটা হয়ে ওঠে একটা তেপান্তরের মাঠ। মৃত্যু তখন তার মধ্যে রাজপুত্রের মতো ঘোড়া ছোটায়... ঘোড়া ছোটায়...।

নিতু... নিতু... জুবায়েরই জীবনের শেষ কথা নয়। যে স্ত্রী-কে ফেলে অন্য দেশে গিয়ে

তালাকের নোটিশ পাঠায় তার জন্য মরতে বসে একমাত্র মূর্খ। নিতু, মৃত্যুটা যদি অর্থবহই না হলো, তোমার মৃত্যুতে যদি কারও কিছু না-ই এসে গেল— শোনো—।

আমি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠি, জীবনের ভার আমার প্রাণের ওপর বসেছে, আমি সেই ভার সহ্য করতে পারছি না বলেই সারাক্ষণ পালানোর স্বপ্ন দেখছি। আমার বাঁচা মরার স্বপ্নের মধ্যে কোনো স্বার্থ নেই শান্তনু... কিন্তু আমার প্রশ্ন একটাই, আমিতো এই জীবনে তোমাকে কিছু দেই নি, আমাকে বাঁচাতে তুমি তোমার ব্যবসা, কাজ সব ফেলে কেন এতো উঠে পড়ে লেগেছ ?

বুঝলি নিকু, ক্লিনিকে রোদ তখন কায়দা মতো ছিরিরিরি ঢুকে রুমে নানা বর্ণের আলো ছড়াতে শুরু করেছে। আমি রশ্মির মধ্যে যেন দেখতে পাই ধুলোর মধ্যে ঘোর খাচ্ছে লাল নীল গোল গোল প্রজাপতি...! নিকুন্তিলা অনুভব করে মা যেন নিজের জীবনের কোনো কাহিনী নয়, কোনো গ্রন্থ থেকে গল্প পাঠ করছে। এক শীতার্থ বোধ থেকে সে প্রশ্ন করে, শান্তনু মামা কী বলল ?

শান্তনু বলে— আমার কাছে তোমার মূল্য অপরিসীম নিতু, তুমি না বাঁচলে আমার পৃথিবীটাও শূন্য হয়ে যাবে!

হালকা রোদের আভা তেজ কোষে কোষে, আমার চোখের ভাষা ও বুঝতে পারছিল না। আমি ওকে বলি— কেন আমাকে বাঁচার লোভে ফেলতে চাও ? নেড়ি বিড়ালকে আর যা-ই করো শান্তনু, বিছানায় তোলো না। পরে বস্তায় ভরে নদীর ওপারে ফেলে এলেও ঠিক পথ চিনে চিনে নিঃশ্বাসের ওপর বসতে চাইবে!

শান্তনু প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে। নেড়ি বিড়ালই যদি হতে, জুবায়েরের প্রস্থানে মরতে চাইতে না। তুমি শিক্ষিত মেয়ে, তুমি ভালো করেই জানো একটা কিছু কাজ করে খেয়ে তুমি একলাই নিজ শক্তিতে দাঁড়াতে পারো—।

নিকু, কোনো মানুষই আরেকজন মানুষের বিকল্প হতে পারে না। আমি তোর বাবাকে বিয়ে না করে শান্তনুকে করতে পারতাম। কিন্তু শান্তনু হয়তো আমার জীবনের প্রথম মানুষ হওয়ার স্বপ্নই দেখেছিল, ফলে সে কারও বিকল্প হতে ভয় পেয়েছে। আর জুবায়েরের বিকল্প ? এই জীবনে কারও পক্ষে হওয়া সম্ভব ? পেইন্টার মনিরের সৌরজাগতিক এচিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে যে আমার হাতে চুমু খেয়ে অনেক দূর হাঁটার স্বপ্ন দেখেছিল, এক অক্ষম যন্ত্রণায় দুমড়ে কুরে মরলেও আমার সামনে এসে মেলে ধরতো দুটি শান্ত বিপন্ন চোখ, যার চোখে ক্রোধ ভর করলে তাকে কেমন দেখায়, সেই রূপ আমি ওকে হাজার ছোবল মেরেও দেখতে পারি নি, অহর্নিশি আমাকে হারানোর ভয়ে যার প্রাণের কোষে বিষ জমে মরতে শুরু করেছিল, সেই মানুষকে হারিয়ে এই যে এতদূর হেঁটে এসেছি... হাঁটতে পারছি, স্বামী

সন্তান নিয়ে দিব্যি সংসার করছি, আমি কি কম স্বার্থপর ?

আমি জানালার পর্দা উঠিয়ে দিলে এক আজলা আলো আমার সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দেয়। আমি বলি, শান্তনু, এই হাসপাতাল জুড়ে জীবন আর মৃত্যুর রক্ত যুদ্ধ। আর একটা ছোট্ট পর্দা তুলে দিলেই দেখছো, এক অসীম আকাশ একেবারে আঙুলের ডগায় চলে আসছে। আহা! কী অপূর্ব কুয়াশার ঘ্রাণ! যেন মেঘের ভাঁজ ভেঙে এক ভাঙাচোরা বৃদ্ধার অপূর্ব শৈশব নেমে আসছে। এরপর নিকু বোঝাতে পারবো না আমার কী হলো, আমি ভয়ার্ত চোখে দেয়ালের দিকে তাকাই... শান্তনু... শান্তনু দেখ, দেয়ালের জলে ভাসিয়ে দেয়া হচ্ছে গুটি বসন্ত আক্রান্ত পঞ্চাশ বছর আগের এক শিশুকে... কলার ভেলা... লালন! লালন! পড়শি যদি আমায় ছুঁতো। কলার ভেলার ওপর নিথর দেহ... শান্তনু—।

শান্তনু আমার হাত চেপে ধরে। তোমাকে বাঁচতে হবে নিতু। এরকম ভেঙে পড়লে চলবে না। আমি ওকে বলি, শান্তনু, তুমি আমাকে দূরে কোথাও নিয়ে যাবে ? দূ... রে ? ধরো একটা বিশাল নির্জন দ্বীপ! যেখানে বৃক্ষ, অনেক ফল পাখি... জানো, আমি স্বপ্নের পর স্বপ্ন দেখতাম, মুঠো মুঠো ঝিনুক কুড়িয়ে আমি জুবায়েরের হাতে তুলে দিচ্ছি। যখন নিঝুম রাত হলো, তখন জুবায়ের অর্ফিয়ুসের মতোন বাঁশি বাজাচ্ছে আর আমি...।

মাঝে মধ্যেই ডাক্তার আসেন, বলেন, বেশ তো সেরে উঠেছেন! নার্স ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে চলে যায়। শান্তনু বলে— যন্ত্রণা, ভয় সব ছাপিয়ে সূর্যের নিচে তোমাকে দাঁড়াতে হবে। ভয় ? আমি আঁধার চোখে তাকাই, ভয় তো আমার জীবনের ছায়া শান্তনু, অন্ধকার যদি আমাকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে, তুমি আমার দায়িত্ব নেবে ?

শান্তনু হাসে, জুবায়েরই যার সৌন্দর্য, প্রেম, রহস্যময়তার ভারে পালিয়ে গেছে, তার দায়িত্ব নেই, সেই সাহস আমার কই ? এছাড়া তুমি তো কোনো অসহায় জীব নও, যার দায়িত্ব নিয়ে আমি তাকে ছোট করে স্পর্ধা দেখাব ? এছাড়া... এছাড়া নিতু, আমার প্রায়ই মনে হয়, তুমি তোমার ছায়ার আড়ালে আজীবন 'তুমি' মানুষটাকে ঢেকে রাখো, যার জন্য জুবায়েরের কথা বাদই দিলাম, কেউ তোমাকে ছুঁতে পারে না। মানুষ মানুষের দায়িত্ব নিতে পারে, কোনো মানুষ কোনো ছায়ার দায়িত্ব নেয়, অত শক্তি তার কই ? মা ইজি চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার গায়ে চাদর জড়িয়ে দিয়ে নিকুন্তিলা হাঁটে। তার দুটো ডানার নিচেই ক্ষত! ওড়ার শক্তি নেই। বেলকনিতে দাঁড়াবে, ডাক— নিকু... নিকু উউ...।

মা ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। তাকে যেন কথা বলার নেশায় পেয়েছে। সে ধীরে স্বরে বলে, শরীরে বেশ খানিকটা শক্তি পাওয়ার পর একদিন কেবিন থেকে বেরিয়ে খুব ভোরে হাসপাতালের চত্বরের মধ্যে বসে থাকি। নিস্পৃহ চোখে দেখি, ছিন্নবিচ্ছিন্ন মানুষের কুঁকড়ে কুঁকড়ে হেঁটে যাওয়া। আমি মৃত চোখে চেয়ে থাকি, ধবল কুয়াশার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে শান্তনু প্রায় চমকে ওঠে ? তুমি ? এতো ভোরে ? এখানে ?

আমি যেন জয়ের আনন্দে হাসি— তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

শান্তনু অবাক— তুমি কী করে জানো, ঠিক এই সময়টায় আমি আসব ?

হাসি আমিও। আমি রোজ ঘড়ি দেখি, মা চলে যেতে থাকার মুহূর্তে তুমি ঠিক এই সময়টায়ই আমার কাছে আসো। আজ মনে হলো, এই পথটায় তোমার সাথে হাঁটি। প্রায় ভোরে কী সন্ধ্যায় এই পথটা যখন দেখি, তখনই বড়ো লোভ হয়, এই পথটা ধরে হেঁটে হেঁটে অনন্তলোকে চলে যাই। কাল ভোরে, জানো শান্তনু, তোমাকে এই পথ ধরে হেঁটে আসতে দেখে কী যে সুন্দর লাগছিল! মনে হচ্ছিল তুমি যেন জুবায়ের, তুমি রাজপুত্র! ঘোড়া ছুটিয়ে আসছ।

পলকা শিশিরে আমার খোলা কপাল ভিজি ভিজি। ধীরে ধীরে দইয়ের মধ্যে টক ছেড়ে দেয়ার মতোন কুয়াশা শাদায় ঢুকতে চাইছে রোদ্দুরের প্রথম ধাপ। আমার এই কথায় শান্তনু সন্দেহ চোখে তাকায়, তোমার সেই তালুর ওপরের তেপান্তর মাঠের মৃত্যুর মতো ?

আমি সব বিস্মৃত হয়ে প্রশ্ন করি— কোন তালু ? কোন অন্ধকার ? শান্তনুর সোয়েটারের ক্ষুদে ছিদ্র গলিয়ে শীত ঢুকছে, ফলে সে মিহি কাঁপছে— আমাকে সে বলে, তুমি যখন কথা বলো, তখন আসলে তা মিথ্যা কবিতার মতনই কিছু একটা। যখন তা রচনা করছ তখন তা সৃষ্টি, সেই সৃষ্টি যখন কেউ পরম মুগ্ধ যন্ত্রণায় বুকে তুলে নিচ্ছে, স্রষ্টা সেই সৃষ্টির কথা ভুলে অন্য সৃষ্টির খেলায় ডুবে গেল!

আমি ভ্রূ কুঁচকাই, শান্তনু, সেই ছেলেবেলার বন্ধু তুমি আমার, আমার সাথে এখন অব্দি সহজ করে কথা বলতে শিখলে না!

শান্তনু বলে— কঠিন করে কথা বলা তো আমি তোমার কাছ থেকেই শিখেছি। নিতু, জলের ধারে যাবে ? তুমিই সেদিন বলছিলে, রাত যখন গভীর হয়, আসমান জলের সাথে মিশে গভীর খেলার অজানা বোধে লিপ্ত হয়।

বুঝলি নিকু, আমি উদাস হয়ে উঠি, এটা জুবায়েরের কথা, ও বলত, ইচ্ছে হয় তোমাকে নিয়ে লং ড্রাইভে গান গাইতে গাইতে কোনো অরণ্য পেরিয়ে যাই! নিতু, স্বপ্ন পূরণের সাথেই যতো জাগতিক টাকার সম্পর্ক! তার চাইতে চলো, মধ্যরাতে জলের ধারে যাই। শান্তনু, সেই দৃশ্য দেখার সুযোগ আমার হয় নি। আমাকে ছেড়ে যখন জুবায়ের চলে গেল, সেদিন সন্ধ্যায় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে সিঁড়ি টপকে যখন আমি নিজের দেহটাকে, প্রাণটাকে ট্রাকের নিচে একটা কুণ্ডুলী পাকানো বল বানাতে চেয়েছিলাম, সেই মুহূর্তে দেখেছিলাম, আসমান আর মাটির মিলন! পৃথিবীর কোন প্রান্তে গেলে আমি জুবায়েরকে পাব ? শুধু একবার ওর পায়ের নখ ছুঁয়ে বলবো, আমি সন্তান চাই না, কিচ্ছু চাই না। তুমি সারাজীবন আমার কাছে থাকো... শান্তনু বলো, বলো কোথায় ওকে পাব ?

নিতু, তোমার হাতের তালু মেলে ধরো, শান্তনু কথা ঘোরায়।

হেই শান্তনু, তুমি হাতের রেখা দেখতে জানো বুঝি ?

নিতু সেই ক্ষুদে হাত থেকে তোমার এই বড় হয়ে উঠা হাত আমার দেখা। তোমার হাতের রেখা তো আমার কাছে কিছু শিশু পথ থেকে সরু সরু করে বড় হয়ে উঠতে থাকা বড়ো পথ মাত্র। তোমার রেখা দেখে তোমার জীবন সম্পর্কে বলি, অত শক্তি আমার কই ? তবুও

বড় লোভ হয় বলি, তোমার রেখায় আত্মহত্যা নেই, এই জীবনে মাথা উঁচু করে তুমি বাঁচবে... নিতু, স্বামী সন্তান ভাইবোন বাবা মা'র বাইরেও কিছু মানুষ থাকতে পারে, যারা কোনো প্রত্যাশা ছাড়াই কাউকে ভালোবাসতে পারে। আমরা সেই মানুষের দেখা সহসা পাই না বলেই তাকে বিশ্বাস করে উঠতে পারি না। বলতে বলতে শান্তনুর নিঃশ্বাস গভীর হতে থাকে! জীবন কি বিচিত্র নিকু, ওইরকম আশ্চর্য যন্ত্রণার মধ্যেও আমি শান্তনুকে খামচে ধরে প্রবল চেপে ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম। আমার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে সে বারান্দায় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এসে শান্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আর যা-ই করো নিতু, আমাকে গিনিপিগ বানিয়ো না! আমার চোখে লাল কালো অবদমন জল জমতে থাকে! রোদ্দুর বাড়ছে। বাইরে নার্সদের হাঁটাহাঁটি!

কেবিন থেকে মুক্তি পেয়েও আমার জীবনে সুস্থতার দেখা মিলল না! বুঝলি নিকু, মাঝে মধ্যে মনে হয়, এই যে জীবনের পর জীবন একজন মানুষের অপেক্ষায় আমি প্রহর গুণি, সে যদি সামনে এসে হাত বাড়ায়, আমি কি তার সাথে চলে যাব ? তখনই ভেতরে তোর বাবাকে কেন্দ্র করে আর্তনাদ উঠে। একজনের শূন্যতার মধ্যে নিজের উদারতা দিয়ে প্রেম দিয়ে কবে যে সে আমার হৃদপিণ্ডে বিশাল গাছ হয়ে উঠেছে!

হাঁটতে হাঁটতে মা পাশের ঘরে যায়। ফোন বেজে ওঠে।

চমকে ওঠে নিকুন্তিলা... পাশের ঘরে মা'র টেলিফোনকণ্ঠ— তুমি ? এতকাল পর ? তুমি ? মনে পড়ল আমার কথা ? জুবায়ের, কত রাত গেছে... কত রাত গেছে... যেদিন তোমার ডিভোর্সের চিঠি পেলাম! হায় কতকাল আগে... মনে হলো প্রাণে পিন ঢুকে গেছে... মনে হলো বেঁচে থেকেও আমি মৃতপ্রায়... মনে হচ্ছিল সামনে পা বাড়াতে যাচ্ছ তো রক্তস্রোত থেমে যাবে... প্রাণ বলবে থাম থাম— সামনে জুজুবুড়ি... আমার মাথাটা নিঃসাড় বেদনায় টলছিল... বরফ ঠাণ্ডা হাতে নিকুন্তিলা প্যারালাল সেট উঠায়— শান্তনু মামার গলা... এত বেশি কেন যে খাও, তুমি মরে যাবে নিতু...। নিকুন্তিলা কোথায় ?

ও অনেক বড় হয়েছে... মা কাঁদতে থাকে... তোমার কথা বলেছি ওকে। আমি বোধ করি ও তোমারও সন্তান... আমি আরো বেশি মদ খাব, আমি মরে গেলে কার কী আসে যায়... কে... ? হ্যান্ডসেট কানে নিয়ে মা ঘুমিয়ে পড়ে।

শান্তনু মামার ভয়ার্ত গলা— নিতু, তুমি কার সাথে কথা বলছো ? আমাকে চিনতে পারছো না ? আমি—।

মা-তো ঘুমিয়ে বেঁচেছে।

এখন নিকুন্তিলাকে কে বাঁচায় ?

মা'র অপচ্ছায়া বহুকাল পর নিকুন্তিলার ওপর ভর করে। প্রথম রাতের রক্তমাংস আহার

করে মধ্যরাত। সে শোনে যেন স্বপ্নে, যেন জেগে, যেন ঘুম ঘোরে, কে কোথায় ঘুমিয়ে আছো... জাগো... জাগো... আমার শত বছরের বৃক্ষটাকে দস্যুরা কেটে ফেলছে...ওর শরীর বেয়ে কষরক্ত গড়াচ্ছে... পাতারা কাঁদছে...ওকে তোমরা বাঁচাও। ছায়ার মতো, প্রেতাত্মার মতো অশরীরী নিকুন্তিলা হাঁটে।

নিকুন্তিলার প্রাণ দমে যায়। সে নিজের শবদেহটাকে টেনে পুনরায় লেপের তলার ডুব সাঁতারে গিয়ে পড়ে।

তন্দ্রাঘোর কানে শোনে সেই ডাক— বাঁচাও... বাঁচাও।

রাতের শীতকুকুর কাঁদতে থাকে। সে নিদ্রাহীন রাতে থলিত বীর্যের মতো শুকাতে থাকে... তখন অন্য দৃশ্য— মাকে বাবা বলছে, নিতু নিতু... আমিও চাই সন্তান, যে তোমার গর্ভে এসেছে। বাবা, বাবা গো... কবে আসবে তুমি ? আমি যে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছি! হায়! রাত পোহাতে আর কত দেরি ? আমি আর কত সেই বৃক্ষ আর পাতার কান্নার শব্দ শুনতে পাব ? আহারে কী দোষ করেছিল সেই বৃক্ষ... ওরা খুন করছে ? খুন! অজন্তার গলাকাটা শরীর... আকতার কাকার অন্ধকার হাত...।

দিন হয়। মা'র ঘুম ভাঙে না। দেয়ালে হেলান দিয়ে নিকুন্তিলা ঘড়ি দেখে। এক ফালি রোদ ঢুকছে জানালা দিয়ে। যেন রঙধনুর ভাঁজে ভাঁজে আতসবাজির খেলা। সেই লম্বাটে আলোর ভেতরকার ধুলোগুলো এমনই বহুবর্ণ!

নিকুন্তিলা ঠায় চেয়ে থাকে।

ফের ঘড়ির কাঁটা। দশটা দশ। এগারোটা বাজতে কত দেরি। তারপর ? এগারোটায় কী ? তবুওতো এগারোটা। আগে তো এগারোটা বাজুক... কিছু না করে দেয়ালে হেলান দিয়ে না হয় বারোটার কথা ভাবা যাবে। কবে ইস্কুল... পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল ? হাত-পাসহই নিকুন্তিলা কি পঙ্গু হয়ে গেল ? হায়! দিন এত দীর্ঘ কেন ? তার চেয়েও দীর্ঘ কেন রাত্রি ?

এই ঘরের দেয়ালে এখন টিকটিকি। বরং এদের পোকা ধরার খেলা দেখা যাক। অবসাদে চোখ বুজে আসে। রাতভর জানালা দিয়ে শহর দেখে... বিন্দু বিন্দু আলো... মনে পড়ে গেছে মহিশুরের বৃন্দাবনের কথা। ঠিক সাতটায় ধু ধু প্রান্তর ধরে জ্বলে ওঠে বাতি... হাজার হাজার... যেন হুজ্জত বয়ে যায় বাতির সাথে রঙিন ফোয়ারার খেলার। বাবার আঙুল ধরে স্তব্ধ চেয়েছিল নিকুন্তলা। আজ মনে হচ্ছে, তার জীবনে এমন সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেছে... এত গোপনতা নিয়ে সে বাবার কপালের ঘামে হাত রাখতে পারবে না। চোখ মেলে দেখে দশটা পনের।

বুক অব্দি লেপ। বাইরে শব্দ... কোন লেকে কার লাশ পাওয়া গেছে। মেয়েটি হাত পায়ে মোজা পরে আত্মহত্যা করেছে। বলাবলি করছিল যারা... অনন্তর পথে মিলিয়ে যায়।

এইবার লেপের নিচেও মৃত্যুশীত ঢুকতে থাকে। আমার কি আদৌ দুটো পা আছে ? নাকি কোনো শীত রাতে কুয়াশা-আঁধার ট্রেনের জান্তব চাকায় দুটো পা-ই কাটা পড়েছে ?

লেপের তলা থেকে থিতানো নিজেকে টেনে তুলে মেঝেতে নামে। তার ইচ্ছে হয়, ঘুমন্ত

মা'র বুক থেকে জ্যান্ত লাশটাকে বের করে মাকে এই পৃথিবীতে একবার অন্তত সুস্থভাবে নিঃশ্বাস নেয়ার সুযোগ দেয়। জুবায়ের... যেন দূর নক্ষত্র... কোন অচিন পথ ধরে আপনি এখন হাঁটছেন গো ?

আমি আপনার কন্যা গো কন্যা!

এইতো দুটো পা! এইতো সে শক্তি পাচ্ছে। এইতো ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে। এগারোটা বাইশ... তেইশে ঘুরতে এত সময় লাগে কেন ?

পুস্তক মেলে ধরে! অক্ষরগুলো কাঁকড়ার মতো। মাথার মধ্যে কুয়াশা জমে গেছে। সেই ছায়াচোখ সব অন্ধকার করে দেয়।

এত সব কঠিন বাস্তবতা জেনে কী করে বাঁচবে তুমি ?... এই বোধ নিকুন্তিলাকে ছাদে নিয়ে যায়। এই ছাদে গতরাতের পূর্ণিমার জলে আকুল হয়ে কেঁদেছিল দুজন নারী! জমে যাওয়া পা টেনে টেনে একদম কিনারে যায় সে... যোজন ব্যাপী রোদ আন্ধারের খেলা। নিকুন্তিলা ওম নিতে চায় কিন্তু কঠিন শীতে মৃত্যু দশা হয়। ভয়ে ভয়ে নিচে তাকায়।

মসৃণ সাপের মতো প্যাঁচানো পথ। শহরের কোলাহল তরঙ্গিত হয়ে ওদের নির্জন ফ্ল্যাটের ছাদে এসে মরে যেতে থাকে। বুকের ভেতরটা শিরশির করে। ভেতরটা অজানা রোমাঞ্চে কাঁপতে কাঁপতে বলে, এই বাস্তবতা মাথায় নিয়ে তুমি বাঁচতে পারবে না... ঝাঁপ দাও ঝাঁপ দাও!

আজকের পেপার দেখেছ নিকুন্তিলা ?

এই শব্দে তীব্র এক ঝাঁকুনি খেয়ে চেতনে ফিরে আসে সে। ঘেঁষা বিল্ডিংয়ের ছাদে তার ইস্কুলেরই এক ক্লাসমেট। লম্বা কালো ছেলে! নিকুন্তিলা নিষ্প্রভ চোখে তাকায়।

সে জিজ্ঞেস করে— তোমার শরীর খারাপ ?

না।

পেপার পড়েছ ?

কী আছে ওতে ?

আমাদের দুটো ফ্ল্যাট পরেই তিন ভাই এক সাথে খুন হয়েছে। নাগরিক জীবন কী দেখো, পাশের ফ্ল্যাটের ঘটনা পেপারে পড়তে হয়!

এ-তো হরহামেশাই ঘটছে— বিচিত্র কী ? সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসে। মা কি এখনো ঘুমুচ্ছে ? আজ নিশ্চিত মা'র হ্যাংওভার হবে। মা উঠে দুটো বিস্কিট খেয়ে স্লিপিং পিল খেয়ে আবার ঘুমুবে। টেবিলে নাস্তা ঠাণ্ডা হয়ে আছে। বুয়া জিজ্ঞেস করে— গরম করে দেব ?

লাগবে না।

কেষ্টদা জিজ্ঞেস করে— তোমার কী হয়েছে ?

কিচ্ছু না... বলে ডাইনিং স্পেসের দিকে এগোবে... অবচেতন পা লেপের নিচে চলে আসে।

এইভাবে দিন যায়।

এক দুপুরে মা গাড়ি করে নিকুন্তিলাকে এক জাঁকালো মার্কেটে নিয়ে যায়। অনেক শপিং করে মা। নিকুন্তিলা যখন কোনো শক্তি পাচ্ছে না— মা এক ময়ূররঙা শাড়ি কিনে ওর চোখের সামনে মেলে ধরে— তোকে গিফট করলাম!

আমি শাড়ি পরব ?

মাঝে মধ্যে, সখ করে। অনেক বড় হয়ে স্মৃতি করে একদিন রেখে দিবি। মা'র দেয়া প্রথম শাড়ি। কাঁপতে কাঁপতে সে মা'র সাথে বাড়ি আসে।

মা বিমর্ষ কণ্ঠে বলে— আমার জীবনের ভার দিয়ে তোর মাথাটা এই বয়সেই ভারী করে দিলাম।

মা, ওই ফ্রকটা কোথায় ?

মা'র মধ্যে যেন ধ্বস নামে। এইবার মা কাঁপতে থাকে। তোর নানুর বাড়িতে আমার একটা গোপন বাক্স আছে, দীর্ঘদিন ওর মধ্যেই।

মা, জামাটা তুমি আমাকে দেবে ?

দেব! দেব!

দুপুর পেরোনো ভাত মরতে থাকে। মা অনুবাদে ঢুকে যায়। নিকুন্তিলা ঠাণ্ডা ভাত আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করে। ভেতর থেকে ঠেলে বমি ওঠে। বাথরুমে নিজেকে উজাড় করে বমি ঢেলে নিকুন্তিলা টিভির চ্যানেল ঘোরায়। মাথা টলতে থাকে। এই পৃথিবীতে এত উচ্ছ্বাস... এত নাচ গান কেন ? ওই যে মেয়েটা পেয়ারা খেতে খেতে যাবতীয় মধুর হাসি ঢেলে দিচ্ছে পৃথিবীর সামনে, সে-ও কি বাসায় গিয়ে কাঁদে ? ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে সে টিভি বন্ধ করে দেয়।

ফোন আসে। আজ নিকুন্তিলা রিসিভ করে। বাবার গলা— পরশু আসছি সোনা... তোদের ছাড়া একদম ভাল লাগে না। তোর জন্য অনেক শপিং করেছি... তোর মাকে দে!

বুয়া এসে ঘর মুছতে থাকে। একটা তেলাপোকা উল্টে পড়ে, আছে মেঝের কিনারে, চোখে পড়ে না তার। এ নিয়ে কিছুক্ষণ পরই কেষ্টদা হৈচৈ বাঁধাবে ওর সাথে। নিকুন্তিলা প্রাণের মধ্যে হুড়কা এঁটে চুপ করে বসে থাকে। নিজের ওপর ক্রোধে তিন লাফ দিয়ে সে রান্নাঘরে যায়— কেষ্টদা আজ আমি রান্না করব, তুমি সরো।

সে কী নিকু দি, তুমি তো পারো না। হাত পুড়ে যাবে।

যাবে না।

আহ! জেদ করো না! মা শুনলে সাংঘাতিক রাগ করবে। তুমি বরং দু'কাপ কফি বানিয়ে মা'র সাথে বসে খাও।

শিথিল হয়ে আসে নিকুন্তিলা!

ঘরে এসে দিনের বেলাতে ফের লেপের তলায়। কবে মেট্রিকের রেজাল্ট দেবে ? আমার সময় যে আর কাটে না। কলজে খামচে ধরে লোহার আকশি। নিকুন্তিলা টেনে নিঃশ্বাস নিতে চায়। ঘরের মধ্যে স্তব্ধতার সাথে স্তব্ধতার তর্কযুদ্ধ।

মৃত্যুর পরে কী ? নিঃসীম আঁধার এক। নিকুন্তিলাকে টানতে থাকে। ঠিক আছে মৃত্যু নয়, আজ মৃত্যুর রিহার্সেল হোক... এই করে করে আরো কিছু মুহূর্ত যাবে। বিছানার লেপ সরিয়ে তার ওপর চেয়ারটাকে পেতে ওড়না জড়ায় সিলিং ফ্যানে। গলা অব্দি ওড়নাটার গেরো বিন্যস্ত করতে গিয়ে হিমসিম নিকুন্তিলা ভাবে, অতি সাধারণ মানুষেরাও কী করে কায়দা করে গেরোর শিক্ষা জেনে ফ্যানে ঝোলে ?

চেয়ার সরিয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবে— আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে ওই দুঃখী জুবায়ের মানুষটা কোনো অচিন দেশে কবেই মরে গেছে ?

নিকুন্তিলাকে এইবার মৃত্যুবোধ পেয়ে বসে। সে হাঁপাতে থাকে। শকুন চোখ তাক করে চেয়ে থাকে সিলিং ফ্যানটার দিকে। মনে হয়, বেঁচে থাকার এই জটিল চক্র থেকে মুক্তির এটাই সহজ পথ। যখন আঁধার... যখন কুয়াশা... ওর পায়ের নিচটা টলছে... অনন্ত... অনন্তব্যাপী বালুস্রোত... নিকুন্তিলাকে ডাকছে মহাজাগতিক কোনো সুর... এসো এসো... এখানে বাঁচার ক্লান্তি নেই... বিভক্তির দ্বিধা নেই... মুখোশ নেই... যে মুখোশ পরে মা আস্ত জীবনটা বুকে তপ্ত আগুন নিয়ে কাটিয়ে দিল!

ঠায় বসে থাকে। রক্তস্রোতে পিঁপড়ের সারি... বাবা ওর জন্ম চায় নি... অথচ আজ ও বাবার পুরো হৃৎপিণ্ডের এক বিশাল অংশ।

তোমার কী নেই ? নিজেকে প্রশ্ন করে... সব আছে আমার... মানুষের যা যা দরকার... আজ সে মরে গেলে ওর দুটি অসহায় বাবা-মার পৃথিবীতে দোযখ নেমে আসবে। আজ টের পায়, তার সব চাহিদা মরে যাচ্ছে, পৃথিবী জয় করে যে মানুষ... তারও কিছু অভাব থাকে... শ্লেষ স্বরে হাসে নিকুন্তিলা... তবে কি তোমার দুঃখ বিলাস ? আমাকে আজকে আর কেউ বুঝছো না... যে মানুষ নিজের মৃত্যুদশার জন্য কাউকে দায়ী করতে পারছে না... তার অসহায়ত্ব বোঝে কার সাধ্য ? বাবা... মা... জুবায়ের... সবাই এক অসহ্য সময়ের শিকার!

নিকুন্তিলা আয়নার সামনে দাঁড়ায়। টিপ হাতে নিয়ে টের পায় আঙুল কাঁপছে। মা উঠে আসছে।

নিজেকে বিন্যস্ত করে তার সামনে বসে নিকুন্তিলা।

তুই এক রাতেই এমন বদলে গেলি ? মা'র চোখ ভিজে উঠতে চায়... সব কিছুর জন্য আমিই দায়ী... আমাকে আঘাত কর!

আর কত আঘাত সহ্য করবে তুমি ?

তোর কি মনে হচ্ছে, তোর বাবাকে আমি ঠকিয়েছি ?

না! তুমি নিজে ঠকেছ। ভেতরে বিষের বালি রেখে মুখ বুজে মুক্তো ফলিয়ে আমাকে, বাবাকে সুখী রেখেছ!

মা যেন ভরসা পায়! বলে, এত সন্তানের জন্য আকুতি আমার, তোর জন্মের পর যত মমতায় তোর বাবা তোকে বুকে তুলে নিয়েছিল... আমি পারি নি। আমি খুনির মতো তোর দিকে তাকাতাম। আমার মনে হতো, তোর মতো একটা সন্তানের জন্য ওই রকম দেবতার মতো মানুষটাকে হারিয়েছি আমি! তোর মনে আছে নিকু, তোর বুঝে ওঠার বয়সেও আমি ঠিক তোকে বুক পেতে জড়িয়ে ধরতে পারতাম না। তোর একবার জ্বর হলো... তুই একা নিঃসঙ্গ পড়ে থাকলি আমার অবহেলায়... তোর ডাইরি পড়ে যেন আমার হাজার বছরের হুঁশ ফিরে এল। তুই সেখানে আমার তাচ্ছিল্যে আত্মহত্যা ভাবনার কথা লিখেছিলি! আমার মনে হলো, এ-কী সর্বনাশ করছি আমি! একজন সন্তানের কারণে আমি আমার প্রেমকে হারিয়েছি, এখন সেই প্রেমের কারণে সন্তানকে হারাব ? নিকু জীবনটা বড় অদ্ভুত... সেই লোকটাকে জ্যান্ত কবর দিয়েছি বলে তোর বাবাকে কিন্তু কম ভালোবাসি নি আমি। মানুষের মনে অনেক প্রকোষ্ঠ। একেকটা প্রকোষ্ঠ একেকজন তার নিজের মমতা দিয়ে প্রেম দিয়ে কখন যে দখল করে ফেলে। তুই কি ভাবছিস শুধু ভান দিয়ে একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষ সারাজীবন সুখের দাম্পত্য তৈরি করতে পারে ? অসম্ভব!

কলিং বেলের শব্দ।

মা ড্রয়িংরুমের দরজা খুলে খুলনা থেকে আসা ছোটফুপুকে দেখে জড়িয়ে ধরে মহা আড্ডায় মেতে ওঠে।

মা পারেও!

রাতে সবাই যে যার রুমে ঘুমে। নিকুন্তিলার ঘুম হয় না! মধ্যরাতে ব্যাঙের চিঁচিঁ... এই বহুতল ফ্ল্যাটে ব্যাঙ আসবে কোত্থেকে ? মনে হচ্ছে কোনো সাপ ব্যাঙের টুটি চেপে ধরেছে! আধো ঘুমে কানে বালিশ চেপে ধরে। মা'র মতো তার মাথাটাও খারাপ হয়ে যাচ্ছে নাকি ? যদি কোনো ছিদ্র গলিয়ে সাপ এসে এই রুমে ঢোকে ? ভয়! তাহলে এখনো কোনো কোনো কোষ বাঁচার স্বপ্ন দেখছে! নইলে ভয় হবে কেন ? রাত্রির আঁধার ভেঙে যখন নিকুন্তিলা দেয়ালে গিয়ে ঠেকেছে, তখনই হয় কাণ্ডটা! নিকুন্তিলা তখন ঘুমের অতলে তলিয়ে গিয়েছে। তীব্র উষ্ণতায় সয়লাব হয়ে আছে লেপের তলার ওম! নিকুন্তিলা স্বপ্নে দেখে, আলোর ফেরেশতারা বারান্দায় এসে নামছে... নিকুন্তিলার যেন দুটি ডানা হয়ে গেল... সেই ডানার পালক ধরে নাচতে নাচতে তারা বলছে, এসো জীবনের গান গাই!

একটা কঠিন লম্বাটে শীতসাপ তখন যেন লেপের নিচের উড়ন্ত পা প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে ওপর দিকে উঠে আসে। এক সময় সেটা নিজেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিকুন্তিলার টুঁটির কাছে চলে

আসে। নিকুন্তিলা অস্ফুট চিৎকার করে জেগে ওঠে। মধ্যরাতে ফোন বাজতে থাকে। মা সেই ঠিক পুরনো আকুলতা ধরে লাফ দিয়ে ফোনটা ধরে। ওপাশে কথা নেই। ফোন ধরে আছে। মরিয়া মা ধরেই নেয়, এ জুবায়েরের ফোন... প্রায় ক্রন্দনরত গলায় মা বলে... দোহাই কথা বলুন! লাইন কেটে যায়। মা হতাশ বিছানায় ঢলে পড়ে।

মা কি আমৃত্যু এই ফোনের অপেক্ষা করবে ?

নিকুন্তিলার নিঃশ্বাস আটকে আসে। এতদিন বাবা এক জীবন্ত মৃতের সাথে বাস করেছে! প্রচণ্ড অভিশঙ্কায় নিকুন্তিলা ভাবে, যে মানুষের স্বপ্ন আরেক মানুষ নিয়ে চলে যায়, তার পাশে পরবর্তী মানুষের বাস মানে... সেই নারী একটা মুখোশ পরে সুখ সুখ ভাবের কঠিন অভিনয় করেছে। মা'র হয়তো ভয় ছিল, এই অভিনয়ে মা যদি পেরে না ওঠে তাহলে ঐ লোকের মতো বাবাও তাকে ফেলে চলে যাবে।

প্রকোষ্ঠ! মা তো তাকে অন্তত মিথ্যে বলে না। নিকুন্তিলা ভাবে, তাহলে এই মুহূর্তে যা সে ভেবেছে তা তার ভুল ?

আবার ফোনের একটা রিং বাজতেই নিকুন্তিলা ধরে!

বিজন বলে— ঘুম আসছে না! বিরক্ত করলাম ?

এতরাতে তোমার ফোন করা ঠিক হয় নি।

সরি... বিন্দুর সাথে প্রায়ই আমার কথা হয়! ইসকুল নেই, দেখা হয় না। তুমি অনেক বদলে গেছ! ফোনে কথা বলতেই চাও না!

রিসিভার খসে পড়ে!

জানালা দিয়ে নিকুন্তিলা দূর পথে তাকায়। কোথায় সেই বৃক্ষ ? যেখানে গাছ বেয়ে কষ রক্ত ঝরছে ? পাতারা কাঁদছে ?

আজ রাতে আমি কোন পোশাকটা পরেছি ? নিকুন্তিলা মনে করতে পারে না। বিছানার মধ্যে চরকির মতোন পাক খেয়ে খেয়ে যখন ঝিমিয়ে পড়েছে...পায়ের মধ্যে ক্রমশ তেমনই সাপের প্যাঁচ। সে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে উদ্‌ভ্রান্তের মতোন জানালার গ্লাস, দরজার নিচের ফোঁকড় সব টান দিয়ে, কাপড় গুঁজে বন্ধ করে দিতে থাকে।

বাতি জ্বালিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘড়ি দেখে... একটা দশ।

কী করে মানুষ উজ্জ্বল হয় ? সুখী হয় ? হাসে ?

নিজেকে নিকুন্তিলার আশি বছরের বৃদ্ধা মনে হয়। কলজের মধ্যে স্তূপ স্তূপ বরফ বাস করছে সারাক্ষণ। চামড়ার কোষের তলায় তলায় ব্যথা!

কোথায় বাজেরে মৃত্যু বাঁশরী ?

চোখ বুজতেই ব্যাঙের চিঁচিঁ... দস্যু সাপটা ঠিক তার টুটি চেপে খাবে। শরীরে লেপ চেপে নিকুন্তিলা কাঁপতে থাকে... ভাবে, মা'র ঘরে যায়। আজকাল মা এলকোহল খায় না। সারারাত নিজের সাথে যুদ্ধ করে ভোরে অনেক কষ্টে ঘুমায়। তাকে জাগানো ঠিক হবে না। নিকুন্তিলা ভাবে, খুব ভোরে ঘাস কুয়াশার পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে সূর্যোদয় দেখবে। ঘড়ি

দেখে— দুটো তিরিশ।

চেয়ে থাকে। ঘড়ির কাটা যেন ঘোরে না! দেয়ালে আলো ছায়া ঘাঘরার চকমকি। নিকুন্তিলা ক্রমশ ঘুমে নেতিয়ে পড়ে!

কিন্তু এ-কী! সত্যিই সাপ! বারান্দার আধো আলোয় হঠাৎ দেখে গ্রিল পেঁচিয়ে ওর দিকে মুখ বাড়িয়েছে! নিকুন্তিলার রক্ত হিম হয়ে যায়! নড়লেই ছোবলের কোপ। ওর চোখের পাপড়ির কম্পনও বন্ধ হয়ে যায়। ভেতর থেকে বিস্ফারিত চিৎকার ওঠে! শব্দহীন!

এইতো জীবনের মোক্ষম জায়গায় এসে দাঁড়ানো গেছে... ওইতো সর্পরাজের চোখের মৃত্যুপুঁতি ওর দিকে তাক করে আছে। নিকুন্তিলার কলজের মধ্যে চাপাতি দিয়ে কোপাতে থাকে কেউ। সাপের কালো ক্লেদাক্ত পিচ্ছিল পেঁচানো শরীরের ভাঁজে ভাঁজে নিকুন্তিলার বাঁচার আকাঙ্ক্ষা।

গলায় দম আটকে নিজেকে পাথর বানিয়ে রাখে।

খাঁখাঁ বাতাসের মতো মাঝে মধ্যে লকলকে জিভ বাড়াচ্ছে। একদম নিকুন্তিলার প্রাণপুঞ্জের কাছে, ওর শরীর ফুঁড়ে শুঁড়ি শুঁড়ি কী সব বেরোচ্ছে। নিকুন্তিলার থামের মতোন হয়ে ওঠা প্রকাণ্ড দু'পা বাঁচার নেশায় ওকে অবচেতনে পেছন দিকে ঠেলছে।

কলিং বেলের শব্দ।

চিৎকার করে ঘুম ভাঙা নিকুন্তিলা দেখে প্রভাতের আলো জানালায়। হিম শরীর নিয়ে ছুটতে ছুটতে সে দরজা খুলে দেয়।

সম্মুখে বাবার চিৎকার— কেমন সারপ্রাইজ দিলাম!

নিকুন্তিলা ছোট খুকির মতো বাবার বুকে আছড়ে পড়ে ডুকরে কাঁদতে থাকে।

নিকু! নিকু! কী হয়েছে! বাবা মহা উদ্‌গ্রীব!

আমাকে সারাজীবন ধরে রাখবে বলো! বলো বাবা, আর কোনোদিন কোথাও যাবে না!

যাব না! যাব না! যাব না!

বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়

বিয়ে হয়ে যায় নিকুন্তিলার।

এক রাতে আকাশে উঠেছে যখন মহর্ষি চন্দ্র... তাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে নক্ষত্রমণ্ডলী, এক রাতে নিকুন্তিলার চিরচেনা ছাদে অচেনা বাতাসের গুমরানি, একজন সজ্জিতা নারী তার মাকে হাতছানি দিয়ে সেই ছাদে যায়, মা, আমি তোমার কোলে একটু শুয়ে যাই!

অবশ হাঁটুর ভাঁজে আত্মজার বহুবর্ণ মুখটাকে চেনা যায় না। মেয়েটা কি আজকেও শব্দ করে

কাঁদবে না ? যখন ন্যাংটো জন্ম নিয়েছিল নিকুন্তিলা, অন্য মা'দের মতো ওর অবয়বের ভাঁজ তরঙ্গ মা'র দেখা হয়ে ওঠে নি। আজ মনে হয় মেয়েকে বলে, এত জরির তলায় তোকে চিনতে পারছি না। তার চাইতে শিশু আদিম হয়ে এই পূর্ণিমার নিচে শো, আমি দেখি, আমাকে লুকিয়ে কবে এতটা বড় হলি তুই। আমি দেখি, এই বিশাল পৃথিবীতে তোর অমূল্য মা-টাকে রেখে, তার নাড়ি কেটে এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার শক্তি তোর কবে অর্জিত হয়েছে! তোর নিজের বাবার কেনা ফ্ল্যাটে, যা কি না তোরই... চব্বিশটি বছর যেখানে তোর কত কত হাসি নিঃশ্বাসের গুমরানি, সেই থেকে তোকে টেনে নিয়ে যায় অন্য এক জগতে, কত পাশবিক, সেই নিষ্ঠুর, মায়াবী জান্তব বাস্তবতা।

নিকুন্তিলা চলে যায়।

চিৎকার নয়, ছেলেবেলার মতো ভেতর চাপা গুমরানো কান্নার উচ্ছ্বাস নিয়ে। এত শব্দ চারদিকে... সমস্ত আয়োজনের মধ্যে বসে নিঃশ্বাস আটকে আসতে থাকে তার। তার সমস্ত অস্তিত্বে কোনো তরঙ্গ না, কোনো রোমাঞ্চ না... শাদা চোখে সে দেখে একটি কুয়াশাময় নিস্তব্ধ পোড়ো বাড়ি, যেখান থেকে বেরোনোর সময় বাবাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এ-তো নিষ্ঠুর যন্ত্রণাকর সানাইয়ের শব্দ! তার মধ্যে শুধু মানুষের হুল্লোড়। নিস্তব্ধ পায়ে হেঁটে তার আজীবনের কক্ষে গিয়ে সে বিমূঢ়, ওর ঝাঁকঝাঁক পুতুলের মাঝখানে মুখ লুকিয়ে জীবনের প্রথম বাবা শব্দ করে কাঁদছে।

ফুলশয্যা নয়, মাথার ওপর ঝাঁক ঝাঁক পুষ্পবেশ্যা। যার শরীর নষ্ট করে দিয়ে যায় হাজারো ভ্রমর।

রেজওয়ান বলে— নিজেকে আমার সাংঘাতিক অপরাধী লাগছে। আমি তো তোমার সব জানি নিকু, আমি তোমাকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলাম!

এরপর রেজওয়ানের অপার্থিব স্পর্শ! একটা করে কানের দুল খোলে... একটা চুমু... অনেক কথা... গলার হার নিজের হাতে খোলে ভরন্ত কণ্ঠ থেকে... চুমু... কথা। ঠিক এই নান্দনিক অনুভূতি জীবনের প্রথম নিকুন্তিলার। নেশা লাগে। সবচাইতে অপার্থিব ওর সবগুলো ক্লিপ খুলে চুলগুলো এলোমেলো... ঝড়ো করে দেয়া.. নিকুন্তিলা বুঁদ হয়ে যায় শেষ আনন্দের গভীর অতলে। সেই রাতেই খটকা, হেই নিকু, কী নামে ডাকি তোমাকে— নীলাম্বরী ? এই মেয়ে! এই শব্দের অর্থ কী গো ?

নিকুন্তিলা মা'র মতো ইংরেজি সাহিত্যে ভর্তি হয়েছিল! রেজওয়ান তার দু'ক্লাস ওপরে পড়ত। ভার্সিটিতেই পরিচয়, বন্ধুত্ব! ক্লাস শেষে রেজওয়ান প্রায়ই বাসায় এসে ওকে নোট করে দিত, পড়াত। নিকুন্তিলা জানে, পাশ করার পর রেজওয়ান ভার্সিটিতেই লেকচারার হবে। সেভাবেই সে এগোচ্ছে। ক্লাস শেষে এই মানুষটা যখন তার সাথে হাঁটত, পৃথিবীর সাহিত্য নয়, বেশির ভাগ কথা বলত বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে। তারাশঙ্কর, বিভূতি, মানিক, জীবনানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুধীন দত্ত। বলত রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও আমাদের বাংলা সাহিত্যের অনেকে যোগ্য ছিলেন, আছেন; যাদের নোবেল পাওয়ার যোগ্যতা ছিল, আছে। তুমি

নোবেল বিজয়ী সব লেখকের লেখা পড়লেই ভালো কমপেয়ার করতে পারবে, অনেক দুর্বল লেখকও নোবেল পেয়েছেন, যার চাইতে আমাদের অমিয়ভূষণও অনেক শক্তিমান!

ওকে যখন নোট তৈরি করে দিত, পড়াত, তখন মানুষটি ওই একটি বিষয়েই কেন্দ্রিভূত! কখনো নিকুন্তিলার সাথে চটুল ইয়ার্কি বা অন্য গল্প করত না।

পড়া শেষ হলে চলে যেত মা'র কাছে। নিকুন্তিলার চাইতে ওর মা'র কাছে গিয়েই রেজওয়ান অন্য মানুষ। পৃথিবীর এমন কোনো বিষয় নেই, যা সে মা'র সাথে শেয়ার করত না।

ওর বাবা-মা মফস্বলে থাকে। মেসে থেকে পড়েছে রেজওয়ান। নিকুন্তিলা ওর ব্যবহারে স্তম্ভিত হয়ে যেত। ভার্সিটির আড্ডায়, কেন্টিনে নিকুন্তিলা যেন তারই মতন কোনো ভালো পড়াশোনার ছেলেবন্ধু, যেন তারই বয়সী, এরকম একটা বোধ নিয়ে বেশির ভাগ সময়ই রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা, ক্রিকেট খেলার ভবিষ্যৎ, ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতে কোন শিল্পীর সুর কেমন ঢেউ খেলে যায়, সাহিত্য... ইতিহাসের বিষয় নিয়ে কথা বলত।

মা'র সাথে কথা বলার সময় তার অনুভবের দরজা খুলে যায়, শৈশবে অর্থকষ্টে বেড়ে ওঠা, জীবনকে বহুমাত্রিকভাবে অনুভব করা, তার একাকীত্ব, নৈঃসঙ্গ... এইসব বলে বলে নরনারীর প্রেম, শরীর— নানা বিষয়ে কথা আবর্তিত হতে থাকত।

প্রায়ই নিকুন্তিলা নিঃশব্দে এসে বসে সেই আড্ডায় যোগ দিত। মানুষের চারিত্রিক অধঃপতন নিয়ে একদিন তুমুল তর্ক। সেদিন বিকেলে চায়ের আড্ডায় প্রসঙ্গটা ওঠে। রেজওয়ান বলে, একদম টকটকে চায়ে চুমুক দিয়ে, তার বেড়ে ওঠার সময়টায় তার এক বন্ধু তাকে আর্থিক, মানসিক অনেক রকম সাহায্য করেছিল। দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্নতার পর যখন তার সাথে দেখা তখন অনেক ধনী সে। এই বন্ধুটি নিজে তার ঘরের ক্যাসেট রেকর্ডার বিক্রি করে তাকে মেট্রিকের সময় ফরম ফিলাপের টাকা না দিলে তার পক্ষে সেবার পরীক্ষাই দেয়া সম্ভব হতো না।

নিকুন্তিলা আলগোছে বিস্কুটে কামড় বসায়। ছায়াচ্ছন্ন ড্রয়িংরুম, সোফা, দামি কার্পেট... প্রচুর ডেকোরেশন পিসের মাঝখানে একটাই ছবি। সমুদ্রের পাশে দাঁড়িয়ে কিশোরী নিকুন্তিলা হাসছে! মা স্থির চেয়ে আছে রেজওয়ানের মুখের দিকে।

রেজওয়ানের শ্যামলা মুখটায় অনেক মায়া। সে কিছুক্ষণ থেমে অদ্ভুত গলায় বলে, এখন শুনি সে মেয়েদের দালালি করছে। খালামণি, ওর সমস্ত সৌন্দর্য, উদারতা মুহূর্তে আমার কাছে ম্লান হয়ে গেল। বন্ধুত্বের জায়গাটায় ও তেমনই আন্তরিক, আমাকে দেখে বুকে জড়িয়ে ধরল, বলল, শুনছি টিউশনি করে পড়ে পড়ে তুই ক্লাসে সাংঘাতিক রেজাল্ট করছিস...বলছিল আরো টাকা লাগলে নিয়ে যা, আমার কোনো টাকার সমস্যা নেই। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল ও নয়, একটা ঠাণ্ডা সাপ আমার শরীর পেঁচিয়ে আছে...।

মা বলে, তোমাকে এই অব্দি যা সে দিয়েছে, শোধ করেছ?

করি নি, তবে আমার সেই সময় এলে ঠিকই আমি তাকে তা ফেরত দিয়ে দেব।

মা নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিয়েছে।

নিকুন্তিলার বিলোড়িত রক্তে ফিসফিস তরঙ্গ, সে জানে, এইবার মা কোন পথে এগোবে! আহা! রেজওয়ান যদি একটু জব্দ হতো।

মা বলে, তা না হয় তুমি টাকা উপার্জন করলে, তার ঋণ শোধ করলে। কিন্তু ওই যে ক্যাসেট রেকর্ডার বিক্রি করে যে মানুষ তোমাকে ফরম ফিলাপের টাকা দিয়েছিল, ওই রকম অনুভূতি ছিল যার তোমার প্রতি, তারপর তোমার জীবনের নানা পর্যায়ে সে সাহায্য করেছিল মানসিকভাবে, সেই অনুভূতির ঋণ তুমি কী করে শোধ করবে?

ঘরে অপার স্তব্ধতা নেমে আসে, এইবার কাপে নিকুন্তিলার চুমুক। ঘরের তরঙ্গে তরঙ্গে বর্ষণমুখর হাওয়ার প্রবহমনতা। জানালা দিয়ে আসা এক চিলতে আলো রেজওয়ানের চশমার ডান গ্লাসে। সে অসহিষ্ণু হয়ে বলে, তাই বলে মেয়ে দালালির মতো নিকৃষ্ট কাজে নেমেছে যে লোকটা, অনুভবের ঋণ শোধ করতে পারব না বলে তাকে আমি ক্ষমা করে দেব?

তোমাকে একটা ঘটনা বলি— মা এইবার আয়েশ করে সোফায় বসে, শান্তনুকে তো তুমি চেনো। সেই শান্তনুকে একদিন আমি প্রচুর এলকোহল খেয়ে 'বেশ্যার কাস্টমার' বলে গালি দিয়েছিলাম দু'জনের ঝগড়ার একটা চূড়ান্ত মুহূর্তে, সে আমার গলা চেপে ধরেছিল। হতবাক নিকুন্তিলা এই দৃশ্য দেখে ঘৃণায় বিমূঢ়! সে আমাকে উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, এই লোকটা জীবনে যেন এই বাড়িতে না আসে। কিছুক্ষণ পর সুস্থির হয়ে আমিই সহজ কণ্ঠে শান্তনুকে ফোন করে বাসায় আসার আমন্ত্রণ জানালে... নিকু তখন তোর কত বয়স? বলে মা থেমে বলে, ও তখন ক্লাস সিক্সে পড়ে। সে প্রায় অ্যাবনরমাল হয়ে যায়, বলে আমার বাবা কোনোদিন তোমার গায়ে হাত তোলে নি...তুমি!

আমি ওকে শান্ত করে বলি, তোর বাবা গায়ে হাত তোলে নি বলে এতদিন জীবনে কোনো অবিচারই করে নি? আমি তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছি তখন? তোর নানু আমাকে মেরেছে, হয়তো কম যাই ও বাড়িতে, তা-ই বলে আমার মা'কে আমি অস্বীকার করেছি? ভাই-বোন বাবা-মা কোনো দোষ করলে তাদের সাথে চলা যাবে আর আমার যে বন্ধু বলা যায় আমার গোটা জীবনটাই গড়ে দিয়েছে, তার এক মুহূর্তের ক্রোধে তাকে আমি কেন অস্বীকার করব? আমি তারপর নিকুকে বুঝিয়েছি, ওর খারাপ অংশটুকুকে না হয় আমি ঘৃণা করলাম, ভালো অংশটাকে ভালোবাসব না?

নিকুন্তিলার চোখ বিদ্ধ করে আছে রেজওয়ানের মুখ... অপরাহ্নের আলো তো নয়, যেন উড্ডীয়মান মেঘপুঞ্জ... আহা! চারদিকে ঝাপিয়ে বৃষ্টি হতো?

রেজওয়ান শান্ত— এটা যুক্তি হিসেবে ভালো। কিন্তু খালামণি, আপনি কি এটা বিশ্বাস করেন না কারও কোনো নিকৃষ্ট কাজ উৎকৃষ্ট কাজগুলোকে অন্ধকার করে দিতে পারে? মানুষ কি কোনো দ্রব্য? কেটে কেটে ভালো আর খারাপ অংশগুলোকে আলাদা করে সেখান থেকে শুধু ভালোগুলোই নেব?

চমৎকার বলেছ। কিন্তু তুমি শুধু ভালোটাই নিতে চাইবে কেন? আমাদের দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে অনেক নিকৃষ্ট অনেক উৎকৃষ্ট ঘটনা ঘটতে পারে, এক সাথে চলতে গেলে সেটাই স্বাভাবিক। তাই বলে দু'দিন পরপর মানুষের দাম্পত্য জীবন ভাঙবে?

রেজওয়ানের দু'চুমুকের পর চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। টের পেয়ে মা বলে, আরেক কাপ দিতে বলি?

না খালামণি লাগবে না। আপনি বুঝতে পারছেন না কেন দুটো বিষয় এক নয়। ও যদি হঠাৎ কোনো খারাপ কাজ করত, আমি আমার বন্ধুর কথা বলছি... ধরুন ধর্ষণ করল কাউকে, আমি তাকে হয়তো তার একসময়ের বিচ্যুতি হিসেবে মেনে নিতাম। অলরেডি সে একটা নিকৃষ্ট কাজের মধ্যে স্থায়ীভাবে বাস করছে। আমি সেই অন্ধকারটাকে কীভাবে নিই ?

মা বলে— আমি তোমাকে বলছি না ওর সাথে তুমি চল, ওর সাহায্য নাও। কিন্তু তোমার এই পর্যন্ত আসার পেছনে যে ছিল তোমার মহান প্রেরণা, তার মুখটাকে স্মরণ করে তুমি যখনই ঘৃণায় যন্ত্রণা পাবে, তখন তার অতীতটাকে স্মরণ করে সেই যন্ত্রণা বুকের মধ্যে কমিয়ে এনো।

নিকুন্তিলা যখন থার্ড ইয়ারে তখন রেজওয়ান ফাইনাল ইয়ারে, সেই বছরের শুরুতেই ওদের পরিচয়। এক বছরে এই ফ্যামিলির অনেক নিকটে চলে এসেছে রেজওয়ান। সন্ধ্যায় একদিন যখন নিকুন্তিলাকে পড়া বুঝিয়ে রেজওয়ান ড্রয়িংরুমে... বাবা টিভির চ্যানেল টিপছে আর হুইস্কি খাচ্ছে।

হাই ইয়াং বয়... বাবা ওকে পিঠে আদর করে কাছে বসায়, খাবে নাকি এক পেগ ?

সলজ্জ রেজওয়ান হাসে— ধন্যবাদ। চাচা আসলে এসব আমি খাই না।

রক্ষণশীলতা ?

চাচা এটা তো কোনো আধুনিক বা অনাধুনিক বিষয় নয় যে রক্ষণশীলতার প্রশ্ন উঠবে। আসলে এটার টেস্টের প্রতি আমার তেমন আগ্রহ নেই। আমি প্রচুর সিগ্রেট খাই। সেটা স্বাস্থ্যের জন্য আরো বেশি ক্ষতিকর। অ্যালকোহলের চাইতে বেশি ক্ষতিকর। কিন্তু জেনেও ছাড়তে পারি না!

এরপর বাবার সাথে রেজওয়ান ঢুকে যায়, খেলা আর রাজনীতি সম্পর্কিত আড্ডায়!

এইরকম যখন দিন যাচ্ছে... নিজের জীবনের প্রায় সব অধ্যায়ই নিকুন্তিলা এই প্রথম কারো সাথে শেয়ার করছে... নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছে রেজওয়ান। ভার্সিটিতে জয়েন করে সে বাবার জন্য একটা ব্ল্যাক লেবেল নিয়ে আসে। বাবা তো মহা অভিভূত!

সেই রাতে অনেক রাত অব্দি এই বাড়িতে ওদের আড্ডা হয়!

রাতে ঘুমুতে গেলে নিকুন্তিলার এই এক দোষ, পারম্পর্যহীনভাবে কিছু দৃশ্য ভেতরে ঢুকে যায়, মা বলছিল, বিয়ের রাতে আমার বুকের ভাঁজে রাখা একটা চাবির রিং জুবায়েরের সামনে ঝুলাতে থাকি, ওর মধ্যে ছিল একটা চামড়ার বহুবর্ণ নারী মুখ। আমার দুই বুকের মাঝখানের সুঘ্রাণে রিংটি বিমোহিত। জুবায়ের সেটাকে চুমু খেতে গিয়ে ওর গন্ধে বাধিয়ে ওঠে— ওর যেন মাথা ঝিমঝিম করে, এরপর আমার ব্যান্ডেজ পা—।

নিকুন্তিলার ভয়, যন্ত্রণা, মনে পড়ে একদিন মা বলেছিল, জুবায়ের চলে যাওয়ার পর জীবনের সেই চরম মুহূর্তে— আমাকে যেন অসীম সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে গেল কেউ, বাবা-মা'র সংসারে বলা যায় আমার আশ্রয়ই মিলল না, তাদের তাচ্ছিল্য, অত্যাচার ক্রমাগত আমাকে আঙুল দিয়ে শাসাচ্ছিল, তুই এই পৃথিবী বাসের যোগ্য না। আমি ভার্সিটিতে যাওয়ার পায়ের শক্তি ভেঙে ফেলেছি... উন্মাদের মতন বিশাল আকাশের নক্ষত্রের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছি জুবায়েরকে, না হয় একটা বিশাল ধাক্কা সামলে উঠতে পারি নি বলে আমি নিজ কাপড়ে আগুন ধরিয়েছি, পেথেড্রিন নিয়েছি, সে-তো জানত আমার পরিবার সম্পর্কে, আমার স্বভাব কী, সমাজের কাছে আমি কত বিপন্ন, কী করে সে তার কাঁধ থেকে আমাকে ফেলে নিজ অসহায়ত্বের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে পারল ? বুঝলি নিকু, মা আমাকে প্রায় এক অন্ধকার কক্ষে বন্দি করে রেখেছিল। বাবা নিজের ভাগ্যকে অভিসম্পাত করত। মা বলত কেন আমি অন্য সন্তানদের মতন মৃত হয়ে জন্মালাম না! আমার যন্ত্রণাকাতর আত্মা ফালাফালা করে চিৎকার বেরোত— জুবায়ের, চাই না আমি তোমার কোনো সন্তান, তুমি আসো, একবার সুস্থির হয়ে তোমার বেদনাপিষ্ট মুখের নীল চুমুক দিয়ে আমি শুষে নিই, একবার তোমার বুক থেকে সমুদ্রের ঘ্রাণ নিই। হায় শূন্যতা। মা হাঁপাতে হাঁপাতে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খায়। ক্লিনিক থেকে ফেরার পরও আমার বাবা মা'র বাসার কোনো পরিবর্তন দেখি না। কেন আমি ট্রাকের নিচে পড়তে গিয়ে ওদের ভুগিয়েছি, সে-নিয়ে কি ক্ষিপ্ততা তাদের! একদিন কী হলো, জুবায়ের চলে যাওয়ার পর আমি জীবনের প্রতি তলানিটুকু মায়া হারিয়ে এক অশরীরী ছায়া হয়ে বাড়িতে কেউ ছিল না, যখন শরীরে পেট্রোল ঢেলে দেশলাই হাতে নিয়েছি পৃথিবীর কোনো রঙ আমার সামনে ছিল না, কোনো শব্দ কোথাও ছিল না... যেন মহাজগতের ওপার থেকে বাজতে থাকল ফোন... আমি চেতনারহিতের মতো ফোনে কান পেতে চিনতে পারি না কে কথা বলছে... আমার কণ্ঠ শুনে ফোনের ওইপার সাংঘাতিক উদ্বিগ্ন, নিতু... নিতু তুমি কী করছ ?

আমার ভেতর থেকে মৃত এক সত্তা বলতে থাকল, শরীরে পেট্রোল ঢেলেছি, হাঃ হাঃ... এখন শুধু একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে ওঠার অপেক্ষা!

ওপাশের কণ্ঠ সাংঘাতিক ঠাণ্ডা... যেহেতু মৃত্যুরই সিদ্ধান্ত নিয়েছ, দেশলাইও তোমার হাতে, তুমি তো চলেই যাচ্ছ... তার আগে আমি কয়েকটি মিনিট তোমার কাছে সময় ভিক্ষা চাই। রিসিভারে আমার হাত কাঁপছে, সারা গায়ে পেট্রোলের গন্ধ... সে বলে, তুমি মৃত্যু মানে এই পৃথিবীর সামনে এই মুহূর্তে তোমার পৃথিবী অন্ধকার। যে-কোনো মৃত্যুর নিশ্চয়ই একটা অর্থ থাকা চাই। তুমি মরলে তোমার বাবা-মা দু'দিন কেঁদে ভাববে ঘাড় থেকে বোঝা নেমে

গেছে, যে তুমি মরলে হয়তো পৃথিবীর ওপার থেকে এসে জুবায়ের তোমার কবরের ঘাসে কয়েক ফোঁটা জল ফেলবে, সেই তুমি অন্তত আর একটা সপ্তাহ অপেক্ষা করে দেখ, তুমি একা নিজেকে কিছু দেয়ার শক্তি অর্জন করতে পার কি না।

আমি ফিসফিস স্বরে বলি— আমার ভার আমার কাছে এত ভারী হয়ে গেছে, এক সপ্তাহ কি আর এক মিনিটও সেইসব মাথায় নিয়ে আমি দাঁড়াতে পারব না।

সে বলে, যে মানুষ জ্বলন্ত মৃত্যুর ভার সামনে নিয়ে আমার সাথে কথা বলার শক্তি রাখছে, তার শক্তিকে আমি তো অনেক বড় করে দেখছি। নিজেকে ধ্বংস করে এই নশ্বর পৃথিবীতে সে কোনোদিনও ফিরে আসতে পারবে না জেনেও যে সেই কঠিন সিদ্ধান্তের দিকে নিজেকে নিতে পারে, তার সাহস তো অসীম। তুমি কখনো পরিবার থেকে, কখনো প্রেমের কাছ থেকে কিছু না কিছু নিয়ে নিয়ে এতকাল বেঁচে এসেছ, একটা সপ্তাহ অন্তত চেষ্টা করে দেখ, তুমি নিজের কাছ থেকে কিছু নিতে পারো কি না। নিতু, একটা সপ্তাহ... মৃত্যু তো তোমারই হাতে, তুমি যে-কোনো সময় নিজেকে ধ্বংসের জন্য ব্যবহার করতে পার, যে চলে যায়, নিতু, সে তো অন্য কারও জীবন বিবেচনা করে যায় না। জুবায়েরের কথাই ধরো, সে নিজের জীবনটাকেও বাঁচানোর জন্য কিন্তু গেছে। নইলে সে তোমার মতনই নিজেকে জীবনের জন্য ধ্বংস করার সিদ্ধান্তই নিত। যদি নিজেকেই দায়ী মনে কর... তবে আর কয়েকটা দিন বেঁচে থেকে দেখো সবখানি দায়ী তুমি কি না! এ তোমার অসুস্থতা... তুমি অসুস্থ জেনেও যে তোমার ভার নিয়েছিল, সে তো নিজেকে অক্ষম ভেবে তোমার সামনে বসে থাকে নি। তোমার আজীবন ক্রন্দনের ভার নেয় নি, সে নিজেকে অসহায় স্বীকার করে তোমার জীবন থেকে চলে যেতে পেরেছে, কিন্তু তার বাঁচার লোভও এক্ষেত্রে কম নয়, নইলে আগেই বলেছি, সে তোমার মতোনই আত্মঘাতী পথ বেছে নিত... এরপর নিকু...কী সব ছিন্নভিন্ন কথার পর দেয়াল টপকে পেছনের দরজা দিয়ে এসে একজন মানুষ অন্ধকারে আমাকে ঝাপটে ধরে চিৎকার করতে থাকে, বুয়া বাতি জ্বালাও!

আমার হাত থেকে দেশলাই খসে পড়ে, ভুতুরে চোখে দেখি, মোবাইল হাতে শান্তনু...।

নিকুন্তিলার শরীর হিম হয়ে এসেছিল।

এরপর শান্তনু বিস্তর কথা বলে আমার বাবা-মা'র সাথে। তারা ক্রমে ক্রমে আমার প্রতি সহনশীল হয়ে ওঠে। ওর বিশাল বড়ত্ব কী জানিস নিকু ? আমাকে চিরকাল সন্তানহীন না রাখার যে অনুভবে আমার জীবন থেকে জুবায়ের চলে গেছে, আমি আত্মহত্যা যাতে না করি সেজন্য তার সম্পর্কে তখন অনেক উল্টো কথা বললেও আমি সুস্থির হওয়ার পর ফের সে তাকে আমার মধ্যে মহান করে তুলেছে। এরপর অর্ধমৃত আমাকে নিয়ে সারা শহর ঘুরে একটা বিশাল মাঠের ওপর বসে।

নিকু:. আমার মনে হলো আমি মৃতের জগৎ থেকে ফিরে আসা সদ্যভূমিষ্ঠ নতুন কেউ! আমি ওকে বলি, শান্তনু, কেন তুমি বার বার আমাকে বাঁচাতে চাও ?

আমি তোমার, বাবা মা, স্বামী কিচ্ছু হতে চাই না, যার ওপর তুমি নিজের মূল্য সম্পর্কে না জেনে আবার নির্ভরশীল হবে। তার চাইতে তোমার আমার সম্পর্কটা সারা জীবনের জন্য

খোলা থাকুক-না। আসুক তোমার জীবনে হাজার জন... আমি ছায়ার মতোন তোমার পাশে থাকব।

শান্তনু, তুমি আমার পাশে থাকবে ? থাকবে ? তুমি পাশে থাকলে আমি হয়তো মাথাটা সোজা করে দাঁড়িয়ে বাঁচতে পারব।

শান্তনু জোরে হাসে, একটু বেশি করে বলো না, আমি পাশে থাকলে তুমি বিশ্ব জয় করতে পারবে!

শান্তনু কোনো মানুষের পায়ের তলায় যখন কাঁটা ফোটে তখন সেটাই মানুষকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দেয় না। কাঁটাটা বেরোলে তবেই না প্রান্তর দৌড়ে বিশ্বজয়ের প্রশ্ন!

নিকু বলে, তবে যে তুমি বললে বাবাকে বিয়ের সময়ও তুমি বিপর্যস্ত ছিলে ?

সে তো ছিলামই। শান্তনু সেদিন আমার ভাঙা ডানার নিচে সাংঘাতিক এক প্রেমের হলুদ মাখিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ স্মৃতির যন্ত্রণা কি ওই হাঁটতে পারার শক্তিতেই কমে ? তারপরও তোকে বলতে দ্বিধা নেই। সেই বিশাল আকাশের নিচে শান্তনুর চোখের পাপড়িতে চুমু খেয়ে আমি কান্নায় ভেঙে পড়ি। নিকু, সেদিন যদি শান্তনু আমার জীবনে না থাকত... মা কাঁদতে থাকে। বিস্মিত, হিম নিকুন্তিলা মা'র মাথায় হাত রাখে।

নিকুন্তিলা বেরিয়ে আসে অতীতের সেই যন্ত্রণাকর, রহস্যময়চক্র থেকে।

পরদিন রাতে রেজওয়ানকে নিয়ে সে ছাদে গিয়ে দাঁড়ায়। আসমান থেকে, ধেয়ে নামছে সুবর্ণ মদিরা অথবা নিকুন্তিলার টবে লাগানো হাসনাহেনা থেকে ফুলের ঘ্রাণ! নিকুন্তিলা যেন একাকী... এই ছাদে এইরকম সতত স্পন্দিত... নিঃশব্দে দেখছে মহানগরীর আলোকজ্জ্বল রাত্রিতোরণ। ঢেউ তুলে পূর্ণাঙ্গ বাতাস ওদেরকে ছুঁয়ে যায়, ছায়াআঁধারে রেজওয়ান ছুঁড়তে থাকে সিগ্রেটের কটু ধোঁয়া। শেষে স্পষ্ট কণ্ঠে বলে, জীবন সম্পর্কে তোমার সিদ্ধান্ত কী নিকু ?

নিকুন্তিলা গ্রীবা উচ্চকিত করে... পাশ করে চাকরি নিয়ে বাবা-মা'র জীবনের শেষ বয়স অব্দি ওদের সাথেই কাটাব।

এর তিন মাস পর নিকুন্তিলাকে স্তব্ধ করে দিয়ে ওদের ড্রয়িংরুমে রেজওয়ান এসে বসে। মা কফি তুলে দেয় ওর হাতে। ওর উস্কো চুল। চোখ লাল। কী হয়েছে তোমার ?

মা'র এই প্রশ্নে কেঁপে ওঠে রেজওয়ান, সে দীর্ঘসময় চুপ থেকে বলে, আমি নিকুকে বিয়ে করতে চাই!

মা'র মাথায় যেন বাজ পড়ে। নিকুন্তিলার স্তব্ধ পা গেঁথে যায় পরদার ওপারে। মহিলাটি যেন নিকুন্তিলার জীবনের এই পর্যায় নিয়ে জীবনেও ভাবে নি এমন যন্ত্রণাকর স্বরে বলে, ও পাশ করুক!

আমি এই সপ্তাহেই চাচ্ছি খালামণি। আমার ফ্যামিলিতে কোনো আপত্তি নেই।

সবে তোমার ক্যারিয়ার শুরু... মা বলে, আমি তোমাকে পছন্দ করি রেজওয়ান, নিকুর বাবাও... কিন্তু মেয়েটার পাশের আগে এটা ঘটলে ওর পড়ার অনেক ক্ষতি হবে। আর তো মাত্র একটা বছর, ওইটুকু সময় অপেক্ষা করো।

সিদ্ধান্তটা নেয়ার পর অপেক্ষা করার মতো মানসিক অবস্থা আমার নেই... নিকুকে আমি ভালোভাবে জেনেই সিদ্ধান্তটা নিয়েছি। প্রস্তাবটা আমি ওর কাছে দিতে পারতাম। আমি জানি ও স্ট্রেইট নাকচ করে দেবে। ওর প্রতিরোধ নেয়ার মতো শক্তি আমার নেই... তাছাড়া...রেজওয়ানের কফির কাপ কাঁপতে থাকে... আপনিই একদিন বলেছিলেন, সময়েরটা সময়ে না পেলে সেই মুহূর্তের অনুভব বিবর্তিত হয়ে অন্য একটা রূপে গিয়ে দাঁড়ায়। আমি ওর ভার্সিটির অধ্যাপক। আমার সংসারে গেলে ওকে এমন কিছু করতে হবে না, যা ওর পড়ার ক্ষতি করবে। বরং ওকে আমি আরো কাছ থেকে হেল্প করতে পারব!

রেজওয়ান! মা প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে— নিকু চলে গেলে এই শ্মশানপুরিতে ওর বাবা আমি কেউই বাঁচব না। তুমি মেয়ের মা'র এই বেদনাটা বুঝবে না?

কাপ রেখে রেজওয়ান সরাসরি মা'র দিকে তাকায়। ছেলের বাবা-মা হয়ে আমার বাবা মা-ই কি আমাকে কাছে পাচ্ছে? আমি নিকুর সাথে আপনাদের সম্পর্কের বিষয়টা জানি। আমি ওকে কখনোই ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছি না। বরং এটাই চাচ্ছি, আপনাদের কত কাছে একটা ফ্ল্যাট নেয়া যায়! সে প্রতিদিনই এখানে আসতে পারে! আমি হয়তো আপনাদের মতো আর্থিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ওকে দিতে পারব না। কিন্তু আমার চাকরি... টিউশনি... সব মিলিয়ে আমাদের চলে যাবে। খালামণি, আপনি আমার ওপর আস্থা রাখুন!

উত্তরার একটা বেতের বেড়াঘেরা রেস্টুরেন্টে বসে খিরি কাবাবের অর্ডার দিয়ে রেজওয়ান যেন এই প্রথম নিকুন্তিলার দিকে পরিপূর্ণ চোখে তাকায়।

নিকুন্তিলা বুঝে উঠতে পারে না, জেদ-যন্ত্রণার মিশেলে একটা অনুভূতি কেন হচ্ছে তার! সে মাথা নিচু করে থাকে।

রেজওয়ান প্রশ্ন করে, তুমি কিছু বলবে না?

যেন ফণা তোলে নিকুন্তিলা— বাবাকে বিয়ের আগে মা'র আরেকটা বিয়ে হয়েছিল।

ওকে নিভিয়ে দিয়ে রেজওয়ান হাসে— আমি জানি!

জা...নে...ন? কী করে?

তোমার মা-ই আমাকে বলেছে। যেহেতু তোমার বিয়ের প্রশ্ন, মা মনে করেছেন...।

যেন হেরে গেছে এরকম গুমরানো অনুভব নিয়ে নিকুন্তিলা বলে, মাকে তো ভালোই কিনে

ফেলেছেন। এদ্দিন আমাকে দেখিয়েছেন ভাজামাছ উল্টে খেতে জানেন না।

আমি ভাজামাছ কাটাসুদ্ধ খেতে পারি, কাটাটাও মচমচে হয় কি না, এই জন্য তোমার সাথে ভান-ভনিতা না করে তোমাকে আগে বোঝার চেষ্টা করেছি, তুমি যাতে আমাকে বোঝো, সেই সময় দিয়েছি, এরপর সোজা বিয়ের প্রস্তাবে গিয়েছি।

আমি মা'র সাথে একবার এলকোহল খেয়েছি।

আচ্ছা ?

তক্ষুণি গরম কাবাব আসে। সাথে নান রুটি আর ঠাণ্ডা কোক! ভেতরে বসে বাইরের হাওয়ার অবস্থা বোঝা যায় না। কাটা চামচে এক টুকরো কাবাব গেঁথে রেজওয়ান নিকুন্তিলার দিকে এগিয়ে দেয়।

আমার এক বয়ফ্রেন্ড ছিল... নাম বিজন...।

তো ?

কিচ্ছু না।

বলো, তোমার আগে একটা বিয়ে হয়েছিল, কারও সাথে তোমার শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে... আমার তাতে কোনো প্রব্লেম নেই... এসব শুনেও আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি থাকব, তবে অসহায় হয়ে যাব আমি এক জায়গায়, তুমি যদি বলো অন্তত বর হিসেবে আমাকে তোমার পছন্দ নয়।

আপনি কিন্তু কাবাব খাচ্ছেন না।

তুমি আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছ।

সব কথার এত সোজা সোজা জবাব চান কেন ? আপনার মধ্যে কোনো রহস্য নেই।

আমি তো প্রেমের প্রস্তাব রাখি নি, সেটা রাখলে তোমার সাথে সুবিধে করা যেত না... আমি যদি বলি, তুমি নিজেই সোজা এবং স্পষ্ট পথের মানুষ বলে আমি তোমার বোধ ধরে এগোনোর চেষ্টা করছি।

লাল হয়ে ওঠে নিকুন্তিলার মুখ। সে বলে, সেদিন রাতে ছাদে আপনাকে বলেছি, আমি কাউকে বিয়ে করব না।

খয়েরি শার্টে দেখাচ্ছে বেশ রেজওয়ানকে... ওর কথায় নিকুন্তিলাও ভেতরে ভেতরে ভাঙতে থাকে।

ঠিক আছে, চলো লিভটুগেদার করি ?

হেইট! ধুৎ!

এরপর যেন নিকুন্তিলা ঢুকে যায় শৈশবের এক নাড়িছেঁড়া রক্তপাতময় অধ্যায়ে। মা হাজার বোঝানোর পর হাজার শোধ নেয়ার পর রাত রাত নিকুন্তিলাকে কুকুর তাড়া করে বেরিয়েছে— সে বহুকাল পর সেই বিষ উগরে দেয়, আমার বাড়ন্ত বয়সে আকতার নামের

বাবার এক বন্ধু আমার শরীরে হাত রেখে আমাকে রেপ করতে চাইছিল। বুয়াকে ডেকে উঠায় সে সেটা করে উঠতে পারে নি— যদিও সতীত্ব আসলে কী বিষয় আমি ঠিক বুঝি না। কেউ যদি কামার্ত হয়ে আমার স্তন স্পর্শ করে, আমার কাছে তার অপরাধ শরীরে প্রবেশ করার চাইতে কম না। কেননা স্তন, আর যেখানটায় একজন পুরুষ প্রবেশ করে মনে করে, ওকে নষ্ট করে দিলাম— দুটোর মধ্যে আমার অনুভবে কোনো পার্থক্য নেই। যাই হোক, সে আমাকে সজোরে চুমু খেয়েছে, আমার বুক স্পর্শ করেছে। না, রেজোয়ান, আমি নিজেকে নষ্ট বা দোষী মনে করছি না, আমার মনে হচ্ছে, আমি ট্রাকের তলায় চাপা পড়ে অল্পের জন্য বেঁচে গেছি, যেহেতু সে আমাকে খুন করে নি, যদিও মা অবশ্য ওকে জুতো পেটা করে ছেড়েছে।

সাগ্রহে ওর হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে রেজওয়ান বলে, তুমি এত ইনোসেন্ট নিকু! একজন মানুষকে আরেকজন মানুষ যতটুকু ভালোবাসতে পারে, তার সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমার সব বেদনার ভার তুলে নিলাম।

কাবাব গিলে কোকের গেলাসে চুমুক দেয় নিকুন্তিলা— আমার ধাঁচে উজাড় করে দিয়ে শূন্য হওয়ার প্রবণতা নেই।

যতটুকু পার, ততটুকুই দিও... রেজওয়ানের ম্লান চোখ চশমার ফাঁকে কাতর হয়ে ওঠে, বাকিটা আমি সারা জীবন ধরে নিজের অনুভূতির যোগ্যতায় একটু একটু করে আদায় করে নেব!

নিকুন্তিলা ঠোঁট কামড়ায়, আমাকে ক'দিন ভাবতে দিন। প্লিজ!

বিয়ের পর আনন্দের চেয়ে বিচ্ছেদ যন্ত্রণার তীব্রতা নিকুন্তিলার বেশি। একজন অজানা লোক কোত্থেকে উড়ে এসে তার সারা জীবনের হয়ে গেল? কিন্তু বুকের মধ্যে তারপরও ফিনফিনে এক মহাতরঙ্গ, তার স্পর্শ, সান্নিধ্য-মনোযোগ নিকুন্তিলার জীবনে এই প্রথম! ছোট দু'রুমের এক অচিন ফ্ল্যাটকে নিজ হাতে সাজানো, রেজওয়ানের অনেক বাধা সত্ত্বেও তার ঘর বাবা-মা-ই সবকিছু দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে, বলেছে, তোমার নতুন চাকরি রেজওয়ান। এছাড়া মেয়ে আমার একটা— এ ওর প্রাপ্য, আমাদেরকে এই অনুভূতি থেকে বঞ্চিত করো না! নিকুন্তিলা জানে, বাবা-মা'র একান্ত ইচ্ছে ছিল, ওরা দু'জন বাবা-মা'র সাথেই থাকুক। কিন্তু রেজওয়ানের প্রখর ব্যক্তিত্বের সামনে এই প্রস্তাব তার কাছে রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

রেজওয়ান যদ্দুর পারে ছাড় দিয়েছে, একটু বেশি ভাড়ায় হলেও, বাবা মা'র বাড়ির কাছেই এই ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে।

বাবা অস্ফুট কণ্ঠে বলছিল, জন্মের পর থেকে মেয়েটা গাড়িতে চড়েছে, আমরা গাড়িতে চড়ব, মেয়েটা স্কুটার রিকশা করবে— ভাবতেই বুক ভেঙে আসে।

মা বলেছে, তুমিই বলেছ, কোনোদিনই সবকিছু একসাথে পাওয়া যায় না। অনেক ধনী ঘর, ছেলে ভালো— সব মিলিয়ে অসম্ভব! আমরা তো সব সময় একটা ভালো ছেলের প্রতিই জোর দিয়েছি। ছেলেটাও আমাদের ফ্যামিলির নাড়িনক্ষত্র জানে, নিজের ছেলের মতোই আমাদের অনুভব করে— সেটা কম কী?

নিকুন্তিলা ক্রমশ অনুভব করে, নিজের যন্ত্রণা দিয়ে রেজওয়ানের বিয়ের প্রথম উচ্ছ্বাসকে নষ্ট হতে দেয়া যায় না। সে নিজের মধ্যে নিজেকে ক্রমশ থিতু করে। এক রাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলে— রেজওয়ান! আমি হানিমুনে সোমেশ্বরী নদীতে যাব!

বিরিসিরিতে? সে-কী! তোমার না সমুদ্রের প্রতি অনেক আকুতি!

সে অন্য সময় যাওয়া যাবে। সেখানে তো কতই গেছি! কিন্তু শুনেছি পূর্ণিমার সময় পাহাড়-ঘেরা বিরিসিরি, সোমেশ্বরী নদী অন্য এক রূপ নেয়— সেখানে গেলে খরচও কম!

বিমর্ষ হয়ে ওঠে রেজওয়ান— আমার এখানে এসেছ বলেই জীবনের প্রথম এক ভ্রমণে তোমাকে খরচের চিন্তাটাও করতে হচ্ছে!

ওর গালে চুমু খেয়ে ছটফট নিকুন্তিলা বলে— আমি অত ভেবে বলি নি কথাটা। ওই অদেখা নদীর সাথে আমার এক নষ্টালজিয়া জড়িত। আমি তোমাকে কিছুই লুকোব না। তুমি খুঁজে বের করো, পূর্ণিমা কবে! আমি এক পূর্ণিমার রাতে সোমেশ্বরীর পাশে বসে সেই কাহিনী তোমাকে শোনাব।

বিয়ের পরপর নিকুন্তিলার ওপর দিয়ে অনেক ঝক্কি গেছে। মফস্বলে শ্বশুরবাড়ি। ওদের বাড়ির অবস্থা তেমন ভালো না। মফস্বলী বাবা-মা, তাদের প্রচুর গ্রামীণ আত্মীয়— সবাইকে সে পা ধরে সালাম করেছে। এই শিক্ষাটাও মা'র কাছ থেকে পেয়েছে। খুলনার ফুপু, মাঝেমধ্যে বিদেশের চাচারা এলে মা দরদ দিয়ে ওদের যত্ন করেছে। নিকুন্তিলাকে নিয়ে গেছে তাদের কাছে। ওরা ধনী মেয়ের এই আচরণে বেশ তৃপ্ত। একটাই সুবিধা, জমি বেচে রেজওয়ানের এক ভাইকে কিছুদিন আগে ওর ফ্যামিলি বিদেশে পাঠিয়েছে। এতে করে রেজওয়ানের দায়িত্বের ভার কিছু কমেছে। রেজওয়ান এদ্দিন টিউশনি করেও বাড়িতে টাকা পাঠিয়েছে। বিয়ের পর সে তার ফ্যামিলিতে আর্থিক সংগ্রাম করে দুঃসহ বেড়ে ওঠার অনেক কাহিনীই নিকুন্তিলাকে বলেছে। নিকুন্তিলা একটা বিষয়ে অবাক— নিজের ফ্যামিলির প্রতি তেমন আকর্ষণ, তেমন শ্রদ্ধা রেজওয়ানের নেই। বলেছে, তোমার বাবা-মা আমাকে যে স্নেহ দিয়েছে, যে সম্মান দেখিয়েছে, তা আমি আমার ফ্যামিলি থেকে পাই নি। ফার্স্ট ক্লাস

ফার্স্ট হয়ে অধ্যাপক হওয়ার চাইতে অনেক বেশি খুশি হতো তারা, আমি যদি বড় ঘুসের কোনো চাকরি করতাম। টাকা দিয়েই মানুষের বড়ত্বকে ওরা মাপে।

সেই ঘিনঘিনে ঘামের মফস্বলঘরে দু'দিন নিকুন্তিলারও দম বন্ধ হয়ে এসেছে। সে কোনোদিনই এরকম পরিবেশে অভ্যস্ত নয়। ওর বাবা-মা আত্মীয়দের কাছে বড়াই করে নিকুন্তিলার বাবা-মা'র দেয়া যৌতুকের ফিরিস্তি দিয়ে রীতিমতো নিকুন্তিলাকে বিপাকে ফেলে দিয়েছে। অথচ নিকুন্তিলার চেয়ে আর কে বেশি জানে, নিকুন্তিলার বাবা-মা'র কাছ থেকে রেজওয়ান কিছু নিতে চায় নি। রেজওয়ান বলেছে, আমাকে ফরম ফিলাপের জন্য অন্যের কাছে হাত পাততে হয়েছে, অথচ দেখো, আমার ছোট ভাইটাকে বিদেশ পাঠানোর জন্য ঠিকই তারা জমি বিক্রি করেছে। অথচ আমার সময়...।

নিকুন্তিলাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে তিনদিনের মাথায় বউসহ সে ঢাকায় যাওয়ার জন্য বাবা-মা'র কাছে প্রস্তাব রেখেছে। ওদের তো আকাশ থেকে পড়ার দশা— নতুন বউ... আত্মীয়দের বাড়ি যাবে, কম করে হলেও এক সপ্তাহ।

নিকুর সামনে পরীক্ষা— দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করেছে রেজওয়ান। এইসব ফর্মালিটি করার মতো অবস্থা ওর নেই।

ওর সিদ্ধান্তের কাছে নিকুন্তিলার আপত্তিও টেকে নি। সবার মুখ অন্ধকার করে দিয়ে সে চারদিনের মাথায় নিকুন্তিলাকে নিয়ে ঢাকায় চলে এসেছে।

বিষয়টা ভালো হলো না— নিকুন্তিলা রীতিমতো ক্ষেপে গেছে। ওরা যদি শোনে, আমরা হানিমুনে গেছি—।

ওদের ভাবনা দিয়ে আমাদের জীবন চলবে না। পরীক্ষার পরও সেখানে তুমি যেতে পারবে, কিন্তু হানিমুন আমাদের জীবনে বারবার আসবে না। এইসব বিষয় তুমি আমার ওপর ছাড়।

মা এখন উন্মাদের মতো নিকুন্তিলার ফোনের জন্য অপেক্ষা করে। কেষ্টদা কাঁদতে কাঁদতে বলে, স্কুল থেকে ফিরে মা সারা ঘর জুড়ে হাঁটে আর তোমার ফোনের জন্য অপেক্ষা করে। অন্য কারও ফোন এলে এমন বিরক্ত হয়! নিকুন্তিলা প্রায় প্রতিদিনই এখানে-সেখানে ঘুরে রেজওয়ানকে নিয়ে মা'র কাছে আসে। মা ওকে বুকে চেপে স্তব্ধ কান্নায় ফেটে পড়ে।

নিকুন্তিলা সোমেশ্বরী নদীর কাছে যাবে শুনে মা ভীষণ চমকে ওঠে। নিকুন্তিলা সন্তর্পণে লক্ষ করে, ওর বিয়ের পর মা'র ভেতরে যেন জুবায়ের নামের জ্যান্ত লাশটা মরে গেছে। এখন ওর সবটাই জুড়ে নিকুন্তিলাকে হারানোর বিচ্ছেদ। বুদ্ধিমতী মা খুব আলগোছে বলে— তুমি আমার ছেলে তো রেজওয়ান ? রেজোওয়ান ওর কাছ ঘেঁষে বসে— এ নিয়ে তোমার সন্দেহ আছে মা ?

তুমি আমার ছেলে হলে বউকে হানিমুনে নিতে নিশ্চয়ই তোমার বাবার গাড়িটি ব্যবহার করতে... বলতে বলতে এমন আর্ত চোখে রেজওয়ানের দিকে তাকায়, সে সহসা কিছু বলতে পারে না।

আমি জানি, তুমি ট্রেডিশনাল কমপ্লেক্সে ভোগো না। তোমার সব জেনেই আমরা মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি। নিশ্চয়ই বাকি জীবন তোমাদের অর্জিত টাকায় যেভাবে কুলোয় সেইভাবেই

তোমরা থাকবে, ওই পথটা অনেক এলোমেলো, অন্তত হানিমুনের সময়টা—।

তুমি নিজেই আমাকে পর করে কথা বলছ মা, রেজওয়ান হাসে, কমপ্লেক্সটা তুমিই আমার মধ্যে ঢুকাচ্ছ।

তুই একটা আস্ত পাগল! মা সস্নেহে রেজওয়ানের চুল ঝাঁকিয়ে দেয়।

হানিমুনে যাওয়ার আগের সন্ধ্যায় বারান্দায় চা খেতে খেতে রেজওয়ান বলে— আজকের রাতটায় একটু পড়াটা এগিয়ে রাখো, বিয়ের কারণে এমনিতেই অনেক ক্ষতি হচ্ছে।

চায়ে চুমুক দিয়ে সটান ওর মুখের দিকে তাকায় নিকুন্তিলা, এখন আমরা দু'জনেই ছুটির মধ্যে আছি। দয়া করে এখন আমার সাথে মাস্টারি করো না।

নিকু... পরে তুমি কভার করতে পারবে না।

আমাকে তুমি চেনো না... তুমি যখন ছাত্র পড়াবে, ভেবো না আমি তখন নাস্তা নিয়ে তোমার পথ চেয়ে বসে থাকব। তখন আমি লবণ জল খেয়ে ঠিকই পড়তে বসব!

ঢাকা-ভালুকা... ব্রহ্মপুত্রের ব্রীজ ধরে যখন গাড়ি নেত্রকোনা পেরোচ্ছে... নিকুন্তিলার রক্তের মধ্যে তরঙ্গ— সোমেশ্বরী নদী— মা যাকে বুকের মধ্যে মেরে ফেলেছে, নিকুন্তিলার সমস্ত অস্তিত্বে তার বেদনার ক্রন্দন। সে নিজের সমস্ত অস্তিত্ব ছুঁয়ে ছুঁয়ে অনুভব করে, ওই লোকটির ওই ত্যাগের গর্ভ থেকেই আজকের নিকুন্তিলার জন্ম।

বিরিসিরির কাছাকাছি শুকনো ঢালু নদী। বর্ষায় নাকি ভরে যায়। গাড়ি ঢালু বেয়ে নামতে থাকলে ভীষণ ভয় হয় নিকুন্তিলার। ওর হাত শক্ত হাতে চেপে ধরে রেজওয়ান।

ওখানে রেজওয়ানের এক দূরাত্মীয় চাচা, একা থাকে এক বাড়িতে, চাকরির সোর্সে ওখানে তার বাস— ওদেরকে সাদরে বরণ করে নেয়। সারাদিন পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে ওরা এক গারো বাড়ির নিকোনো উঠোনে বসে জল খেতে। ওদের দেখে সবাই এসেছে ভিড় করে। লাকড়ি মাথায় নিয়ে কয়েকজন মহিলা উঠোনে বসে হাঁপাতে থাকে। পুরুষগুলো দলামোচড়া হয়ে বারান্দায় বসে। চারপাশ অন্ধকার হয়ে আসছে। যেন মৃত সর্পপুরী— ঝিঁঝিঁরা সবে হাই তুলছে গলা সাধবে বলে।

রেজওয়ান জিজ্ঞেস করে পুরুষদের— এই যে আপনাদের মেয়েরা বাইরের মাঠে কাজ করে আর আপনারা ঘরে রান্না করেন, কেমন লাগে ?

পুরুষগুলো হাসে— এইডাই নিয়ম।

এক মহিলা পান এগিয়ে দিয়ে বলে— তাই বইল্যা আমরার স্বামীরা ছোড না।

হারিকেনের টিমটিমে আলোয় সার সার নাক বোঁচা তামাটে মানুষ। উঠোন থেকে বেরিয়ে ভয় পেয়ে যায় নিকুন্তিলা... যে নিকষ কালো পাহাড়ি অঞ্চল, কোন পথে গিয়ে তারা শহরে উঠবে।

একজন পাহাড়ি ছেলে এসে পথ দেখায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত বনজঙ্গলে যেন অগ্নুৎপাত

ঘটিয়ে পাহাড়ি চন্দ্রের উত্থান ঘটে... সেই আলো-আঁধারিতে ভাঙাচোরা পথ ধরে রেজওয়ানের পারফিউমসান্নিধ্য... অপূর্ব! প্রকৃতির জঙ্গলের ঘ্রাণে কী নেশা... উৎক্ষিপ্ত কুয়াশামণ্ডলী তার মিশেলে ঘন দুধের সর... যেন অনন্ত বালার খাঁজে খাঁজে নকশার কাজ... ঘন পাহাড় বনের ঝিঁঝিঁগুলোকে এমনই বোধ হয়। ছোট্ট একটা বাজারের বেঞ্চে বসে খুকি কাপে দু'জন চা খায়।

এরপর সোমেশ্বরী ...নিকুন্তিলার মনে পড়ে, একজনের বিপন্নতায় আরেকজন যখন তার হাত ধরতে পারে না, তেমন অসহায় মানুষের প্রেম কখনোই সারা জীবনের হতে পারে না। সেই দুর্বলতার পথ ধরে সন্তর্পণে ঢুকে পড়ে তৃতীয় একজন— মা'র কথা— শান্তনু যদি আমার সেই বিক্ষিপ্ত মুহূর্তে শক্ত করে আমার হাতটা না ধরত, তবে এই পৃথিবীর হাজারো ঘাসের তলায় লুকিয়ে থাকত আমার পচা হাড়। এই জীবনে তাকেও অস্বীকার করি কী সাধ্য ? পাহাড়ি চার-পাঁচ জন জানায়, নিকুন্তিলারা যত খুশি ঘুরতে পারে, ওরা পেছনে আছে।

ধু ধু বালিয়াড়ির মধ্যে জ্যোৎস্নার চকমকি দেখে মনে হয়... এও বুঝি জল— নিকুন্তিলা লাফ দিতে যাবে বালির স্তূপে গড়িয়ে পড়ে। রেজওয়ান প্রকৃতি উজাড় করে হাসে।

দু'জন নদীতে পা ভিজিয়ে বসে।

নিকুন্তিলা বলে, আমি কিন্তু গোসল করব, সাঁতার কাটব, তারপর ওই নৌকায় বসে চাঁদের আলোয় শাড়ি খুলব।

আর আমি কিন্তু তোমার ঠোঁটে বসা চাঁদটাকে জিভ দিয়ে খাবো!

ধেৎ!

নিকুন্তিলার ইচ্ছে হয়, রেজওয়ানকে বলে— আজ তুমি এলকোহল খাও! চলো আমরা মাতাল হয়ে বাবা-মা'র মতো হুল্লোড় করি। এই ইচ্ছে ওর মাঝেমধ্যেই হয়। থাক না মদ মাঝেমধ্যে রেজওয়ান ? এত সুশৃঙ্খল জীবন সারা জীবন কি ভালো লাগবে ?

সাহস হয় না।

বরং রেজওয়ান চন্দ্র বরাবর সিগ্রেটের ধোঁয়া উড়িয়ে বলে, তোমার সোমেশ্বরীর কথা বলো।

আকুল হয়ে সেই চন্দ্রালোকিত মোহিনী নদীর জল স্পর্শ করে নিকুন্তিলা। এই সেই নদী... এই সেই জল... যে নামে আজ তার নাম হতে পারত। যার পাশে জন্ম নিয়েছিল ঝাঁকড়া চুলের গভীর চোখের এক যুবক!

নিকুন্তিলা বলে... চুউপ! এখন কোনো কথা নয়... এখন অনুভব... রেজওয়ানের চুম্বনের ধারে ফালাফালা নিকুন্তিলা অপার নদীর জলে হারিয়ে দেখে, টকটকে এক চন্দ্রখণ্ড তার হাতের ওপর ভাসছে। সে উদাস কণ্ঠে বলে— জুবায়ের কাকুকে বড় মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে, মা নয়, সে যেন আমার অস্তিত্ব, আমার প্রাণেরই এক বেদনাতুর অংশ। রেজওয়ান বিস্মিত— তোমার মা-বাবা কারও কথা মনে পড়ছে না ?

না! শান্ত কণ্ঠে নিকুন্তিলা বলে— যেহেতু সোমেশ্বরী... সেহেতু আমার সবটা জুড়েই এখন জুবায়ের...।

ব্রহ্মপুত্র নিয়ে তোমাকে একটা গল্প বলি... রেজওয়ান বলে, নিকুন্তিলা তার হাঁটুর ভাঁজে থুতনি ঠেকিয়ে রেখেছে। সামনে সোমেশ্বরী, অন্য নদী, অন্য জল, এই নদীর পাশে বসে রেজওয়ানের ব্রহ্মপুত্রের কথা মনে পড়ল। নিকুন্তিলা ভাবে, সোমেশ্বরীর ধারে এসে তার ব্রহ্মপুত্রের কথা মনে হলো ?

সামনে ফেনিয়ে উঠতে থাকা মৃদু তরঙ্গ জলের হিসহিসানি, কুয়াশাময় চাঁদরাত্রি— নিকুন্তিলা, রেজওয়ান দুজনের মধ্যে নৈকট্য এনেছে।

রেজওয়ান বলে— এক গারো মেয়ে মাথায় জবাফুল গুঁজে রোজ ব্রহ্মপুত্রের ধারে বসে থাকত, সকাল গড়াতে থাকত, থাকত দুপুরের রোদ মরতে— মেয়েটির হুঁশ নেই। মেয়েটির মা মেয়েটির শিশুবেলায় ব্রহ্মপুত্রের প্রেমে পড়ে তার জলে আত্মাহুতি দিয়েছিল। সবাই ভাবে, মেয়েটি বোধহয় জলের ধারে মা'র ছায়াই খুঁজে বেড়ায়।

একদিন যায়। দুইদিন যায়।

মেয়েটি ব্রহ্মপুত্রের জলে পা ডুবিয়ে পাগল পাগল হয়ে ওঠে। তার শরীর আর মনের তৃষ্ণা কিছুতেই মেটে না। আসলে এক রাতে মেয়েটি স্বপ্নে দেখেছিল, ব্রহ্মপুত্র কান্তিমান এক পুরুষ হয়ে নগ্ন মেয়েটাকে ডাকছে। মেয়েটা তার জলে ঝাপ দিলে সে কী অপূর্ব সঙ্গম! তখন আসমানে উঠেছিল রঙধনু।

মেয়েটি রোজই একবার জল একবার আকাশের দিকে তাকায়, যদি রঙধনু ওঠে। ওঠে নি... বিস্তৃত মুসলিম অথবা খ্রিষ্টান পাড়ার মধ্যে ওরাই একমাত্র হিন্দু! মেয়েটা গোপনে জঙ্গলে বসে শিবলিঙ্গের বদলে বানায় ব্রহ্মপুত্রলিঙ্গ... তার পূজা করে। দিনরাত তারই আরাধনা। নদীতে নেমে মেয়েটি টের পায়, স্বপ্নের মতো ব্রহ্মপুত্র তাকে জড়িয়ে ধরছে না... তার শরীর, রক্ত আগুন তৃষ্ণায় টগবগ করতে থাকে।

উড্ডীন শিশিরেরা।

নিকুন্তিলা রেজওয়ানের আরো ঘনিষ্ঠ হয়— তারপর ?

সবাই বলাবলি করে, ওর মা-ও মৃত্যুর আগে এই রকম ব্রহ্মপুত্রের পাশে বসে কীসের জন্য জন্য অপেক্ষা করত। এক সন্ধ্যায় নদীতে যখন প্রবল স্রোত... সে ঝাঁপ দিয়েছিল! মেয়েটিকেও সেই ভূতে ধরল নাকি ?

তারা সবাই এ নিয়ে বলাবলি করে, মেয়েটিকে নিরস্ত করতে চায়। কিন্তু মেয়ের মধ্য যেন ভর করেছে প্রেতাত্মা মা। সে প্রায় বেহুঁশ হয়ে পথ হাঁটে... অশরীরী মানুষের মতো এর দিকে ওর দিকে তাকায়। তার যেন কোনো চেতনাই নেই।

নিকুন্তিলা টানটান হয়ে ওঠে।

রেজওয়ান সিগ্রেটের ধোঁয়া উড়ায়। গাছের পাতা চুইয়ে শিশিরেরা ওদের মাথা ভিজিয়ে দেয়। নিকুন্তিলা ছটফট করে ওঠে রাতের কামড়ে অথবা পিঁপড়ের কামড়ে। ফড় শব্দে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় কিছু, নিকুন্তিলা নিজেকে বিস্মৃত হয়ে উচ্চারণ করে— শুকপাখি ?

তার এই ভাবনার পর সামনে প্রোজ্জ্বল নদীর ফের ঢেউ।

রেজওয়ান বলে— মেয়েটির ব্রহ্মপুত্র লিঙ্গ পূজা শেষ হয় না। খুব ভোরে পূজা শেষে নদীর ঘাটে এসে সে তন্নতন্ন করে আকাশে মেঘের ভাঁজে খোঁজে রঙধনু... নেই।

সে এক রাতে নগ্ন হয়ে সাঁতার কাটে জলে। তার স্পর্শে যদি ব্রহ্মপুত্র উত্তপ্ত হয় ? নাহ্!.. প্লোটালিক জল।

মেয়েটি মরিয়া হয়ে ওঠে। তার মধ্যে যেন ভর করেছে এমন অসহ্য যৌবন, যার তৃষ্ণা কোনো মানুষ নয়, কান্তিমান ব্রহ্মপুত্রই মেটাতে পারে।

এক রাতে মেয়েটি স্বপ্নে দেখে আকাশে রঙধনু উঠেছে। সে শাদা শাড়ি পরে ধূপ নিয়ে ছুটতে ছুটতে জঙ্গলে যায় ব্রহ্মপুত্র লিঙ্গের পূজা করতে। কারা যেন লিঙ্গটিকে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে।

রোমাঞ্চে উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে মেয়েটি— এইবার তাহলে ব্রহ্মপুত্রের সত্যিকার লিঙ্গের দেখা পাব। এ তারই ইঙ্গিত।

প্রভাতের প্রান্তর ধরে মেয়েটি ছোটে। কাটা ঘাসে তার পা রক্তাক্ত হয়ে ওঠে... নিঃশ্বাসের মধ্যে অসহ্য ক্লান্তি, মেয়েটির সেইদিকে হুঁশ নেই।

সে নদীর পাশে এসে দেখে জল তো নয়, যেন উন্মাদ অগ্নিগিরি, পাগলের মতো ফুঁসছে। চিৎকার করে ওঠে মেয়েটি, সত্যিই আকাশে রঙধনু... সে ঘুরে ঘুরে অস্পষ্ট পথ ধরে একটি টিলার ওপর দাঁড়ায়... এরপর সফেদ শাড়ি একটানে উড়িয়ে দেয় আসমানে। সেটা কুণ্ডুলি পাকিয়ে উড়তে উড়তে প্রভাতের সূর্য হয়ে যায়।

মেয়েটি চোখ বুজে একবার নিজ হাতে নিজের সারা শরীর স্পর্শ করে ঝাঁপ দেয় জলে।

স্রোতের অতলে তলিয়ে যায় তার দেহ।

মা'র মতো সে-ও আত্মহত্যা করে।

নিকুন্তিলা কাঁপতে থাকে। এরপর সে টানতে টানতে রেজওয়ানকে জলে নিয়ে ফেলে— তুমি এই বিষয়টার এই অর্থ করলে ? ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক, এ আপনার বানানো গল্প, অসভ্য, বদমাইস। রেজওয়ানও জলে ভিজে হেসে মরে, টিচারকে এভাবে বলতে নেই— নিকু, সোনা, শান্ত হও! নিকুন্তিলা চিৎ সাঁতারে ভেসে দেখে, আকাশের চাঁদ ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে মেঘপুঞ্জ। যেন মৃত— এইভাবে নিজের দেহ জলের ওপর ছেড়ে সে আবৃত্তি করতে থাকে বোদলেয়ারের কবিতা। ওকে ডাঙায় টেনে ঘনিষ্ঠ হয় রেজওয়ান আর এই প্রথম নিকুন্তিলা নিজ ঠোঁটে কাউকে চুম্বনে ভাসায়।

ময়মনসিংহে ফিরে ওরা সেই হোটেলটায় ওঠে, যে হোটেলে নিকুন্তিলাকে নিয়ে বাবা উঠেছিল। বাবার জন্য ওর মনটা আকুল হয়ে ওঠে। সমস্ত হোটেলে বাবার সান্নিধ্যের গন্ধ।

নিকুন্তিলার অন্তরাত্মা হাহাকার করে ওঠে। সেই ব্রহ্মপুত্রের পাশে বসে মা'র দুর্ঘটনাসংবলিত কথাবার্তা তাকে ডাইনির মতো খামচে ধরে। মনে হয়, বাবার মতো বড় মনের মানুষ এই জীবনে সে দেখে নি। এতকাল মনে হয়েছে, মা-ই একমাত্র পিঠ পেতে, বুকে আগুন জ্বেলে বেদনা সয়েছে। এখন মনে হচ্ছে, যে বাবার জীবনে তার জানা মতে অতীতে তেমন কোনো নারী ছিল না, সে মাকে যদি জুবায়েরের বিষয়ে তার বুকের ওপর কাঁদতে দিত, তাহলে বাবার অস্তিত্ব সেই প্রেমিকের কাছে ম্লান হয়ে যেত। মহান হতে হয়তো অনেকেই ভালোবাসে। কিন্তু তার চাইতেও হয়তো প্রেমিক হওয়ার লোভ মানুষের মধ্যে মারাত্মক। বাবা হয়তো সেই লোভেই এই জায়গায় মর্মান্তিক হয়েছে। জুবায়েরকে মাঝখানে এনে বাবা মাকে তার প্রধান জায়গা থেকে সরাতে চায় নি। দেবতাকে তো মানুষ পুজো করে, বাবার তো জীবন ছিল একটাই, পুজোর চাইতে প্রেম ছিল তার কাঙ্ক্ষিত। মাকে সে তার অতীত নিয়ে আঘাত করে নি। এই কি যথেষ্ট নয় ? আজ বাবার জন্য তার বুক উজাড় করা কান্না পাচ্ছে। মনে হচ্ছে, মা'র চাইতে বাবা অনেক সরল। অনেক রহস্যময়।

রেজওয়ানও যে পাগল হতে পারে, এ ছিল নিকুন্তিলার কল্পনার বাইরে। ফোনে গনি নামের ময়মনসিংহের প্রভাবশালী একজনকে রেজওয়ান আসতে বলে।

চিপস্ চিবুতে চিবুতে নিকুন্তিলা প্রশ্ন করে— সে এসে কী করবে ? রেজওয়ান হাত-পা ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে বলে— আরে! দেখোই না! তুমি তো আমাকে একজন গুরুগম্ভীর অধ্যাপক মনে করো। আমার অতীতটা তো তুমি জানো না। মানুষ আজন্ম তার শৈশবের মধ্যেই বাস করে। সেটা লুকিয়ে তার যা চলা তার অনেকটাই ছদ্মবেশ। কিন্তু কখনোই সে যে সেই খোলস ভেঙে বেরোবে না তার কী নিশ্চয়তা ?

আজকাল এমন হয়, প্রায়ই শারীরিক সম্পর্ক... কেউ কাউকে শূন্য ঘরে স্বাভাবিক চুমু খেলেও সেটা গিয়ে সঙ্গমে ঠেকে... অবশ্য রেজওয়ান প্রায়ই বলে, আমাদের আরেকটু সংযত হওয়া উচিত... সারা জীবনের জন্য কিছু বিষয় সঞ্চিত রাখা ভালো। কিন্তু ভোগের তোপের মুখে সে-ও ভেসে যায়। তখন নিকুন্তিলার মনে পড়ে, জুবায়েরের কথা। যার সমস্ত সঙ্গমই ছিল ভয় আক্রান্ত। জীবনের সব চাইতে বঞ্চিত মানুষটিকে দেখার আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যেও দুর্মর ঝড় ওঠে।

গনি নামের ফিনফিনে যুবকটি এসে বলে— চলুন বেরোই। গনি আর রেজওয়ান এক ইশকুলে পড়ত। গনির বাবার ছিল বদলির চাকরি। তিন বছর এক ক্লাসে পড়ে তাদের অপার নৈকট্য। সে ফিকে চাঁদের নিচে ওদের চান্স দিয়ে হাঁটছে।

তোমাকে বড় অদ্ভুত লাগে নিকুন্তিলা... রেজওয়ান বলে, তোমার আগের প্রজন্মের মানুষ হয়েও মা'র জীবনে এত বিচিত্রতা, একাধিক পুরুষ, এলকোহল... তুমি এর আগে চুমু পর্যন্ত কাউকে খাও নি...।

আঁধার চাঁদের দিকে চোখ মেলে নিকুন্তিলা... হয়তো আমার জীবনেও ঘটত, যদি অবদমন থাকত, মা আমাকে এমনভাবে ছেড়ে, বিশ্বাস করে রেখেছিল... এ ছাড়া আমার ধাঁচটাই ছিল অন্যরকম... বলতে বলতে থরথর কাঁপে। অমিত... বিদেশ থেকে আসা ওর কাজিন... মেট্রিকের আগে আগের নিকুন্তিলা একদিন শূন্য বাড়িতে প্রায় আমূল ভেসেছিল তার সাথে।

সে চলে গেলে কতদিন সে কী ছটফটানি! যেহেতু বেশিদিন চলা হয় নি, সেই স্মৃতি ভুলতেও সময় লাগে নি নিকুন্তিলার। নিজেকে ঝেড়ে এরপর সে রেজওয়ানের মুখোমুখি হয়— তুমিও তো তোমার জীবনের কোনো নারী সম্পর্কে আমাকে বলো নি।

রেজওয়ান কিছুক্ষণ বিমূঢ় থেকে বলে, আমার জীবনে...।

ব্রিজের নিচের প্রবহমান জলে চোখ রেখে নিকুন্তিলা তাকে থামিয়ে দেয়। আমি সব বলে দেয়ার এমন সততায় বিশ্বাস করি না, যা অন্যকে দুর্দান্ত আঘাত করতে পারে। তোমার জীবনে যদি নানা রকম ঘটনা ঘটেই থাকে, আমাকে জানানোর দরকার নেই। পৃথিবীর সবাই প্রথম এবং একমাত্র হতে পছন্দ করে, প্রেমকে গভীর করে যে গোপনতা, সেই গোপনতা অনেক সুন্দর।

গাড়ি দিয়ে মধ্যরাত অব্দি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ঘুরে ওরা ময়মনসিংহ জংশনে আসে। নিকুন্তিলা স্তম্ভিত হয়ে যায়। এখানে যেন সারারাত জেগে থাকার আয়োজন চলে। প্রচুর ভিড়ে কোনো কোনো নারী পুরুষ খালি প্লাটফর্মে জড়াজড়ি শুয়ে আছে। নোংরা গন্ধ... অর্ধন্যাংটো নারীর ঘুমন্ত স্তন চুষছে খুজলি পড়া পুরো ন্যাংটো বাচ্চা... রেজওয়ান ওকে টেনে ব্রিজ ক্রশ করে ফের ফিরে আসে। স্টেশন তো নয়, যেন টয়লেট... শিরশির করে বুক... মাকে মনে পড়ে আমার, মাকে মনে পড়ে...।

হাসতে হাসতে রেজওয়ানকে নিকুন্তিলা বলে, জানো, আমি অনেক বড় হয়েও বিছানা ভেজাতাম বলে মা বলত, বিয়ের পর আমি বরের গা-ও ভেজাব। রেজওয়ান ঘনিষ্ঠ— ভেজাও না!

ধেৎ।

বিড়ি ফুঁকছে জড়ো হয়ে কিছু হাড্ডিসার মানুষ... ওয়াগনের ফাঁকে ফাঁকে মাগ এবং মাগির লুঙ্গি এবং শাড়ি ধরে টানার ফষ্টিনষ্টি... পুঁতিগন্ধময় ভিড় ঠেলে ওরা এক জায়গায় দেখে, গেরুয়া পোশাক পরা এক বাউল দোতারা বাজিয়ে এই মধ্যরাতে কোনো পাই-পয়সার তোয়াক্কা না করে একটানা গান গেয়ে যাচ্ছে... তার সামনে উপবিষ্ট রাত্রি জাগরিত কিছু মানুষ।

রেজওয়ান, গনি দুজনেই ওদের ভিড়ে ময়লার মধ্যে বসে পড়ে। যেন অথই দেয়ালে গেঁথে যায় নিকুন্তিলার দেহ। বাউল গাইছে—

না বাঁধিলাম ডাঙাতে ঘর
না ডুবিলাম জলে
না পাইলাম কূল কারো মনে
না ভাসলাম অকূলে...।

গনির কথামতো লোকটা মহাউৎসাহে আরো দুটো গান গায়। রেজওয়ান ওকে একশো টাকা দিয়ে নিকুন্তিলাকে হাতে ধরে গাড়িতে ওঠে।

জীবনটাকে বিচিত্র লাগছে।

এখন রাত সাড়ে দশটা।

চকলেট চিবুতে চিবুতে নিকুন্তিলা অবাক। এত রাতে। কো-থা-য় ?

রেজওয়ান বলে, সেইটাই তো বললাম। আজ আমি আমার অতীতের পথ ধরে হাঁটব।

ভাবটা এমন, তুমি এই মফস্বলে জন্মেছো!

এই বাংলার সব মফস্বলের স্মৃতিগন্ধ একই রকমের।

গাছপালা-ঘেরা বিস্তৃত নিটোল পথ পেরিয়ে প্রথমেই ওরা ব্রহ্মপুত্রের পাশের পার্কে যায়। নিকুন্তিলা স্মৃতিকাতর... পার্কের ওই দূরের পাশটায় বসেই বাবা ঢেলে দিয়েছিল তার সমস্ত সরলতা। আহা! আজ এলকোহল কই ? বাবা-মা'র জীবনে থাকতে তার কোনোদিন তো এমন করে খেয়ে ভেসে যেতে ইচ্ছে করে নি। অন্ধকার পার্কের বেঞ্চে বসে গনি বলে যেতে থাকে তার বোহেমিয়ান জীবনের কত কথা।

এইবার বৃষ্টি নেই, কুয়াশাময় নদী করুণ। তার স্রোতের শব্দও নেই।

শীত লাগছে ? প্রশ্ন করে রেজওয়ান!

ভালো করে কার্ডিগ্যান গায়ে জড়িয়ে নিকুন্তিলা বলে, না।

ও ঘেঁষে আছে রেজওয়ানের দেহ। এই নেশাকে ছাপিয়ে ওঠে অন্য নেশার সাধ্য কই ? রেজওয়ান যদি তার সব কাপড় খুলে এই বনাঞ্চলে তাকে শুইয়ে দিত ?

মরচে পড়া চাঁদ ব্রহ্মপুত্রের তরঙ্গে তরঙ্গে। নিকুন্তিলার মনে পড়ে সেই কাহিনী... আকাশে উঠেছিল রঙধনু, টিলার ওপর দাঁড়িয়েছিল এক মেয়ে... সে ছটফট করে বলে— ভয় করছে।

গনি বলে, এই শহরে আমি থাকতে সারা রাত আপনাদের ভয় নেই। আজ রাতটা আমার ওপর ছাড়ুন।

বেশ খানিকক্ষণ সেখানে বসার পর ড্রাইভার গাড়ি ছাড়ে... মা, মাগো তোমাকে খুব মনে পড়ছে... নিকুন্তিলার এইবার অন্য অনুভব, আজ রাতটা তুমি যদি আমাদের সাথে থাকতে!

কোন পথের প্যাঁচ ঘুরে ওরা যে ব্রহ্মপুত্র ব্রিজের ওপর দাঁড়ায়! নিকুন্তিলা আবৃত্তি করতে চায় মা'র মতো... 'এই শীতে আমি যদি মরে যেতে পারতুম'... ওকে টেনে রেজওয়ান একদম ব্রিজের কর্নারে নিয়ে যায়। দেখো দেখো, অন্ধকার জল।

জ্যোৎস্নার রস কেড়ে নিয়েছে দস্যুরা। নিজের সতীত্ব বাঁচাতে তা-ও কিছু আটকে রেখেছে তার শরীরের মধ্যে। তারই মিহি আভা আজকের ব্রীজের নিচের জলকে রহস্যময় করে রেখেছে। গনি খুব ফ্রি। নিকুন্তিলার মাথায় টোকা দিয়ে বলে— কেমন লাগছে ?

অদ্ভুত।

রেজওয়ান ওর ঘনিষ্ঠ হলে খালি ব্রিজ ধরে হাঁটতে হাঁটতে গনি একাকী গান গায়।

নিকুন্তিলা আজব প্রশ্ন করে— তুমি আমাকে কোনোদিন ছেড়ে যাবে না ?

রেজওয়ান গভীর উষ্ণতায় ওকে চুম্বন করে— সেই ভয় তো আমারই বেশি।

চোখে ঘুম নেই। একটানা সিগ্রেট খাচ্ছে গনি, রেজওয়ান দু'জনই। নিকুন্তিলা বলে— খুব কড়া ঝাল নতুন কিছু খেতে ইচ্ছে করছে।

রেজওয়ান কানে কানে কী যেন জিজ্ঞেস করে। গনি টানটান দাঁড়িয়ে বলে, তারও ব্যবস্থা আছে।

কোন পথে ঘুরে ঘুরে যে ওরা কাচিঝুলি নামের এক জায়গায় নামে... বৃষ্টির মধ্যে মাতাল মা'র উন্মাদ নৃত্য... রাত রাত বাবার সাথে উদ্দাম ঢলাঢলি... নিজেকে বিন্যস্ত করে নিকুন্তিলা ভীষণ অবাক। প্রায় শেষ রাত, রেস্টুরেন্ট খোলা... মানুষ খাচ্ছে... এই শহরের মানুষেরা কি ঘুমায় না ?

চেয়ারে বসে গনি অর্ডার দেয়, গরম পরোটা আর গরুর ভুঁড়ি দাও।

গরুর ভুঁড়ি...? নিকুন্তিলা অবাক। আমি কোনোদিন খাই নি আগে। পাওয়া যাচ্ছে এত রাতে ?

হাঃ হাঃ খেয়েই দেখো, রেজওয়ান বলে, আমি তো জানি তুমি খাও নি। তোমার কাছে এটাই নতুন। একবার গনির সাথে এই হোটেলে মাঝরাতে আমি এসে খেয়ে গেছি।

রাতের বিষয়টাই আলাদা— খেতে খেতে নিকুন্তিলার মনে হয়, এত স্বাদের জিনিস সে জীবনেও খায় নি।

প্রায় প্রভাত প্রভাত... গনি একটা মজার সেলুট দিয়ে চলে যায় নিকুন্তিলার মনে এক গভীর ছাপ রেখে।

দুজন ঘুমে ঢুলুঢুলু মানুষের শরীর আর চুম্বন একত্রিত হয়, ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে রেজওয়ানের কানে ফিসফিস নিকুন্তিলা বলে— আমি তোমাকে ভালোবাসি।

রেজওয়ান হাসে— এ আমার মহা সৌভাগ্য মিসেস নিকুন্তিলা... আর আমিও...।

ওরা ঘুমিয়ে পড়ে।

পাশ করে নিকুন্তিলা যখন একটা প্রাইভেট ফার্মে ঢুকেছে, রেজওয়ান ব্যস্ত তার ক্লাস, থিসিস আর টিউশনি নিয়ে, তখন নিকুন্তিলা গর্ভবতী হয়। বাবা-মা'র সে কী উচ্ছ্বাস! বাড়িতে পার্টি হয় ঘনিষ্ঠ কয়েকজন নিয়ে। এইবার বাবার অফার অগ্রাহ্য করে না রেজওয়ান। সেও দু'পেগ খায়।

সমস্যা ওদের একটাই। রেজওয়ানদের বাড়ি থেকে প্রায়ই আপত্তিকর চিঠি আসে।

রেজওয়ান পরিমিত টাকা পাঠাচ্ছে না, স্ত্রৈণ হয়ে গেছে, রেজওয়ান যেন ধনী শ্বশুরের কাছ থেকে কয়েক লাখ টাকা নিয়ে তাদেরকে পাঠায়। এরই এক রাতে চরম প্রকাশ ঘটায় রেজওয়ান। কী এক চিঠি পেয়ে সে বাসায় এসে রাত্তিরের বিছানায় বসে চেইন স্মোকারের মতো সিগ্রেট টানতে থাকে। সে ধোঁয়ার রিং তৈরি করতে করতে সেই নির্মীয়মাণ বৃত্তগুলোর মধ্যে নিকুন্তিলার গোল গোল চোখ দেখতে থাকে।

তুমি মরে যাবে— নিকুন্তিলা ওর শার্ট খামচে ধরে। রেজওয়ান সন্তর্পণে সেই হাত ছাড়িয়ে ফের আরেকটা ধরায়।

নিকুন্তিলা হাল ছেড়ে দেয়ালের মধ্যে নিজের শরীর গেঁথে দিতে দিতে বলে, আমার কথা বাদ দাও, তোমার সন্তানের কথা একবারও মনে পড়ছে না তোমার ?

যেন ভূতল ফুঁড়ে ওপরে উঠে আসে রেজওয়ান, সেই ছায়া ছায়া বৃত্তের দিকে চন্দ্রবিন্দু চোখ খুলে বলে— কথাটা রিপিট করো।

নিকুন্তিলার ওষ্ঠ স্ফীত হয়। প্রগাঢ় অভিমান আর জেদে সেখানে কোনো শব্দ তৈরি হয় না।

দেয়াল ঘড়িতে রাত সাড়ে এগারোটা। নিজের স্ফীত হয়ে উঠতে থাকা পেটটাকে বিন্যস্ত করে সে শোয়ার আয়োজন করতে গিয়ে দেখে, রেজওয়ান আরেকটা ধরিয়েছে।

আবার ধরিয়েছ ? বিছানার ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে নিকুন্তিলা শক্ত করে রেজওয়ানের হাত চেপে ধরে— আবার ?

নিকুন্তিলার হাতের বেষ্টনির মধ্যে মুখ নামিয়ে রেজওয়ান সিগ্রেটের লেজে চুমুক দেয়— আজ থেকে সারা রাত খাব।

বাহ্! নিকুন্তিলার শিথিল হাত থেকে রেজওয়ান এইবার খসে পড়ে— আত্মঘাতী হতে চাইছ তো ? তো এত কষ্ট করছ কেন ? এর জন্য তো অনেক সহজ পথ খোলা আছে।

রেজওয়ান নিকুন্তিলাকে দেখছে— ওর চোখে ক্রোধ, ভয়, যন্ত্রণার আশ্চর্য এক মিশেল। রেজওয়ানের দিকে এরপর পিঠ দিয়ে নিজেকে সহজ করতে মুঠো করে খোঁপা বাঁধছে।

নিকু তোমার মনে হচ্ছে আমি কষ্ট করে মৃত্যুর পথ তৈরি করছি ? বের করে দেয়া জিভ দিয়ে ছুঁতে ছুঁতে রেজওয়ান বলে, জীবনে প্রথম আমি এমন একটা কাজ স্বাধীনভাবে করার কথা ভাবছি। যেটা বিনোদনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে আমাকে বিপন্নতার দিকে নিয়ে যাবে। আমি যদি গলায় দড়ি দিই, বিষ খাই— তবে সেখানে জঘন্য মৃত্যুটা ছাড়া আর কিছু পাব না। তুমি বুঝছ না নিকু, আমার উদ্দেশ্য মৃত্যু নয়, একটা প্রিয় নেশাকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করা, এখানে উপভোগটাই আসল, এর ফলে মৃত্যু যদি আসে—।

নিকুন্তিলা ফস করে শরীর ঘোরায়, তার এই অকস্মাৎ আলোড়নে দেয়ালের বড় ছায়াটায় তরঙ্গ ওঠে। রেজওয়ান নিকুন্তিলা নয়, তার ছায়াটার দিকে চেয়ে থাকে।

মৃত্যু যদি আসে মানে ? তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে নিকুন্তিলার কণ্ঠ, মৃত্যু অবশ্যই আসবে। তোমার নিজের প্রাণের মায়া না থাকতে পারে। হ্যাঁ কথাটা রিপিট করতে বলছিলে, আবার করছি, নিজের স্ত্রী-সন্তানের কথা ভাববে না ?

চারপাশের স্তব্ধতা ছিঁড়ে হো হো শব্দে হেসে ওঠে রেজওয়ান। এত প্রগাঢ় রাত, এত হিমহিম ছায়া এর মধ্যে আচমকা রেজওয়ানের এমন স্বভাববিরুদ্ধ হাসি এমন যন্ত্রণাকর শব্দে বেজে ওঠে, নিকুন্তিলা বিস্মিত হতে ভুলে যায়। সে নিস্তরঙ্গ চোখে রেজওয়ানের দিকে চেয়ে থাকে।

হাসি চাপতে চাপতে রেজওয়ান বলে, নিজেকে আমার একটা বলদ মনে হয়। যাকে বলে গাধা, রামছাগল... বুঝলে ছোটবেলায় মা যখন আমার কপালে চুমু খেয়ে আমাকে স্কুলে পাঠাত, আমি না ফেরা পর্যন্ত ভাত খেত না, তখন ঘুণাক্ষরেও আমার মনে হয় নি তার সেই প্রতিটি প্রেম আমাকে কড়ায় গণ্ডায় ফেরত দিতে হবে। এই যে, যে-কোনো প্রক্রিয়ায়ই হোক আমাকে তাদের বড় করে তোলা— এ তারা তাদের নিরাপত্তার জন্যই করেছে। আমি যদি তাদের টাকা না পাঠাই, তাদের যদি না দেখি, নিকু একদিনও কি তারা সেই চুমুটা দেবে, যা ছেলেবেলায় দিত ? তার মানে আমার সুখটাই তাদের কাছে বড় নয়, আমার ভালো থাকাটাই তাদের কাম্য নয়, বুঝলে, মায়া-মমতা প্রেম যা-ই বলো এর প্রতিটার তলে তলে আছে, এক বিচ্ছিরি মর্মান্তিক হিসেব।

নিকুন্তিলার সাত মাস। নড়তে চড়তে খুব কষ্ট হয়। সে নিজেকে বিন্যস্ত করে রেজওয়ানের ঘনিষ্ঠ হয়— আজ তোমার কী হয়েছে বলো তো ? রেজওয়ান অবাক চোখে তাকায়, নিকু তোমার কি মনে হচ্ছে আমি যে কথাগুলো বলছি, তার সাথে কিছু হওয়ার সম্পর্ক আছে ? ইদানীং এই উপলব্ধি আমার প্রায়ই হচ্ছে, আমি একা একা নিজের ভেতর ছটফট করেছি। কতদিন ইচ্ছে হয়েছে, একবার দেখি, বাড়িতে টাকা না পাঠালে কী হয়, বাবা-মাকে অবহেলা করে দেখি, প্রতিক্রিয়াটা কেমন আসে। কিন্তু করতে পারি নি ভয়ে, আমি তো জানি কী হবে, আমি ইচ্ছে করে সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চাই নি, নিকু তুমি নিজে লক্ষ করে দেখো—

প্লিজ থামো তুমি— নিকুন্তিলা এইবার নিজের হাত পুড়িয়ে রেজওয়ানের সিগ্রেট চেপে ধরে— এইভাবে ভাবলে পৃথিবীর কোনোকিছুর মধ্যে তুমি সরলতা খুঁজে পাবে না। তুমি নিজে একবার ভেবে দেখো তো, ফরম-ফিলাপের টাকা দিয়ে না দিয়ে হোক, তোমাকে না পড়িয়ে ছেলেবেলায় তারা যদি ঘাড় ধরে তোমাকে পথে বের করে দিত, তুমি তাদেরকে ভালোবাসতে কি না! তাদেরকে ক্ষমা করতে কি না ? তার মানে তোমার ভালোবাসাও নিঃস্বার্থ নয়।

মশা ঘুরছে। নিকুন্তিলা সারা ঘর স্প্রে করে। রেজওয়ান ফের সিগ্রেট ধরিয়ে সেই ক্ষুদে আলো কণিকার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বলে— জন্মটা তো আমি তাদেরকে দিই নি আমাকে জন্ম দেয়া, বড় করে তোলা সবটার মধ্যেই ছিল তাদের আনন্দ, তাদের হিসেব। তুমি দেখ না ছেলে ছেলে করে প্রতিটি পরিবার কেমন পাগল হয়ে থাকে। মেয়ে হলে সারা বাড়িতে অন্ধকার নেমে আসে ? তোমাদের ফ্যামিলির বিষয়টা আলাদা, এর অর্থ কী ? ছেলের জন্য কোনো কোনো পরিবার সাতটা আটটা বাচ্চা নিচ্ছে। কেউ একাধিক বিয়েও করছে, নিকু সেইসব পরিবারে ছেলে তো জন্মায় না। একটা বলদ জন্মায়। সেখানে

সন্তানের প্রতি কোনো মায়া থাকে না, থাকে ছেলের প্রতি মায়া। মেয়ে তো পরের ঘাড়ি চলে যাবে, শেষ বয়সে মেয়ের ঘাড়ে বসে খাওয়া যাবে না, নিকু তুমি চিন্তা করে দেখো, ছেলে মানে একটা জঘন্য হিসেব, প্রেম ভালোবাসা সেখানে তাকে বড় করে তোলার ফুয়েল—

তুমি সিগ্রেট খাওয়া থামাবে ?

নিকুন্তিলার এই কথায় রেজওয়ান নিস্তরঙ্গ চোখে তার দিকে তাকায়, তোমার গর্ভের সন্তানের কথা ভাবব তো ?

তোমাকে কারও কথা ভাবতে হবে না, ঘুমুতে এসো... বলতে বলতে নিকুন্তিলা বিছানা ঝাট দেয়। তুমি যেভাবে ভাবছ, সেইভাবে কিছু ভাবতে নেই। শোনো রেজওয়ান, তুমি বাড়ির বড় ছেলে। তোমার অনুভব, তোমার চিন্তা—

এই তো আসল জায়গায় এসেছ! বড় ছেলে! মানে সবচাইতে বড় বলদ। রেজওয়ান আবার হাসতে শুরু করে। আমাদের ঘরে ঘরে নিকু মায়েরা প্রথম বলদটার জন্মের পর নিশ্চিন্তে বাকিগুলো পয়দা দিয়ে যায়। নিজেদের সাধ আহ্লাদের সেইসব ফসলকে বড় ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেরাও এক সময় তার ঘাড়ে চেপে বসে। আমাকে টিউশনি করে পর্যন্ত টাকা পাঠাতে হচ্ছে, অথচ যাকে জমি বেচে বিদেশ পাঠিয়েছে সে ঠিকমতো টাকা পাঠাচ্ছে না বলে তেমন কোনো আফসোস নেই। ঘুণাক্ষরেও তারা ভেবে দেখে না, একজন মানুষ বছরের পর বছর কী করে এতগুলো মানুষের ভার বহন করবে ? এরপরেও তারা খুশি না, তাদের অভিযোগের শেষ নেই। অধ্যাপক না হয়ে আমি ঘুসখোর হলে তারা বেশি খুশি হতো। তারপরও যখন তারা সারাক্ষণ কল্যাণ কামনার ভড়ং দেখায়—

রেজওয়ান চুপ! নিকুন্তিলা ওর মুখ চেপে ধরে, বাবা-মা সম্পর্কে এইভাবে বলো না! কী করবেন তারা ? নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে সন্তানকে বড় করে শেষ বয়সে তারা নিঃস্ব হয়ে যান। তুমি আমার দিকে তাকাও। কেন তুমি নিজেকে ধ্বংস করবে ? আমি তোমাকে ভালোবাসি, হ্যাঁ নিঃস্বার্থভাবে বাসি।

ধোঁয়া ছায়ায় বড় বিমূর্ত নিকুন্তিলার মুখ। রেজওয়ানের চোখে ঝাঁঝ লাগে। রাত ঘন হতে থাকে।

অলস পিঠ দেয়ালে ঠেকিয়ে রেজওয়ান একা একা হাসে। নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ? বলতে বলতে ফের নিকুন্তিলার মুখোমুখি হয়। তুমি সিগ্রেট নিয়ে ক'দিন যাবত যত কথা বলছ, একবার যদি আমার মৃত্যুর কথা বলছ দশবার বলছ তোমার কথা ভাবতে, তোমার সন্তানের কথা ভাবতে, তুমি আমাকে এমনই এক মহামানব ভেবেছ যার কাছে নিজের প্রাণের চাইতে স্ত্রী-সন্তানের প্রাণ বড়। যে তুমি আমার মৃত্যুর ঘাম না শুকাতেই আরেকটা বিয়ের পিঁড়িতে বসবে, যে আমি তোমার মৃত্যুর পর বছর না ঘুরতেই আরেকটা বিয়ে করব, তারা সারাক্ষণ এমন একটা ভান নিয়ে চলি, আমরা নিজেদের চাইতে অপরকে বেশি ভালোবাসি। নিকু তুমি আজকের দিনটায়, হ্যাঁ এই মুহূর্তটায়, যত কুৎসিত লাগুক. যত রূঢ় হোক সেই সত্য—

একবারের জন্য নিজের মুখোমুখি দাঁড়াও, গর্ভে সন্তান আসা তুমি কতটা আমার মৃত্যুর বিষয়ে বেদনার্ত ? কতটা ভীত ? কোনটা বেশি ? ভয় না বেদনা ? নিকু তুমি বলতে পারবে আমার মৃত্যু বিষয়ে ভাবনা এলে তোমার অস্তিত্ব সঙ্কটটাই প্রধান হয়ে ওঠে। ওঠে না ? তাহলে কোথায় আমি ? কোথায় তোমার সন্তান ? কাশির দমকে রেজওয়ানের কণ্ঠ ভেঙে আসে। নিকুন্তিলা এইবার কঠিন, রেজওয়ান! দয়া করে অন্য দশটা মানুষের সাথে আমাকে মিলিয়ো না। তুমি বিষয়টাকে অহঙ্কার হিসেবে না নিলে আমি যুক্তির জন্য বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমার বাবার প্রপার্টি আছে, আমি নিজে চাকরি করি, আমার কোনো অস্তিত্ব সঙ্কট নেই। আর সন্তানটা আমার একলার না, আমাদের দু'জনেরই। আজকে তুমি সাংঘাতিক অবিচার করলে আমার প্রতি। তোমার বাড়ির চিঠি তোমাকে এমন অন্ধ করে তুলেছে, তুমি আমার নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় আজ অন্ধকার দেখছ। আমার জেদ তুমি চেনো না। কাজটা খুব খারাপ করলে।

নিকুন্তিলার শক্ত শরীর চেপে ধরে প্রায় হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে রেজওয়ান, বাড়ির চিঠিগুলো এলে তোমার সামনে এমন ছোট হয়ে যাই! ওরা আমাকে তুচ্ছ, কীট বানিয়ে ফেলেছে। তারপরও তুমি ওদের সম্পর্কে কোনো তিক্ত কথা বললে না। এ তোমার অনেক উদারতা। আমাকে ক্ষমা কর নিকু।

ছোট কাজের মেয়েটা...চম্পা...ওর জ্বর হয়েছে। জহির কাকু, খালামণিরা রাত্তিরে খেতে আসছে... ছোট বুয়াটা রাতে আসে না। বিপদে পড়ে যায় নিকুন্তিলা।

সে যখন বটিতে ইয়া বড় রুইমাছটা কাটতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে, তখন ঘর গোছাচ্ছে রেজওয়ান। রান্নাঘরে এসে বসে— ও-কী তুমি এই শরীর নিয়ে উবু হয়ে এমন ভারী কাজ করছ ? দাও, আমি কেটে দিই।

মাছ কাটতে কাটতে হাসে রেজওয়ান, এই দৃশ্যটা আমার বাবা-মা যদি দেখত—

তুমি পুরুষ হয়ে মাছ কাটছ, তাই তো ? মিস্টার রেজওয়ান, পৃথিবীর প্রায় সব পুরুষই বাবুর্চি।

আমার বাবা অন্তত এটা কল্পনা করতে পারবে না।

আসলে সমাজ বদলালে কী হবে... চম্পার মাথায় জলপট্টি দিয়ে এসে নিকুন্তিলা পোলাওয়ের চাল নাড়তে থাকে... এখনো যেন বাইরের কাজটাই শুধু ছেলেদের। আমার শ্বাশুড়ি নিশ্চয়ই এম.এ পাশ করে বাইরে প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করেন নি।

মা এম.এ পাশ হলেও বাবা চাকরি করতে দিত না।

তুমি আমার বিষয়টা ভেবে দেখো... কড়া চালে জল দিতেই সশব্দ ধোঁয়া ওঠে। ড্রাইভিং

শিখেছি। কোনোদিনও মাকে রান্নাঘরে যেতে দেখি নি। সারা জীবন বাইরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছি, তারপরও বিয়ের পর খালামণির হাতে রান্নাটা না শিখে পারা গেল না।

বটির নিচে ঝাঁক ঝাঁক রক্ত।

রেজওয়ান বলে— আমি খোঁচা দিয়ে কোনো কথা বলছি না। ঘরে ফিরে রান্নাটা না হয় তুমি করো, পরিবেশন, বেসিন পরিষ্কার... সময় অসময়ে কি শেয়ার করি না তোমাকে ?

তোমারটা শেয়ার, আমারটা বাধ্যতামূলক।

মাছের টুকরোগুলো ধুতে ধুতে সিরিয়াসলিই বিষণ্ন হয়ে পড়ে রেজওয়ান। আমার এখানে এসে তোমার অনেক কেরিয়ারের ক্ষতি হলো! আমি যদি এই হিসেবটা আগে বুঝতাম...।

নিকুন্তিলা এক্কেবারে দুষ্টুমিভরা গরম চোখ মেলে ধরে রেজওয়ানের সামনে— আপনার ট্রেডিশনাল হতাশা প্রকাশ বন্ধ করুন। সুখ যে আসলে কী রেজওয়ান, কীসে মানুষের সুখ হয় কেউ জানে ? গাড়ি চালালে, বিদেশে গেলেই কী সুখ হতো...? মাকে দেখো, পাশ করে বাবার সাথে বিয়ের পর কলেজে ঢুকল। কিছুদিন কাজ করে ছেড়ে দিল। ঠিক ওই কলেজগুলোর মানুষগুলোর মানসিকতার সাথে খাপ খাওয়াতে পারে নি বলে। কিন্তু সারাজীবন ডুবে থাকল এমন একটা অনুবাদ কর্মের নেশায়, যার মধ্যে সেই অর্থে বিখ্যাত হওয়ার স্বপ্ন নেই, আর্থিক আউটপুট নেই। এ ছাড়া বাবার ব্যবসার ব্যস্ততা। মা মনে করত, যেহেতু সংসারে আর্থিক সাপোর্টটা বড় বিষয় না, সেহেতু আমার কাছে থেকে আমাকে মানুষ করে তোলাটাই তার জরুরি আর সুখের বিষয়... জব সেটিসফেকশন একটা বিশাল ব্যাপার। আমার চাকরিটা আমি সম্মানের সাথে শান্তি নিয়েই করছি। রেজওয়ান... মাছগুলো আমি ধুচ্ছি! তুমি ওই চুলোয় ভাজির কড়াইটা বসিয়ে দাও।

অনেক রাত অব্দি আড্ডা হয়! খালামণির দুষ্টু ছেলেটা অনেক ঢ্যাঙ্গা হয়েছে। মেয়েটা ভাইটার কাঁধ ছুঁয়েছে। খালামণির বিস্ময় যেন যায় না— আমাদের আদুরে নিকুন্তিলা যে এত সাংসারিক হবে—

শুক্রবার সকালে বুয়া রান্নাঘরে। কাপড় ইস্ত্রি করছে রেজওয়ান। নাস্তা সেরে ফুলদানিতে ফুল সাজাচ্ছে নিকুন্তিলা... কলিং বেলে শব্দ... আহা! কী আনন্দ! দরজায় মা! টিফিন বক্সে করে নিকুন্তিলার পছদের রান্না নিয়ে এসেছে। সবাই জড়ো হয়ে বিছানায় বসে। মা বলে, দেখতে ভালোই লাগে, তুই সংসার করছিস!

রেজওয়ান প্রশ্ন করে— বাবা এলো না ?

ওর শরীরটা ভালো নেই। তোদেরকে আজ গিয়ে থাকতে বলেছে।

বাবাকে অ্যালকোহলটা কমাতে বল না, নিকুন্তিলা বলে, বাবার একটা থরো চেকআপ দরকার।

আগের মতো খায় না, কমিয়েছে। বয়সের সাথে সাথে অভিমানও বেড়েছে, বলে— নিকুটা অনেক পর হয়ে গেছে।

এরপর স্তব্ধতা। নিকুন্তিলা বিমর্ষ হয়ে পড়ে। মা'র চোখের নিচে কালি জমেছে। শরীর অনেক খারাপ হয়ে গেছে।

নিকুন্তিলা বলে, এই শরীর নিয়ে মুভ করতে কষ্ট হয় মা। প্রথম তিন মাস তো দেখেছই। কী বমিটাই না করলাম। কিচ্ছু খেতে পারি নি। সেই উইকনেসও কাটিয়ে উঠতে পারছি না। কোনো রকমে কষ্ট করে অফিসটা করি।

ছুটি নিয়ে নে না।

প্রাইভেট চাকরি মা, এত আগে ছুটি পাব না। আরো এক মাস যাক।

মা নিকুন্তিলার মুখের দিকে আকুল তৃষ্ণায় তাকিয়ে থাকে। জীবনের বাস্তবতা মানুষকে এমন পাল্টে দেয়! মা মাঝেমধ্যেই ওকে নিজের মতো খরচ করার টাকা দেয়, বলে, আমার প্রয়োজন থাকলে তোর কাছ থেকে নিতাম। দু'জনই উপার্জন করি, খরচের জায়গা কোথায় ? নিকুন্তিলা নির্দ্বিধায় ছেলেবেলার মতো হাত পেতে নেয়। পর হয়ে যাওয়ার কোনো কষ্ট মাকে সে পেতে দেয় না। তবে বিষয়টা টের পেয়ে রেজওয়ান কমপ্লেক্সে ভোগে, এটা বেশ টের পায় সে। কিন্তু মা-মেয়ের সম্পর্কের কোনো বিষয়েই কথা বলতে নিকুন্তিলাকে সাহস হয় না তার।

তোর বাবা যে কী টেনশান করে... বলে, এই শরীর নিয়ে নিকু রিকশা স্কুটার করছে! কোনদিন যে কী হয়! এই সময় গাড়িটা ওর খুব দরকার ছিল।

এইবার রেজওয়ান বিমর্ষ!

হকচকিয়ে নিকুন্তিলা সামাল দেয়, এই শহরে যাদের বাচ্চা হচ্ছে, সবার যেন গাড়ি আছে, বাবা যে কী!

যা হোক, রাতে বাবার সাথে আড্ডা দিয়ে নিকুন্তিলার সেই চিরজীবনের কক্ষ। পুতুল থেকে শুরু করে দেয়াল ছবি, তেমন করেই সাজানো। নিকুন্তিলা এ ঘরে এলে এখনো নস্টালজিয়ায় পড়ে যায়। প্রথম প্রথম রেজওয়ানের সাথে এক ঘরে ঘুমাতে ওর আনইজি লাগত। মনে হতো, তার একাকী একচ্ছত্র জগতে কেউ ভাগ বসিয়েছে। এই বিছানায় দীর্ঘকাল সে একা ঘুমিয়ে অভ্যস্ত। কিন্তু এখানে এলে সেই আয়েশি জীবনটা তাকে লোভী করে তোলে, এখানে হিসেব করে চলার দুঃসহ মাসগুলি নেই। এখান থেকে গিয়ে রেজওয়ানদের ঘনঘন মফস্বল আত্মীয়দের আসা, পান খাওয়া, ওদের নিঃশ্বাস আটকে আসা বাড়িতে গিয়ে, প্রতিটি মানুষকে মধুর হাসি দিয়ে কাজ দিয়ে খুশি রাখা, এরপর আর্থিক সঙ্কটের ফল— অমানুষিক কষ্ট গেছে নিকুন্তিলার ওপর দিয়ে। এ তার একদম অচেনা জগৎ। এই বিষয়ের সাথে সে কোনোকালে অভ্যস্ত না। রাত রাত গেছে যন্ত্রণাকর নিঃশব্দ কান্নায়। ওকে তখন বাঁচিয়েছে রেজওয়ান— তোমাকে যে কি কষ্টের মধ্যে ফেললাম নিকু জাদু! তখন আর কোনো কষ্ট

থাকত না। ও ভেবে বিস্মিত হতো। ওই রকম একটা ফ্যামিলিতে জন্ম নিয়ে কী করে নিজেকে রেজওয়ান এত সংস্কারমুক্ত আধুনিক মানুষ বানিয়েছে! কিন্তু দু'একদিন গেলেই নিজের সংসারটা তাকে টানতে থাকে। যত টানাপড়েন থাকুক, ওই রাজত্বের অধিকারী সে। সে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। সত্যিই বড় অদ্ভুত মানুষের জীবন।

রাতের আঁধারে লুকিয়ে থাকে গভীর রাত। নীল জলজ আলোতে নিকুন্তিলা দেখে, তার স্তূপ স্তূপ পুতুলগুলো যেন করুণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। নৈঃসঙ্গের আস্তরণের তলায় রেজওয়ানের ঘুমন্ত মুখ। এই ঘরে ছায়ার মতোন দু'জন মানুষ হাঁটে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে— মা রাতে ভাত খেতে বলছিল, স্কুলের চাকরিটা আমাকে বাঁচিয়েছে... ছোট ছোট বাচ্চাগুলো... ঘাই দিয়ে ওঠে সেই দিনগুলো.. মদে টাল মা কখনো হাসছে... কখনো কাঁদছে— মা অনেক শান্ত হয়ে গেছে। মনে পড়ে অনেক পরে সে মাকে প্রশ্ন করেছিল, জুবায়ের মামা আর তোমার বিচ্ছেদই হয়েছে একটা বাচ্চার কারণে, তারপরও বাবা কী করে তোমার গর্ভে আমি আসার পর, আমাকে নষ্টের কথা ভেবেছিল ?

মা বলছিল, ইউসুফ একটা অদ্ভুত মানুষ। আমাকে বিয়ের পর সে প্রতি পল পল দিয়ে ভাবতে চাইত সে-ই আমার জীবনের একমাত্র পুরুষ। তাকে দিয়েই আমার জীবনের প্রথম দাম্পত্য শুরু হয়েছে। সে আমার ওইসব বাড়াবাড়ি কোনো বাতিককে প্রশ্রয় দিত না। এছাড়া জুবায়ের সম্পর্কে সে অত ডিটেলস জানত না, জানতে চাইতও না। শান্তনুর কাছে ভাসাভাসা শুনেছে। কী শুনেছে কে জানে।

রেজওয়ানের ওপর হাত রাখা সুখানুভূতি ব্যথায় টনটন করে।

রেজওয়ান কি বদলাচ্ছে ?

নিকুন্তিলার ভেতরে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভয় হয়। নিকুন্তিলার বেশি মা-বাবার বাড়ির প্রতি টান সে আজকাল ভ্রু কুঁচকানোর সাথে নিচ্ছে। সে রাত্তিরের বিছানায় সবুজ আলোতেও দেখে, বাইরে থেকে আসা এক চিমটে বিচ্ছুরিত আলো ওর রুমটাকে ছায়াচ্ছন্ন করে দিয়েছে। মা'র ব্লেড দিয়ে পা কাটার দৃশ্য চোখে ভাসে.. এরপর চোখে ভাসে দু'জন গারো নর-নারীর উড্ডীন স্রোতজলের স্তূপে ঝাঁপ দেয়ার দৃশ্য।

বিয়ের আগে রেজওয়ানকে বলা মা'র কথাগুলি মনে পড়ে। শোনো রেজওয়ান, আমি খুব ইমোশনাল। নিকু অনেকটাই ওর বাবার মতো প্র্যাকটিক্যাল। নিকুন্তিলাকে তুমি যদি চাও, সবচাইতে বিপদের জায়গা তোমাদের এবং আমাদের বাড়ির পরিবেশ। তোমাদের ফ্যামিলি এইরকম পরিবেশ কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না। এছাড়া নিকুন্তিলা আমার ছায়ায় এমনভাবে বেড়ে উঠেছে, আমি ঠিক একশো ভাগ শিওর নই, ও তোমাদের ফ্যামিলিতে খাপ খাওয়াতে পারবে কি না।

রেজওয়ান কিছুক্ষণ চুপ থেকে যেন বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, তারপরও আমি ওকেই বিয়ে করতে চাই। আমার ফ্যামিলির সাথে তো ওকে থাকতে হবে না। ওর দায়িত্ব আমার। কোনোদিন অন্তত আমাকে নিয়ে ওকে সাফার করতে হবে না।

মা বেদনা অথবা আনন্দের নিঃশ্বাস ছাড়ে।

এদিকে রেজোয়ানের বাড়ি থেকে উল্টোপাল্টা চিঠি আসা বন্ধ হচ্ছে না। এইবার নিকুন্তিলা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। নিকুন্তিলা কোনোদিন রাঁধতে পারে না, সেও তার হাড্ডিসার ননদ দেবরের দুর্গন্ধের মাঝখানে ভাতের হাঁড়ি চড়ায়। রাতে দেখে শুনে যথারীতি রেজওয়ান মহা আপসেট। আপসেট নিকুন্তিলাও সারা দিনের কাজ শেষে রাত্তিরের বিছানায় আর সহজভাবে রেজওয়ানকে নিতে পারে না নিকুন্তিলা।

রেজওয়ানের স্পর্শে সে কাঠ হয়ে বলে— এভাবে চললে আমি দম বন্ধ হয়ে মরে যাব।

তুমি জেনেশুনেই আমাকে বিয়ে করেছ, এইবার ক্ষিপ্ত রেজওয়ান, এখনো যদি তুমি সেই বাবা মায়ের ঘরে বড়ো হওয়া ধনাট্য মেয়ের মতো আচরণ করো...।

রেজোয়ানকে ভয় দেখিয়ে শান্ত হাতে মশারি টাঙ্গিয়ে নিকুন্তিলা বলে, আমি আমার মা নই। আমি তোমাকে আগেই বলেছি, আমি সবটুকু উপুড় করে দিতে পারি না। এ নিয়ে আমাকে যদি সইতে না পার, ডিভোর্সের চেয়ে উত্তম কিছু আমি কিছু দেখছি না। আমি আপোস করব না। আমার জীবন একটা। তোমার বিপন্ন ফ্যামিলির দায়িত্ব নিয়ে তোমাকে বিয়ে করেছি বলে ভেবো না, আমি তোমার সমস্ত দায়িত্বের কাছে বিক্রি হয়ে গেছি।

তুমি অল্পতেই এত ইমোশনাল হয়ে পড়ো! এখানে আপোসের প্রশ্ন কেন আসছে?

নিকুন্তিলা বলে— তোমাদের বাড়িতে যাই, আমি কী পরিবেশে বড় হয়েছি, তা তো দেখেছই, এরপর ছুটিছাটা হলেই এই যে তোমাদের বাড়ির ঘিঞ্জি পরিবেশে থেকেও কোনো রকম আমার অস্বস্তি প্রকাশ না করে তোমাকে খুশি করার চেষ্টা করেছি— এ তোমার কাছে স্বাভাবিক, সহজ। তোমার বাড়ির সবাই কথায় কথায় আমাকে শোনায়— আমার বাবার যা ইনকাম, তাতে অনেক বেশি সে ঠকিয়েছে তোমাকে। রেজোয়ান, তোমার ফ্যামিলিতে তাহলে তোমার প্রভাব এতখানি? আমি কার সংসার করছি?

এসব কথা আমি ওদের শিখিয়েছি তোমাকে বলার জন্য? ক্ষিপ্ত রেজওয়ান বলে, তুমি সব জেনেও সেলফিসের মতো আচরণ করছ...। তুমি কি চাও আমি ওদের সাথে মারামারি করি?

রেজওয়ানকে তীব্র ভয় দেখিয়ে শান্ত কণ্ঠে নিকুন্তিরা বলে— আমি কোনো আপষের জীবনে বিশ্বাস করি না। আমি তোমাকে আগেই বলেছি, এ নিয়ে আমাকে যদি সইতে না পারো, ডিভোর্সের চেয়ে আমি আর কোনো পথ দেখছি না। রেজোয়ান, আমি পথ বের করার লোক। তোমার আমার একান্ত জায়গায় তোমার ফ্যামিলি এসে যখন যুক্ত হয় তখন আমি তোমাকে ভালবাসতে গিয়ে হোঁচটের পর হোঁচট খাই। আমার জীবনে একটা দাম্পত্য সুখ পাওয়ার অধিকার আছে। এটা যদি না বোঝো তোমার যা ইচ্ছে করো। যদি আমাকে তোমার জীবনে রাখতে চাও, তবে তোমার ফ্যামিলিতে তোমার প্রভাব খাটিয়ে এসব নোংরা কথা বন্ধ করাও, তবে রেজোয়ান, পথ...। না যদি পারো, তবে বিচ্ছেদ। আমার কাছে তোমার লজ্জার কী? তুমি তোমার ভেতরের সবটাই সত্য সত্য প্রকাশ করো। বিচ্ছেদের পর আমি রক্তে গড়াই— দশ জনের সাথে ঘুরে বেড়াই, তোমার তাতে কী! তাই বলে আমি অন্ধকারে হাত-পা গুটিয়ে থমিয়ে বসে থাকব না। সেই পথ আধাঁরের হলেও। আমি অন্তত

তোমার সাথে এসব বিষয়ে কোনো আপোস করব না, যেহেতু তোমার ফ্যামিলির সাথে আমি প্রাণপণ মিলে থাকার চেষ্টা করছি।

নিকু... নিকু... রেজওয়ানের ছিল ভেজা কণ্ঠ... আমার হাতটা শক্ত করে ধরো! আমার মাথা ঠিক থাকে না প্রায়ই। যে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমি বেড়ে উঠেছি, তা দিয়ে আমি তোমাকেও অশান্তি দিচ্ছি। আমি তোমার অযোগ্য।

ওই তো যেন জ্যান্ত পুতুলগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে ডাকছে নিকুন্তিলাকে। নিকুন্তিলার শৈশব... ইশকুলের প্রথম দিন উল্টো কেড্‌স পরা... আজ ঘুম পাচ্ছে না কেন আমার... ?

নিকুন্তিলা ফের ডুবে যায় এই ঘরের হাসিকান্না মিশ্রিত জীবনকে কেন্দ্র করে উঠতি বয়সের ধেয়ে ওঠা দিনগুলোর প্রতি। চূড়ান্ত সত্যবাদী সে, যে মনে করে— আমার লাম্পট্যের ভারও অন্য একজন নিতে পারে, তারও কিছু একান্ত গোপন জায়গা থাকে। যার সামনে নিজে তাকাতেই সে সন্ত্রস্ত বোধ করে। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই— নিকুন্তিলা মনে করে, বন্ধুকে ঈশ্বরের মতন মহান বোধ করেও তার সামনে সবকিছু মেলে ধরতে সাহস পায়। ও যখন মেট্রিক দেয়, আশানুরূপ ভালো রেজাল্ট করে না। বাবা-মা'র মাথায় বাজ পড়ার অবস্থা। পরীক্ষার দুমাস আগে তার এক কাজিন এসেছিল এই শহরে, ন্যুইয়র্কে পড়াশোনা করে। নিকুন্তিলার সাংঘাতিক ভালো লাগে ওকে। ছেলেটা ইংরেজি কালচারের বুলি ফোটায় না, বিদেশী এবং বাঙালি কালচারের সম্মিলনের অপূর্ব সংস্করণ ও।

তোমার নাম ?

কাকা-কাকিমা কিছু বলে নি বুঝি ?

নিকুন্তিলা নখ খোঁটে, আমি নিজ কানে শুনতে চাইছি।

সে দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করে— অমিত।

ঘন কালো চোখ, প্রায় রাঙা চুল প্রচুর, এর মধ্যে ওর মধ্যের সাংঘাতিক বাঙালিত্ব নিকুন্তিলাকে এমনভাবে টানে, ওর কাছে পৃথিবীর সব শান্তি হারাম হয়ে যায়। ওর উদাসীনতা বাড়ে, খাওয়া কমে যায়। মা কিছুতেই এর তলরহস্যের সুরাহা বের করতে পারে না। এদিকে বহুকাল পর বড় ভাইয়ের ছেলেকে পেয়ে বাবা পাগল, অস্থির। কী করবে না করবে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য।

এইবার নিকুন্তিলা তার জীবনে আসা একজন পুরুষের মধ্যে, তাকে কেন্দ্র করে হাতের কম্পন দেখে।

মানুষের ধূমপানের ভঙ্গি যে এত অভিনব হতে পারে— নিকুন্তিলাদের সাথে সোনারগাঁও

হোটেলের এক অনুষ্ঠানে সন্তর্পণে সরে পড়ে অমিত। নিকুন্তিলা তো সবার সাথে কথা বলতে বলতে হেসেই বিভোর। দলছুট অমিত এক বিচ্ছিন্ন কর্নার চেয়ারে বসে তার সারা মুখে ধোঁয়ার কুয়াশা ছড়িয়ে সিগ্রেট টানছে আর বেদনাতুর চোখে দেখছে নিকুন্তিলার উচ্ছ্বাস!

রাত্তিরের গভীরতা ছিঁড়ে নড়ে ওঠে রেজওয়ান। না, এই কাহিনী, জীবনের একমাত্র সত্য— মা-কেও সে লুকিয়েছে। হয়তো মা সহজভাবেই নিত, কিন্তু সে জানে, ভেতরে ভেতরে নিকুন্তিলাকে নিয়ে তার মধ্যে এক ভয়াবহ আতঙ্ক তৈরি হতো। বলা যায় নি রেজওয়ানকেও। মানুষের কিছু গোপন একান্ত বাক্স থাকতে হয় হয়তো। সব যদি বাজারে বিকিয়ে দিই, নিজের থাকে কী ?

একদিন বাড়ির সবাই গেছে বেড়াতে। কেষ্টদা ফুলের টবে পানি দিতে ব্যস্ত— আমি তোমাকে এক করে ছিঁড়ে খুঁড়ে আবিষ্কার করতে চাই— বলতে বলতে অমিতের স্বর কম্পমান, বিপন্ন... ওর শরীরের নিচে তরঙ্গিত নিকুন্তিলা অস্ফুটে উচ্চারণ করে, না! না! অমিত প্রশ্ন করে, এটা প্রেম নিকু, তোমার কি আমাকে ভয় করছে ?— প্লিজ আমাকে ভেঙে পড়তে দিও না, বলতে বলতে ওই অবস্থাতেই নিকুন্তিলা অমিতকে নিজের ওপর কিছুক্ষণ পড়ে থাকতে দেয়— এরপর নিকুন্তিলা ওকে যখন বুক থেকে ঠেলছে, বিদেশী স্মার্ট বয় বলে— কিছু জোগাড় করে নিয়ে আসব ? যদি এক্সিডেন্ট হয়ে যায় ?

বলে কয়ে আমি কিছু কল্পনাও করতে পারি না। এছাড়া... এছাড়া উফ গড... এমন ভয় করছে কেন ? প্লিজ থামো অমিত! তুমি জানো না, আমি এই রকম অসুন্দর করে এই বিষয়টাকে চাই না। অমিত, কোনো কম্পিত অনুভূতিকে যদি আজ চেপে দেয় জঘন্য হিসেব— আমি এই বাস্তবতা নিয়ে সারা জীবন গ্লানির জলে পুড়ব। এরপর এক ভোরে অমিত চলে গেল। তার অপসৃয়মাণ দেহের দিকে তাকিয়ে নিকুন্তিলার অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো— আমার অনুভূতি মৃত নয়। আমি শুধু একজন প্র্যাকটিক্যাল মেয়ে নই। আমি একজন সংবেদনশীল পরিপূর্ণ নারীও!

কত স্মৃতি যে ভর করছে মাথায়। ও যখন ইন্টারমিডিয়েটে সাংঘাতিক ভালো রেজাল্ট করে, মা-বাবা ওকে তাজমহলে নিয়ে গিয়েছিল। যেনবা সূর্যাস্তের মাঢ়ি ফুঁড়ে উঠে দুর্লভ দাঁতের মতো শাদা প্রাসাদটাকে প্রদক্ষিণ করে আছে যে প্রান্তর, তার সামনেটায় দাঁড়ালে দেখা গিয়েছিল, প্রাসাদটির ডানায় বসানো দুটি অভাবনীয় সশব্দ গম্বুজ। সেখানে গিয়ে তার এই মনে হয়েছিল, স্বপ্নের চাইতে আরো অধিক উঁচু স্তরে সে দাঁড়ানো। তেপান্তরের মতোন পেঁচান প্রাসাদটার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তার নিজেকে রাজকন্যা ছাড়া আর কিছু মনে হয় নি।

নিজের শরীর থেকে আলগোছে নিজের শরীর সরিয়ে তার চির আপন ড্রেসিংরুমে যায়। বিয়ের পর এখান থেকে এককণা ক্রিমও সে সাথে নিয়ে যায় নি।

বাতি জ্বালায়।

নাইট গাউনের নিচে দুর্লভ গর্ভের উচ্চতা। যার মধ্যে ক্রমে বেড়ে উঠছে একজন শিশু।

নাভি তো নয়, পাখির সোনালি চোখ। হাতটাকে নগ্ন শরীরে বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে মনে পড়ে, সন্তান হবে না জেনে মা'র শরীরে আগুন লাগানোর ঘটনার কথা। না, আজ রাতে কোনো দুঃখ ভাবনা নয়। এই কারুকার্যময় শাদাটে আলোতে নিজের গর্ভিনী শরীরটাকে সাপের মতো বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে দেখা। হেই তুনতুন বাবু, তুমি এখন কী করছ ? তোমার বাবাটা কী অসভ্য দেখো, আমার সাথে রঙ্গলীলা করতে করতে আমার অস্তিত্বের মধ্যে তোমাকে ঢেলে দিল। এই দেখো আমার শরীর, ওর শরীরের স্নানে বিভোর। জানো বাবু, তোমাকে ছুঁলেই আমি এক অচিন নদীর স্রোতের শব্দ পাই। তার চারপাশের চিকচিক বালু যেন কুহেলিকা। আমার হাতের জলে পূর্ণ চাঁদ এসে বসে।

কল্লোলিত স্রোতের মধ্যে নিজের স্ফীত নগ্ন শরীরটা আয়নার সামনে ঘুরতে থাকে।

চেহারাটা নিয়ে যায় আয়নার একদম কাছে। কষে লম্বা বিনুনি গাঁথা ঠাসা মুখটায় শ্যামলা রঙের এমন ছায়া, যে ছায়ার জন্ম হয় বটবৃক্ষের তলা থেকে। একটু একটু মিষ্টি বোঁচা নাক থেকে আঙুল এসে ঠেকে দুই ফালি নিখুঁত ঠোঁটে। ওর যে সলজ্জ চাপা হাসি রেজওয়ানকে সবচাইতে টেনেছিল তার মাঝ থেকে হাত নেমে আসে টিলা পেটে। বাচ্চাটা এত হাঁটে! ওকে শান্ত করতে তলপেটে বৃত্তাকারে আঙুল বোলায় নিকুন্তিলা। আজ রাত্তিরের রঙ সবুজাভ আসি আসি কুয়াশার মিশেলে... না নীলের... ধ্যেৎ...। হলুদাভ আলোর দুঃসহ অগ্নির তলায় আজ যেন নিকুন্তিলা নৃত্যরত! ছেঁড়া ছেঁড়া রঙিন সব তুলো... উড়ছে শাদা কবুতরের মতো শাদা ঘরে। এই ঘরেই আমি একটি বেবি শিশু থেকে নারীরূপময়। কে বলেছে আমার মধ্যে স্বপ্ন নেই, কেন রেজোয়ানের যে-কোনো তীক্ষ্ণ আচরণে সশব্দে তালাকের কথা উচ্চারণ করতে আমার দ্বিধা হয় না ?

এখন সারা পৃথিবীতে আশ্চর্য এক শীতলতা নেমে এসেছে। এর মধ্যে জ্বলজ্বল করছে নিকুন্তিলার অপূর্ব তলপেট। ওর শ্যামলা দেহের শিশু রোমগুলো কম্পমান। যেন জলে নেমেছে নিকুন্তিলা— এই ভঙ্গিতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে ঊর্ধ্বমুখী দু'হাতকে নাচাতে থাকে। সব ঘর ছায়া করে পাখা মেলতে শুরু করে উড্ডীয়মান দুই পা।

নিকুন্তিলা...

নিকু উ উ উ...

স্বপ্নের মধ্যে কেউ যেন ডাক দেয়।

যাচ্ছি...।

রেজোয়ানের ঘুমন্ত মুখে গাঢ় মমতায় চুমু খায় নিকুন্তিলা।

রেজোয়ানের এত ঘুম! বাবার বাড়ির বড় আপন ছাদটা হাতছানি দেয়। মনে পড়ে, সেদিন বাবার বাড়িতে এক দুপুরে সবাই উপস্থিত। বন্ধের দিন।

ওরা এলেই এক আজব হুল্লোড়! কিছু না কিছু নিয়ে তর্ক লেগে যাবেই।

শান্তনু মামা, রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে বলে— তাই বলে একজন ডিভোর্সি মেয়ে

আরেকবার সংসার করতে চাইবে বলে সবাই ওকে জঘন্য চোখে দেখবে ? এই ভয়ে বাবা-মা, আত্মীয় শ্বশুর সবার সে সাথে আপোস করবে ?

জহির কাকু বলে— তাহলে মেয়েটা যাবে কোথায় ? এক স্বামী তার হাড় মাংস এক করে দিয়েছে বলে, সে ঘর ছাড়া হয়েছে, ঘর ছাড়া মেয়েকে তার বাবা-মা আত্মীয়রাও জায়গা দেয় না। সে দ্বিতীয় বিয়ে করলে তার হাজব্যান্ডও তার যে-কোনো বিচ্যুতি পেলেই বলবে— এইসব স্বভাবের কারণেই তুমি তোমার প্রথম স্বামীর ঘর করতে পারো নি!

আহ! মা'র বুকে ব্যথা উঠেছে। নিকুন্তিলা এই আলোচনার রেজাল্ট জানে— রেজওয়ান তুমি চুপ কেন ? রেজওয়ানের স্মিত হাসি— শ্রোতা তো একজন থাকা চাই। তখন নিকুন্তিলা মুখ খোলে— শান্তনু মামা, আপনারা মনে করেন একজন হাজব্যান্ডের টর্চারের কারণে দ্বিতীয় মানুষ তার সেই দুর্বলতার পথ ধরে যখন তার জীবনে আসে, তার সাথে আরো বেশি সে অত্যাচার করবে ? তাহলে মেয়েটা যাবে কোথায় ? এক সময় এইরকম মেয়েরাই পতিতা হতে বাধ্য হয়...।

নিকুন্তিলা এইবার আবারও তীব্র— আমরা পতিতাদের দেখে এসেছি জঘন্য ঘৃণার চোখে। নারায়ণগঞ্জের এক পতিতাপাড়ায় বেশির ভাগ মেয়ের মনের বিরুদ্ধে ওদের সারা দিন ব্লুফিল্ম দেখায়— যাতে ওরা পুরুষদের নানা কারিশমা দেখিয়ে নিজে বিষ গিলে পুরুষদের অনেক বিকৃত চাহিদা মেটায়। সন্ধ্যার পর— বাধ্যতামূলক ওদের মদ্যপান। যাতে রাতে কাস্টমারকে...।

সমাজের কী নিষ্ঠুর শিকার ওরা!

স্টপ নিকু! স্টপ! আমি আর সহ্য করতে পারছি না। বলতে বলতে মা তার রুমে হনহন হেঁটে যেতে যেতে বলে— আমি নিকু তোমাকে নিয়ে প্রাউড ফিল করি। তুমি সবটাই ঠিকঠিক বোঝ।

এই ঘরটা বুঝে ওঠার বয়স অব্দি... অথবা বিয়ের পর অব্দি আমার ছিল ? নিকুন্তিলার বুক ভেসে কান্না ওঠে, রেজওয়ানও তো আমার, কেন মনে হচ্ছে আমার একচ্ছত্র অধিকারে সে ভাগ বসিয়েছে ?

নিকুন্তিলার নির্ঘুম রাতে রিনরিন বাজে মা'র কণ্ঠ— সবই টুকরো টুকরো। মা কেনজাবরো ওয়ে নিয়ে তর্কে নামে। মা বলে— ওয়ে এক মহা সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব, যে আপোস করে নি, নিজ ভাষার সাথে, তাঁর শিল্পের সাথে। ওঁর দেশের পণ্ডিতরা ওর কাব্যিক ভাষার মধ্যে ব্যাকরণের ভুল খুঁজে পেত। সে সারা জীবন জাপানি ভাষায়ই লিখে গেছে। দু'একটি অনুবাদের ফলে সে নোবেল পেয়েছে।

শান্তনু মামা মারমুখী— অরুন্ধতীর বিষয়টা স্টান্ট ছাড়া আর কিছু না। প্রকাশকরা এক অভিনব পদ্ধতি বেছে নিয়েছিল। উপন্যাসটাকে কয়েকশ' রুপি ঘোষণা করলে লোকে উন্মাদপ্রায় হয়ে উঠবে। পৃথিবীতে ওর চাইতে সমৃদ্ধ উপন্যাস কেউ লেখে নি ? ওদের কোনো অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিকে কেন্দ্র করে এ রকম বিশাল অংকের টাকার ঘোষণা অ্যাডভান্স দিতে পেরেছে ? পরবর্তী সময় যতই পৃথিবী ফাটাক, কোনো প্রকাশকের সাধ্য

নেই অগ্রিম বলতে পারে, বিশেষত একজন নতুন লেখকের বিষয়ে, এই উপন্যাসের কেমন কাটতি হবে। ভাগ্য ভালো উপন্যাসটা ভালো। কিন্তু... থেমে যায় শান্তনু... এর চাইতে ভালো উপন্যাস আমাদের এই বাংলায় রচিত হয়েছে, ভালো অনুবাদকের অভাবে সেসব বাইরে যেতে পারছে না।

এই ঘরটায় এসে নিকুন্তিলা আজ স্মৃতিকাতর। মনে পড়ে, মেট্রিক পরীক্ষার রেজাল্টের পর মা ওকে নিয়ে শহরের বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল।

কোথায় যাচ্ছ ? এ.সি গাড়িতে গ্লাস খুলে দিয়েছে মা। মা বলে, দেখি না এই শহরের খোলা আকাশের নিচে তোকে নিয়ে তাজা বাতাস খাওয়া যায় কি না।

ধেৎ!

এত নির্জন এলাকা ঢাকায় আছে ? জঙ্গলের পাশ ঘেঁষে ঘেঁষে ছোট্ট একটা নদীর মতো। নিকুন্তিলা যেন বা মীন— এই রকম ঘাই সাঁতার দিতে থাকলে মা বলে, কেন মেট্রিকে খারাপ করলি ? তুই কি কিছু লুকাচ্ছিস নিকু ? আমার জীবন তো তুই জানিসই, কত কষ্টে বড় হয়েছি। তারপরও মস্ত ধনীর লালটু বয় চেহারার মৌজে পড়তাম না। এটা ভার্সিটির সবাই জানত।

পরীক্ষার আগে আগে তোকে দেখেছি, উদ্‌ভ্রান্ত, যেন কোনো গভীর ধ্যানে ডুবে গেছিস, কী হয়েছে তোর ?

অমিত... বুকের মধ্যে শিরশির করে নিকুন্তিলার। এর নাম প্রেম ? ও ছুঁতেই পাখির পালকের মতো শরীরটা যেন উড়ে গেল... মাখনের মতো গলে গেল। জঙ্গলে বাতাসের ঘ্রাণ নাকে টেনে নিকুন্তিলা অচেনা মেয়ের মতো বলে— কিচ্ছু না!

আমাকেও লুকোবি ?

না, মা কিচ্ছু লুকোচ্ছি না...।

মা যে কী মহাচালাক! নিকুন্তিলাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বলে— অমিত এখান থেকে গিয়ে একটা চিঠিও লিখল না! আশ্চর্য ছেলে!

মাঝে মাঝে নিকুন্তিলার এই বোধ, অবশ্য মা'র ভাষ্যমতে, তুই আর আমি এক গর্ভে যমজ দুই ভ্রূন ছিলাম, নিকু, আমি ভূমিষ্ট হলাম, তোর বিকাশ ঘটল না। তুই সুপ্ত ভ্রূণ হয়ে মিশে থাকলি আমার গর্ভের মধ্যে। আমি বড়ো হলাম, ঋতুবতী হলাম, তক্ষনি কুমারী মেরীর মতো আমার ভেতর বেড়ে উঠা তোর জন্ম হতে পারতো। কিন্তু তুইতো যীশু না নিকু, পেরেক বিদ্ধের নিষ্ঠুর নিয়তি তোর ভাগ্যে থাকবে কেন ? সেই জন্যই অনেক দেরিতে তুই ভূমিষ্ট হয়েছিস। হয়তো আমরা দু'জন সহোদরাই। দু'রকম ব্যক্তিত্ব ধারণ করলেও আমরা যখন একসাথে বসি, এক উত্তাপে হাসি-কাঁদি।

ও যখন ভার্সিটির প্রথম ধাপে, বিন্দুকে নিয়ে বসেছিল এক পিজা রেস্তোরায়। পাশের সিটে বসা রোমান্টিক এক কাপোলের অবদমনরত হাতস্পর্শ, উষ্ণ কথোপকথন, বড়ো বড়ো নিঃশ্বাসের উথাল পাথাল বিন্দু আর তার কথার সুর কেটে দিচ্ছিল প্রায়শ। হঠাৎ মেয়েটি

দাঁড়ায়, ছটফট করে প্রেমিককে বলে, আজ আমি যাই, আমার বাচ্চাটা হয়তো কাঁদছে।

পরকীয়া! বিন্দুর সে-কী চাপাহাসি! মা-কে বলতে মা ঠিক তার সহজাত স্বভাবে উল্টে দিলো সব। নিকু, তোরা মেয়েটার অনুভবটা দেখ! কত খারাপ চোখে দেখি আমরা পরকীয়াকে, অথচ এর চাইতে বেদনার প্রেম পৃথিবীতে আর হয় না। মেয়েটা এক কঠিন রোমাঞ্চময় অবস্থা থেকেও ঠিক ছিটকে গিয়ে তার বাচ্চার কান্নার শব্দ শুনতে পেল!

নিকুন্তিলা শুয়ে শুয়ে ছাদ দেখে। মা বলেছিল, প্রথমদিকে, জুবায়ের যখন অল্প কথা বলে, অল্প সময় দিয়ে ভেতরে ভেতরে চাইতো, এইভাবেই আমি ওকে বুঝি। তখন এমনও ঘটেছে ওর ব্যস্ততা, অবস্থান না বুঝে হয়তো আমি একটু বেশিই বলতে শুরু করে ওর ঠাণ্ডা আচরণে আহত হয়ে রিসিভার রেখে দিলাম। রেখেই কি তুচ্ছ, কি অপমানকর নিজেকে মনে হতো! ক্লীষ্টতার ভারে ছটফট করে আবার করতাম ফোন তা-কে, আমি ওকে বিরক্ত করতে চাই নি, আমার ব্যক্তিত্বটাই অমন নয়— এটা বোঝাতে, সেটা করতে গিয়ে যেন আরও বেশি সস্তা হয়ে উঠতাম— আরও কুঁকড়ে যেতাম। আসলে প্রতিটি মানুষের ভেতরই হয়তো গেঁথে থাকে কোনো রাজপুত্র বা রাজকন্যার রূপ। অনেক মানুষের মধ্যেই অবচেতনে তা-ই হয়তো সে খুঁজে পায় তার ছায়া, আধছায়া, কারও মধ্যে তার পূর্ণরূপ হয়তো এমন বয়সে গিয়ে সে খুঁজে পায়, যখন সে নিজের সঠিক ব্যবহারটা হারিয়ে তাকে পাওয়ার আকাঙ্খায় উল্টো আচরণ করতে করতে তাকে হারাতেই বসে। আমি জুবায়েরকে বলেছিলাম সেই কথা, আমাকে সময় দাও, সম্পর্কটা তো নির্মাণেরও। ও বলছিল, সেই নির্মাণ একটা সম্পর্ককে ধ্বংসের দিকেও তো নিয়ে যেতে পারে। আমি বলেছিলাম, আমি আজীবন সৃষ্টি নিয়ে ভেবেছি, তোমাকে যা-তে না হারাতে হয় সেই জন্য নিজেকে ভেঙেচুরে নির্মাণ পর্যন্ত ভাবছি, তুমি কেন বিপরীতটাই তখন ভাবছো?

সর্বনাশ আমাকে তাড়া করে ফেরে, আমি মানুষটা আসলে কি, এই জীবনে কাউকে বোঝাতে পারি নি, সেই জন্যই নিজেকে নিয়ে আমার বড়ো ভয় নিকু... বলতে বলতে ও থেমে যেতো। ছিন্নভিন্ন ওর কণ্ঠ এখনও আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়... জুবায়েরের আবৃত্তি—

"আলো— অন্ধকারে যাই— মাথার ভেতরে

স্বপ্ন নয়,— কোনো এক বোধ কাজ করে।

স্বপ্ন নয়— শান্তি নয়— ভালোবাসা নয়,

হৃদয়ের মাঝে একবোধ জন্ম লয়!

আমি তারে পারি না এড়াতে, সে আমার হাত রাখে হাতে,

সব কাজ তুচ্ছ হয়,— নও মনে হয়, সব চিন্তা— প্রার্থনার সকল সময়!

শূন্য মনে হয়,

শূন্য মনে হয়!"

রাজপুত্র!

নিকুন্তিলা ঘুমন্ত রেজোয়ানের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে, রেজোয়ানকে তো আমি সৃষ্টিতে পাই নি, ওকে প্রথম দেখে, অনেকদিন দেখেও আমার মনে হয় নি একেই আমি খুঁজছিলাম। সৃষ্টি নয়, রেজোয়ান কেবল আমার নির্মাণের। তবে কি আমার জীবনের দিকে যে ঘোড়া ছটিয়ে আসছে, তার দেখা আমি এমন সময় পাবো, যখন আমার সঠিক সময়টি থাকবে না ?

হিম ভয়ে শিউরে উঠেও সে ক্রমশঃ শান্ত হয়, মা-তো জুবায়েরকে সঠিক সময়ে পেয়েও হারিয়েছে। সবার জীবন কি এক বোধের হিসেবে চলে ? এ-কে হারানোই বা কি করে বলা চলে ? দু'জন মানুষ এক বিছানায় সারাজীবন দু'জনকে হারিয়ে নিজের অজান্তেই তো কত জীবন পার করে যায়। সব পুর্ণতার পর মৃত্যুর মধ্যেও মানুষ একদিন নিজেকে হারায়। যে জুবায়ের বলতো, নিতু, আমার ইচ্ছে করে পিঠের মধ্যে বোচকা বেঁধে, তাঁর মধ্যে তুলো ভরে তোমাকে সেখানে বসিয়ে আমি সারাদিনের কাজগুলি করি। অফিসের চেয়ারে নিজেকে ঠেসে তোমাকে টেবিলে বসিয়ে সারাদিন দেখি। তারপর রাতে একসাথে ঘরে ফিরি, যা-তে দু'জন দু'জনকে সারাক্ষণ পাই। সেই জুবায়েরকে কেন্দ্র করে মা'র অনুভবকে নিথর থামিয়ে নিকুন্তিলা বলেছিল, জীবনের কোনটা সঠিক সময় কে জানে মা ? তাহলে চার্লি চ্যাপলিন তিনটে বিয়ে বিচ্ছেদের পর শেষ বয়সে কিশোরী মেয়েটাকে বিয়ে করে বলতো না, তুমি অনেক আগে আমার জীবনে এলে বাকি তিনটে বিয়ে আমার করতে হতো না। বাবা, শান্তনু মামা দু'জন দু'ভাবে সারাজীবন তোমার সাথে হাঁটার পরও যে মানুষটাকে তুমি তোমার আত্মার মধ্যে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো, তুমি কি করে এই বোধে আসো, সে তোমার জীবন থেকে হারিয়েছে ? এমনও তো হতে পারতো, এক সাথে এক বিছানায় ঘুমুতে ঘুমুতে দু'জনই দু'জনের প্রতি ক্লান্ত হয়ে উঠতে, সংসার, সন্তানের মায়ার মধ্যে নিজেদের বিবর্তিত করে করে একসময় জীবনের শেষ প্রান্তে যেতে। এই বয়সে এসেও তোমার মধ্যে জ্বলজ্বল করছে এক রোমাঞ্চময়, মোহময় রাজপুত্র, যে নিজের সবটা তোমাকে উপুড় করে দিয়ে কেবল নিজের দেহটা নিয়ে চলে গেছে, যে কী-না আবার এ-ই পৃথিবীতে আছে, হাঁটছে, তোমাকেও হয়তো বসিয়ে রেখেছে তার ভেতরপৃথিবীর রাজকন্যার আসনে— এই ভাগ্য মা ক'জন মানুষের জীবনে থাকে ?

পেটের শিশু নড়ে ওঠে। সেখানে পরম মমতায় হাত রাখে নিকুন্তিলা।

বাবার বাড়ির আধো আলোর তলায় ঘুমিয়ে পড়ে সে।

ক্রমে আবারও বিবর্তিত হতে থাকে পৃথিবী।

গর্ভবতী নিকুন্তিলার ঘুম ভাঙে এক জাগতিক আতঙ্কের ঘোরে। যে রেজওয়ান বিয়ের পর থেকে মাসের হিসেবি বেতনের চক্রে সংসারের প্রাত্যহিক কাজে প্রাণপণ তাকে আগলে আগলে সাহায্য করে আসছে, নিজের থিসিস, ক্যারিয়ার গড়ার মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে সে-ও যেন আজকাল পালাচ্ছে।

কচি ভোরে ঘুম ভাঙতেই সামনের সুকঠিন সকালের বাস্তবতা তার রোমকূপের মধ্যে এক ভীতিকর যন্ত্রণা ঢুকিয়ে দিতে থাকে। বাইরের ড্রয়িংরুমে গাদাগাদি আত্মীয়রা শুয়ে আছে। ভোরে উঠে ওদের নাশতার চিন্তা, দুপুরে কী খাবে সে আয়োজন, সব আত্মীয়ের সব খোঁজ নিয়ে নিজের অফিস! অফিসের মধ্যেও কিলবিল করে মাথার রগগুলো। ঘরে ফেরার কথা ভাবলে চোখে জল এসে যায়। অথচ রেজওয়ান তার স্ফীত পেট থেকে হাতটা সরিয়ে সবাইকে ঘুমে রেখেই এক কাপ চা আর টোস্ট বানিয়ে খেয়ে ভার্সিটিতে যাওয়ার বেশ আগের সময়েই লাপাত্তা! নিকুন্তিলার যে স্বামীর জন্য নাস্তা বানাতে হচ্ছে না, নিজের হাতে নিজের খাবার খেয়ে সে কাজে চলে যাচ্ছে, তাতেই যেন আজকাল তার এমন বোধ, সে মহাকিছু করছে, সে মহা আধুনিক লোক। কাজের মেয়েটা, চম্পা বাড়িতে গেছে। একটা পেঁয়াজ কাটলেও তার ভেতর থেকে যে খোসা বেরোয়, সেই অতি তুচ্ছ কাজটিও পরিষ্কার করার পর থেকে, সকালে শ্বশুরবাড়ির ওরা ভাত খায়, সে ভাত চড়ানো, মাড় গালা, ভাতের সাথে আরও কিছু তরকারির ব্যবস্থা করার ঝক্কি... কে সামাল দেয় এসব? তারপর অফিস!

ওর শ্বশুরবাড়ির মানুষ যে ওকে সাহায্য করে না, তা নয়। তারা চেষ্টা করে ভোর, রাত্তিরের কাজের সময়টায় এটা ওটা এগিয়ে দিয়ে যতটুকু সম্ভব নিকুন্তিলার ঝক্কি কমাতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে উল্টো ঝক্কি বাড়ে।

নিকুন্তিলা যখন সবজি নাড়ছে তখন সবজিতে সে এখন পর্যন্ত নুন দেয় নি, এটা ভেবে ওর ননদ হয়তো নুন দেওয়া সবজির মধ্যে কিছু জিজ্ঞেস না করেই বেসিনে হাত ধুতে থাকা নিকুন্তিলার উল্টো দিকে গিয়ে ওটার মধ্যে নিজ দায়িত্বে নুন ঢেলে দিল।

তার ছোট বাচ্চাটা কমোড ভাসিয়ে ফ্লাস না টেনেই গোছানো বিছানা দলামোচড়া করে তার ওপর লাফাতে থাকল। নিকুন্তিলার সোফার ওপরে ননদের তৃতীয় বাচ্চা যখন কালিঝুলি নিয়ে আঁকিবুকি করে, সেই বাচ্চার আর্ট ক্ষমতা দেখে ননদের সে কী খুশি আনন্দ! সে সবাইকে ডেকে ডেকে সেই দৃশ্য দেখাতে থাকলে নিকুন্তিলার পৃথিবীটা আঁধারময় হয়ে ওঠে।

রেজওয়ানকে সে এইসব সাংসারিক যন্ত্রণাময় প্যাঁচাল বলতে অসুন্দর বোধ করে।

বাবা ঠিক এই ভয়টাই পাচ্ছিল। ধনী বাবার সংসারে পারিবারিক ঝঞ্ঝাটহীন জীবনে বেড়ে ওঠা নিকুন্তিলা একটি কঠিন নিম্নবিত্ত পরিবারে গিয়ে না অসহায় অবস্থায় পড়ে। এক্ষেত্রে মা'র যুক্তি ছিল, রেজওয়ান আধুনিক মনের ছেলে। তাছাড়া ওকে তো আর একান্নবর্তী ফ্যামিলিতে থাকতে হচ্ছে না। নিকুন্তিলার নিজের মধ্যেও এই বোধ ছিল, যে-কোনো পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার শক্তি সবার মধ্যেই থাকা উচিত। বিয়ের পরপর এইভাবেই সে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে আসছিল। ছোট কক্ষটাকে যতদূর সম্ভব কম আসবাবে একটু খোলামেলা করার চেষ্টা, জানালায় লতানো গাছের সবুজ ফণা, কখনো মা, কখনো খালার সাহায্যে, বেশ অনেকটাই বুয়ার—। রান্না, আত্মীয় সামলানো... পড়াশোনার শেষ ধাপটা কমপ্লিট করা— মাঝে মধ্যেই যে খেই হারিয়ে, দম হারিয়ে ফেলত না, তা নয়— তবে রেজওয়ানের অজস্র চুমু আর সুমধুর সান্নিধ্যের উষ্ণতায় সেইসব অসহিষ্ণুতা আইসক্রিম হয়ে যেত।

এছাড়া রেজওয়ান জানে নিকুন্তিলার বেড়ে ওঠার পলপল ইতিহাস— সে প্রাণপণে চেষ্টা করে গেছে, স্ত্রীর অতীতের বৈপরীত্যের সাথে তার নিজের অতীতের সমন্বয় ঘটাতে... নিকুন্তিলাকে মুহূর্তে মুহূর্তে বুঝিয়ে, প্রতিটি কাজে সাহায্য করে... যদিও সে প্রায়শ মহাবিরক্ত তার মফস্বলের আত্মীয়রা মোটেই ধার ধারছে না ওর আর নিকুন্তিলার সুখ সুবিধার, আজ এর বেড়ানো, কাল ওর ডাক্তার করে করে বিয়ের প্রায় পর থেকেই ওদের দু'জনের গভীর সান্নিধ্যের উত্তাপকে সবাই ফালাফালা করে আসছে ক্রমশ। তখন অঝোর বেদনার মধ্যেও ওর হৃৎপিণ্ডে ঘাই দিয়ে উঠেছে শান্তনু মামার বাড়ি, তাদের চাচা চাচীর সীমাহীন আন্তরিক চোখ। কে বলে, গ্রামে মফস্বলে আন্তরিকতা নেই... তাছাড়া আধো তন্দ্রায় সে প্রায়ই গা ছমছম অনুভবে সেই সূর্যাস্তটাকে দেখে, যার ওপর থেকে মা কুয়াশা সরিয়ে ফেলার শক্তিতে বিহ্বল ছিল!

নাহ্! কুয়াশা সরাতে হবে। কিন্তু ফের ভেঙে পড়তে হয়।

নিকুন্তিলা এবং রেজওয়ানের এক মুহূর্তের দরজা বন্ধ করে দেয়া বিষয়টাকেও আত্মীয়রা ওদের বেলেল্লাপনা হিসেবে ধরছে। ক্রোধে ক্ষিপ্ত রেজওয়ান গভীর রাত্তিরে প্রায় ভেঙে পড়েছে— নিকু, দেখো আমাদের জীবন একটাই, দাম্পত্য জীবনের প্রথম দিককার রোমান্সগুলি আমরা হাজার চিৎকার করলেও পরবর্তী জীবনে ফিরে পাব না... কোল জুড়ে সন্তান আসবে, ও বড় হবে... তখন অন্য মায়া, অন্য দায়িত্ব, অন্য হিসেব, তোমাকে একটা রাজকন্যা থেকে তুলে এনে আমি ঘুটেকুড়নি বানিয়ে ফেললাম। নিকুন্তিলা অবাক হয়, আশ্চর্য! বাবাও মা-কে এইভাবেই বলছিল! নিকুন্তিলার নিজের ভেতরে ভেতরে এই একই বোধ ফেনিয়ে থাকলেও সে উত্তর দিয়েছে তার শিক্ষা থেকে, তোমাকে তো আমি তোমার শৈশব থেকে ছিঁড়ে এনে সুখী হতে পারব না। মানছি, তুমি টিউশনি করে বড় হয়েছ,

তোমার বাবা মা তোমার প্রতি যথেষ্ট দায়িত্ব পালন করে নি, কিন্তু একটি গ্রন্থির মধ্যে... বাবা মা ভাইবোনের যে-কোনো প্রক্রিয়ায়ই হোক— যে বাস তার মধ্যে হঠাৎ উড়ে আসা আমাকে নিয়ে যত গভীর সুখেই তুমি যৌবনের উচ্ছ্বাসে ভাসো... যত দিন যাবে, ততই বিবর্তিত তোমার মধ্যে গ্লানির বিষ ঢুকবে— তুমি তাদের অভাব অনুযোগকে তুচ্ছ করে সুখী হতে চেয়েছ।

ওইতো প্রভাত আসছে।

বিন্দু বিন্দু সময়ের ভাটিখানায় গড়াতে গড়াতে নিকুন্তিলা এক টুকরো মধুর বাতাসের তৃষ্ণায় ছটফট করে ভরন্ত পেটে হাত রেখে অনুভব করছে, শিক্ষা আর বিচার দিয়ে জীবনের যে বিশ্লেষণ, তাতে করে পুড়ে ছাই হতে থাকে একটু আয়েশে, এক্কেবারে স্বাধীনভাবে বাঁচার লোভের বোধ অনুভব। বিয়ের পর যদিও রেজওয়ানের একলার অধ্যাপনা, নিকুন্তিলা তখনও পাশ করে চাকরিতে ঢোকে নি, অভাব না দেখা ওর জীবন ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারতো নানা আর্থ দৈন্যের কারণে, কিন্তু স্বামীর টিউশনি ছিল— সংসারে হিসেব করে কী করে চললে কতটুকু অপচয়ের আনন্দ উপভোগ করা যায়, অন্তত এই দায়িত্বের ভারটা অভাবী সংসার থেকে বেরিয়ে আসা রেজওয়ানই নিজের কাঁধে নিয়েছিল, কেননা সে জানতো, বাবা মা'র একমাত্র মেয়ে হিসেবে এই বাস্তবতা শিখে না আসা নিকুন্তিলা ঠিক এই জায়গায় নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারবে না। তাতে করে একেবারে পয়লা পয়লা দিন ওদের সুন্দরই যাচ্ছিল, কিন্তু সেই হিসেবের বাস্তবতায় ক্রমে ক্রমে শেল হয়ে ঢুকতে শুরু করতে থাকে রেজোয়ানের পরিবারের লোকজনের বেহিসেবিপনা।

একরাতে নিকুন্তিলা একেবারে আসমান থেকে পড়ে, তার শ্বশুর বলছে— নিকুর যা প্রোপার্টি তা-তো তোরই, বাড়িডা আর ওর নামে ব্যাংকে যা আছে সময় থাকতে বুইজ্যা ল'। তুইতো ফার্স্ট কেলাস পাওয়া একটা গাধা, তোর বৈষয়িক বুদ্ধি কুনদিন হইবো না। ওগোর পোলা নাই। সময় মতো সব না বুইজ্যা লইলে ওগোর চৌইদ্দ আত্মীয়র পোলারা আইস্যা ওর সম্পত্তির বেশির ভাগ জিনিস ছিঁইড়া খুঁইড়া লৈবো।

পাশের ঘরে নিকুন্তিলা পাথরের মতো স্থবির।

কিছুক্ষণ ঘরে শব্দ নেই। তাকে তার বাবা মা'র সংসার থেকে হাজার যুক্তি, হাজার প্রেম দিয়ে নিজের ঘরে আনা রেজওয়ানও কি এই বিষয়ে একমত পোষণ করবে ? ভয়ে, জেদে উৎকণ্ঠায় চোখে আঁধার দেখা নিকুন্তিলার মাথায় যখন ঠাটা পড়া পড়া অবস্থা— তক্ষুণি ওকে শীতল কান্নায় ভাসিয়ে প্রায় গর্জে ওঠে রেজওয়ান, ওদের প্রোপার্টির লোভে ওকে আমি বিয়ে করেছি ? আমি এক কানাকড়িও ওদের কাছ থেকে নেবো না, শুধু তা-ই না, আপনারা না খেয়ে মরে গেলেও আমি এক টাকাও আমার উপার্জন থেকেও আপনাদেরকে দেবো না।

বিষয়টা চরম একটা ঘৃণিত, ক্লিষ্ট, জঘন্য দিকে রূপ নিতে থাকলে নিকুন্তিলা হামলে পড়েছিল বাবা ছেলের মাঝখানে। দু'হাত জড়ো করে সেদিন সে দু'জনকে সামলেছিল।

এরপর দীর্ঘদিন স্তব্ধ।

শ্বশুরবাড়ি থেকে কেউ তাদের বাড়িতে আসে না। রেজওয়ান এই বিষয়ে নিজের গোঁ-তেই স্থির। যতো নিকুন্তিলা তাদের বোঝায় ওরা মুরুব্বি... ওদের...। ততো উত্তপ্ত রেজওয়ান, তুমি এইসব বিষয়ের মধ্যে একদম আসবে না। বাবা-মা যদি সন্তানকে আদর্শ শেখাতে না পারে, তবে সন্তানের কাছ থেকে তারা শিখবে, নিকু, মুরুব্বি বলেই তারা যা খুশি অন্যায় করার অধিকার পাবে, এটা কেমন যুক্তি ? ছোটদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা আদায়ের যোগ্যতা যদি ওদের না থাকে—

প্লিজ রেজওয়ান... চুপ করো! চুপ করো!

এরপর নিকুন্তিলাই শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে নিজের সবটুকু সরলতা উজাড় করে দিয়ে ওদের সাথে এই বাড়ির দূরত্ব কমিয়ে এনেছে। আশ্চর্য মানুষের চরিত্র! যতোই বিদ্বেষ পোষণ করুক রেজওয়ান ওদের প্রতি, নিকুন্তিলা এটা আগেও দেখেছে, সে যেন ভেতরে ভেতরে নিকুন্তিলার কাছে ব্যবহারটাই আশা করছিল। দূরত্ব কমে যাওয়ার পর ওর প্রতি রেজওয়ানের দ্বিগুণ শ্রদ্ধা বেড়ে যাওয়ায় রাত্তির রাত্তির নিকুন্তিলার নিজেকে দেখার পালা।

বিয়ের আগ মুহূর্তেও এই মানুষগুলো তার জীবনে কেউ ছিল না। বিয়ের আগে, বিয়ের পরে ছেলের কাছ থেকে যৌক্তিক, অযৌক্তিক নানা কারণে ওরা টাকার পর টাকাই কেবল চেয়ে এসেছে। নিকুন্তিলা যুক্তি দিয়ে যতো তাদেরকে আপন করতে চায়, অনুভূতি দিয়ে মুহুর্মুহু তাদের কাছ থেকে ছিটকে পড়ে। তারপরও, যতো তাদের সম্পর্কে বিদ্বেষ বাক্য উচ্চারণ করুক রেজওয়ান, নিকুন্তিলা যদি তার ছিটেফোঁটাও প্রকাশ করে, ক্রমশ সে স্বামীর সামনে একজন স্বার্থপর, দূরবর্তী, সাধারণ মানুষ হয়ে উঠবে।

এ-ই যদি হয় বাস্তবতা, সবটা ভালো দিয়ে, মিথ্যা দিয়ে স্বামীকে, শ্বশুরবাড়ির লোককে সে নিজের করে নিতে পারবে, ততোই সে সুন্দর, ততোই সে মহৎ!

তাহলে দাঁড়াচ্ছে কী ? রেজোয়ানের সাথে সমান সমান বন্ধুত্বের স্বপ্ন দিয়ে যে তার জীবনের দাম্পত্যের সূত্রপাত— তার মধ্যে একমাত্র 'সত্য' এসে বিচ্ছিরি এক কালি ঢালতে থাকবে।

বিক্ষত মাটি পাথরের খাঁজে খাঁজে নিকুন্তিলার দেহ গড়ায়। পেটের শিশু কেঁদে ওঠে যেন। পাশ ফিরতে গিয়ে কী ভার! বিষয়টা এরকম খাতে প্রবাহিত হলেও একটা কথা ছিল। যতো দিন যাচ্ছে, বছর গড়াচ্ছে ততো অন্য এক জটিল বোধের চক্রে গিয়ে পড়ছে রেজওয়ান।

বাড়ি ভর্তি মানুষ এলে এক অসহ্য বিরক্তি থেকে নিকুন্তিলাকে সাহায্যের বদলে সে

পালিয়ে বেড়াতে শুরু করছে। ভোরে বেরোয়, অনেক রাতে গম্ভীর হয়ে ঘরে ফিরে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে। আছড়ে পড়ে নিকুন্তিলা— তুমি আমার অবস্থাটা দেখবে না ? আমি কী দোষ করেছি ?

দোষ আমারই, চাপা ক্রোধে উচ্চারণ করে রেজওয়ান, বামুন হয়ে চাঁদ ঘরে এনেছি। চাষা হয়ে রাজকন্যা পাওয়ার লোভে পেয়েছিল আমাকে। নইলে তোমার জীবনটা এইখানে এনে এইভাবে নষ্ট করি ?

রাজকন্যা! ক্রোধে বিহ্বল নিকুন্তিলা পাশের ঘরে আত্মীয়দের কান এড়াতে গিয়ে বোধ করে তার নিঃশ্বাস আটকে আসছে। রেজওয়ান! রাজকন্যা শব্দটাকে যতো বিচ্ছিরিভাবে উচ্চারণ করলে, তার চাইতে আমাকে যদি বেশ্যা বলতে তা-ও অনেক সুন্দর শোনাতো!

নিকু!

চেঁচিও না! পাশের ঘরে মানুষ আছে!

আমি কোনো শালাকে কেয়ার করি না। এটা আমার নিজের বাড়ি। যতো খুশি চিল্লাব, যা খুশি বলব, আমি ওদেরটা খাই, না ওরা আমারটা খাচ্ছে!

তুমি এই ল্যাংগুয়েজে আমার সাথে কথা বল না... আমি তোমার এইসব শব্দ শুনে অভ্যস্ত না। নিকুন্তিলা কান চেপে ধরে, এটা তোমার কেমন বিচার ? আমার জীবনটা এইখানে এনে নষ্ট করেছো এটা বোধ করে উল্টো আমার ওপর ক্ষেপছ!

ফস্ শব্দে উঠে বসে রেজওয়ান রক্তাভ চোখে নিকুন্তিলার দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকায়, তুমি নিজের পরিবর্তনটা দেখছ ? তুমি বুঝতে পারছ একটা অসুস্থ পরিবেশ মানুষকে কেমন অবচেতনেই ধীরে ধীরে নিচে নামাতে থাকে! নিকু, তুমি নিজেকে কেন্দ্র করে বেশ্যার মতো একটা শব্দ উচ্চারণ করতে পারলে ?

নিকুন্তিলা মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে।

নিকু, তুমি ক'দিন তোমার বাবা মা'র বাড়িতে গিয়ে থাকো। তাতে যদি কিছুটা তোমার স্বস্তি হয়!

এটা কোনো জীবনের সমাধান হতে পারে না রেজওয়ান, আমি আর যা-ই করি, এইসব কারণে তোমার সাথে আমার বিয়ে হয়েছে বলে পস্তাতে চাই না।

তুমি আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে আমাকে সাহায্য না করে আমাকে অফিস, সংসার, টাকার হিসেব— এইসব কঠিন অবস্থার মধ্যে ফেলে নিজে পালিয়ে বেড়াবে, এ আমার প্রতি কেমন প্রেম তোমার ?

আমি আর পারছি না... নিকুন্তিলার কোলের ভাঁজে রেজওয়ান ভেঙে পড়ে।

দু'দিন স্বাভাবিক যায়!

রেজওয়ান ভোর নাস্তায় সাহায্য করে নিকুন্তিলাকে, রাতে এসে সে যখন কাপ পিরিচ

পরিষ্কারে ব্যস্ত... বাড়ির আত্মীয়দের চোখ কপালে! তারা ফিসফিস করে— ধনী বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করার শাস্তি বুঝি এই ? রেজওয়ান কি লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে ফেলেছে! একেই বলে স্ত্রৈণ!

নিকুন্তিলার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। সে সবার সামনে রেজোয়ানের কাছ থেকে সশব্দে একটা পিরিচ টেনে নিয়ে ঠাস শব্দে মাটিতে ফেলে সবার হতবাক চোখের সামনে দরজা বন্ধ করে দেয়! তারপর থেকে ফের সেই ভোরে বেরিয়ে রেজোয়ানের অনেক রাত্তিরে ফেরার শুরু।

প্রভাত যখন জেগে উঠছে, আত্মীয়দের বাথরুম, দাঁত ব্রাশ, ওজুর পানির খোঁজ, হাসি... এইসব ছিন্নবিচ্ছিন্ন শব্দের শুরু, বিছানায় কাতরে ওঠে নিকুন্তিলা... মা... মাগো, তুমি কেন আমাকে এই জীবনটা চেনালে না ?

অফিস ফেরত ক্লান্ত নিকুন্তিলা যখন হতাশ সোফায় ঠেস— ননদ এক কাপ চা করে নিয়ে আসে। বড়ো ভালো লাগে নিকুন্তিলার। সেদিনের পিরিচ ভাঙা ঘটনার পর এরা যেন নতুন কোনো মেয়েকে দেখছে— এমন একটা সমীহ ভয় নিয়ে ওর সাথে মেশে। অস্বস্তিকর ঠেকে নিকুন্তিলার। কিন্তু বিষয়টাকে কেন্দ্র করে কী করে সে ওদের সাথে দূরত্ব কমাবে তারও মাথা খুঁজে পায় না। ননদের হাত চেপে ধরে সে বলে, তুমি চা খাবে না ?

আমরা খেয়েছি— আপনার অফিস থেকে আসার আগেই— ননদের সলজ্জ হাসি ফুরাতে ফুরাতেই দরজায় মা।

ফুরফুরে মেঘপুঞ্জের মতো ভাসতে গিয়েই কী এক অজানা বোধে কুঁকড়ে যেতে থাকে নিকুন্তিলা।

আত্মীয়দের সাথে জম্পেস সব পারিবারিক গল্প মেরে মা নিকুন্তিলার বেডরুমে যখন একা, সে সহসা কথা বলতে পারে না। মা ওকে কিছু প্রশ্ন না করেই ওর মুখটা নিজের বুকের মধ্যে গুঁজে নেয়— আমি তোর অবস্থাটা বুঝছি নিকু... রেজওয়ান আমার কাছে গিয়েছিল... নিকুন্তিলা ঘোর বিস্মিত... মা বলে, যে-কোনো একটি পরিস্থিতিতে পড়ে সবার ব্যবহার একরকম হয় না। রেজওয়ান এইসব ঝঞ্ঝাট থেকে পালানোর জ্বরে যেমন কাতর, তেমনই যন্ত্রণায় পুড়ছে তোকে একটা অসহায় অপরিচিত অবস্থায় এনে কষ্টে ফেলার অনুতাপে। ও নিজেও ঠিক নিজের ব্যবহারটা খুঁজে পাচ্ছে না বলে তোকে ছুঁতে ভয় পাচ্ছে... তোকে কেন্দ্র করে এতো যার প্রেম...।

এরপরও একটা অস্বস্তির মধ্যে দু'জনের দু'দিন যায়।

আত্মীয়রা চলে গেছে।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেও নিকুন্তিলা এক সময় অনুভব করে, নির্জনতাকে, শূন্যতাকে অনুভব করার জন্য মাঝে মাঝে ভিড়, ঝঞ্ঝাট, আর্থিক টানাপড়েন এইসবের একটা গুরুত্ব আছে। নইলে যেন ঠিক নিজেকে স্থিরভাবে আবিষ্কার করা হয়ে উঠে না কোন পরিস্থিতিতে আমি মানুষটা আসলে কেমন।

আসলে অনেকটাই অশিক্ষা, অনেকটাই মফস্বলে ওদের ঠিক ওই সংসারটার মধ্যে একরকম পরিবেশে বড়ো হওয়া— ওরা হয়তো জেনেই উঠতে পারে না, ভালোবাসা এবং স্বার্থপরতার

রূপটা কেমন হওয়া উচিত। কী আশ্চর্য মায়া হচ্ছে ননদটার জন্য— যে তার তলপেটে তেল ঘষতে ঘষতে বলছিল, চম্পা যদি না আসে তাহলে আমি একজন ভালো বুয়া পাঠাব আপনার জন্য। নিয়মিত তেল না ঘষলে বাচ্চা হওয়ার পর তলপেটে কাটা কাটা দাগ হয়ে যায়।

বিছানায়, দেয়ালে মুখ দিয়ে কী এক অজানা অনুভবে রেজওয়ান কাতর। এইবার সমস্তটাই উজাড় করে নিকুন্তিলা হাত বাড়াতে গিয়ে টের পায় এক অস্বস্তিকর বোধ ওর হাতও কুঁকড়ে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, এই সামান্য স্পর্শের পরও দুজনের হয়তো একটা সমঝোতা হবে, ভেতরে জট লেগে থাকা দূরত্বটা ঘুচবে না।

নিকুন্তিলা নিজেকে ভেঙে চুড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আমূল নগ্নতা নিয়ে রেজওয়ানের শরীরের ওপর।

আশ্চর্য মানুষের দাম্পত্য সম্পর্ক!

চূড়ান্ত সঙ্গমটা না হলে যেন স্বামী স্ত্রী দু'জনের কেউই ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, এক প্রবল স্রোতে দু'জন মানুষের ভেতরের কালিটা কতটা ধুয়ে মুছে গেল!

এক গভীর শীতের রাতে নিকুন্তিলার সমস্ত অস্তিত্ব আমূল কাঁপিয়ে এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে। সারা বাড়িতে নিকুন্তিলা একা। রেজওয়ান লাইব্রেরিতে। নিকুন্তিলা শীত বাতাসের কাঁপুনিতে অস্থির জানালা বন্ধ করছিল।

বেডরুমে বসে টিভি দেখছে পিচ্চি চম্পা।

কলিং বেলে শব্দ।

দরজা খুলে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে সে। সামনে একজন অচেনা মানুষ, মাঝবয়সী। গভীর চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলে, নিকুন্তিলা!

আপনি আমাকে চেনেন ?

আমি কি ভেতরে আসব মা ?

লোকটি যেন জাদু করেছে তাকে... এমন অশরীরী বোধ নিয়ে সে তার সাথে হাঁটতে হাঁটতে সোফায় বসে। গভীর কালো চোখে, আধ পাকা ঝাঁকড়া চুলের মানুষটি কাঁধ থেকে ছোট ব্যাগটি নামিয়ে নিকুন্তিলার অন্তরাত্মা চমকে দিয়ে বলে— আমি জুবায়ের।

সোমেশ্বরী নদীর জলে চন্দ্র খণ্ড... তার ঝাঁক ঝাঁক ফেনার ওপর দিয়ে ডানা মেলে উড়ে

যাচ্ছে মা... একটি জ্যান্ত লাশ বেরিয়ে এসেছে প্রকাণ্ড রক্তমণির ভাণ্ডার থেকে... আর শীত বাতাসের পাষাণ বিলোড়ন, ফিনকি দিয়ে উঠছে মা'র জীবনের জুয়োর ঘোড়া... মা গড়াচ্ছে রক্তস্রোতে... সে টাল খেয়ে খেয়ে হামলে পড়ছে হতাশ রিসিভারে... আসমানে চাঁদ, তার নিচে ক্রন্দনরত মা'র কথা শুনে নিকুন্তিলার এই বোধ— আমার একজন গোপন বাবা এই পৃথিবীর পথে পথে হাঁটছে... এই শীতে আমি যদি মরে যেতে পারতুম... এই শীতে... মা'র রক্তাক্ত আবৃত্তি... গাছ যেমন মরে যায়, সাপ যেমন...। নিকুন্তিলার অস্তিত্বে থরকাঁপুনি। সে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে লোকটার দিকে। মা ঠিক বলেছিল। যার চোখ এত গভীর সেই চোখের ছায়া থেকে পালানো এই জীবনে কঠিন।

আপনি... মানে... এতকাল পর ? মানে... নিকুন্তিলা ঠোঁট কামড়ে চোখের জল আটকায়... মা'র অপরাধ কি এত সাংঘাতিক ছিল, সারা জীবন তার কোনো খোঁজই নিলেন না ?

যেন বিধ্বস্ত, যেন ক্লান্ত এই রকম অন্ধকার ধূসরতা থেকে তার ভরাট কণ্ঠ— খোঁজ যদি না নিয়েই থাকি, তোমাকে চিনলাম কী করে ?

নিকুন্তিলার অঙ্গ চলে না। ঠাসা শীত তাকে স্থবির করে রাখে। এক জীবনের একজন মানুষের সাথে এক মুহূর্তে সে কী কথা বলবে!

মানে... আপনি... বুঝতে পারছি না কিছু... নিকুন্তিলা খেই হারাতে থাকে। তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দিই... বলে জুবায়ের ব্যাগের চেইন খুলে নিকুন্তিলার একটা পিচ্চিবেলার ছবি বের করে। বারান্দার রেলিং ধরে হাসি হাসি নিকুন্তিলা দাঁড়ানো। এই ছবিটি ওদের ঘরে নেই। নিকুন্তিলার কল্পনার গ্রন্থি ছিঁড়ে যায়। যেন মাথার ওপর পাক খাচ্ছে দারুণ বাজপাখি... আর কঠিন শীতেরা উড়ছে...। সে বোবা হয়ে যায়। তাকে আসমান থেকে ফেলে মানুষটি বলে, তোমার জন্মের পর থেকে এই পর্যন্ত সব বয়সের ছবি আমার কাছে আছে। শান্তনু আমাকে সেসব পাঠাত। আমি জানতাম তোমার মা অস্থির হয়ে থাকত আমার ফোনের জন্য... কিন্তু তোমার বাবাকে নিয়ে সে সুখীও হয়েছে। সেই জন্য একটা ফোন করে আমি ওকে আর বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলতে চাই নি।

শা... ন্ত... নু মামা ? নিকুন্তিলার ভূমণ্ডলে দুর্দান্ত বিলোড়ন ওঠে—

মাকে এই জীবনে এই লোকটার সাথে তার যোগাযোগ আছে, তার আঁচ পর্যন্ত জানতে দেয় নি ?

পৃথিবীর সেরা রহস্যময় মানুষ মনে হয় শান্তনু মামাকে। তবে কি মা'র এই অনুভব ঠিক... নিকু, ভালোবাসার হাজার রকম আছে রে। হয়তো এই মানুষটা আমাকে ভালোবেসেই সারা জীবন একা থেকে গেল, আমার কল্যাণ চেয়ে।

তাছাড়া... অনেক কষ্টে হাঁপিয়ে উচ্চারণ করে জুবায়ের, ওকে ফোন করলে আমি নিজেকে সামলাতে পারতাম না। নিকু... ছায়াচ্ছন্ন কুয়াশায় ঝাপসা হতে থাকে জুবায়েরের মুখ... এই পৃথিবীতে আমি অনেক ঘুরেছি। 'নিকুন্তিলা' নামের একটা টেলিফিল্ম ফ্রান্সে প্রচুর বোদ্ধা দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়েছে। নিকু, তোমাকে বলা যায়, শান্তানুর কাছে শুনেছি, তোমার মা তোমার অল্প বয়স থেকেই সব বিষয় তোমার সাথে শেয়ার করে আসছে। ওখানকার এক নাইট ক্লাবে ঢুকে, আমার ভেতর ভীষণ এক যন্ত্রণার শুরু হয়। সবাই এলকোহল খাচ্ছে,

আর লোহার ডাটায় ধরে এক এক করে সব পোশাক খুলে পুরো নগ্ন রমনী পাক খাচ্ছে। তার শরীরে এক ফালি কাপড় নেই কিন্তু উরুর মধ্যে বেল্টের বেস্টনী। সে শরীর ঝাঁকালে কেউ কেউ যখন এক ডলার পাঁচ ডলার করে বেল্টে গুজে দেয়, তরিৎ দেরি না করে ভিখিরীর থালার মতো করে সে তার পা এগিয়ে আবার দোল খেতে থাকে। মদখোর মানুষেরাও সেই নগ্নতা দেখে, আড্ডা দেয়, ছুঁতে এগিয়ে যায় না। অবশ্য এই বিষয়ে আইনও বেশ কড়া। অর্থের অভাব নেই সেসব দেশে, সেখানকার মেয়েরাও আমূল নগ্নতার মধ্যে আটকে পড়ে এক চিকন বেল্টবন্দি টাকার ফাঁকের মধ্যে। পণ্য! পৃথিবীতে কী আশ্চর্য নারী পণ্যের খেলা। আমি এই বিষয়টাকে থিম করে শর্ট ফিল্ম বানাতে গিয়ে ডুবে গিয়েছিলাম আমার তোমার মাকে বিয়ের পর প্রথম রাতে দেখা কাহিনীর মধ্যে। জুবায়ের রক্তাভ... কিন্তু নিকুন্তিলার আকুল চাহনি তাকে ফের এগোতে সাহায্য করে— আমি যখন তার সৌন্দর্য দেখে গভীর অনুভবে উচ্চারণ করছি— ঈশ্বরী! তখন সে সেই অনুভবের নান্দনিকতাকে মেরে আমার স্পর্শে সন্তানের জন্ম হোক চাইল। ধনী, গরীব কোনো দেশেই মেয়েরা ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, প্রাণের চাইতে দেহের আকাঙ্খার মূল্যও কম নয়। আমি ছবির বিজ্ঞাপনচিত্র, ডকুমেন্টারি... এ সবের মধ্যেই বলতে গেলে জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছি, যা বলছিলাম, সেই বেস্টনরত নগ্ন রমনীদের দেখে আসার অনুভব তরঙ্গ, সব মরে গেল, আমি ওর মধ্যে এই দরিদ্র দেশের দেহপসারনীকে দেখে মায়া অনুভব করলাম! এক এক— ঘেয়েবোধ থেকে সেখান থেকে বেরিয়ে আমার নিজের বঞ্চনার জন্য মায়া হলো। যে নগ্নতার মধ্যে, আমি ঈশ্বরীকে খুঁজছিলাম তার মধ্যে ছিল গভীর প্রেম, আমি এই পৃথিবী ঘুরেও কাউকে কেন্দ্র করে নিজের মধ্যে সেই তরঙ্গের বিদ্যুৎ অনুভব করি নি।... চম্পা মেয়েটা চালাক। দু'কাপ চা আর নাশতা নিয়ে এসেছে।

নিকুন্তিলার ভারী দেহে যেন কেউ একের পাথর স্তম্ভ বসাচ্ছে... সে কোনো শব্দ করতে পারছে না... মন্ত্রমুগ্ধ মোহে চেয়ে আছে মানুষটার মুখের দিকে।

আমার জীবনে একাধিক নারী এসেছে, তোমাকে বলতে দ্বিধা নেই, তারপরও তোমার মা'র ওই অপূর্ব সুন্দর জেদ আমি এই জীবনে কারও মধ্যে দেখি নি।

নিকুন্তিলা ডুকরে কেঁদে ওঠে।

চায়ের ধোঁয়া নিষ্ফল উড়তে থাকে।

জুবায়ের এক জীবনের তৃষ্ণা নিয়ে নিকুন্তিলাকে দেখছে— আমি যেমনটি কন্যা চেয়েছিলাম, তুমি তেমনই হয়েছ। এরপর ব্যাগ খুলে একটা বাসি রুমাল বের করে বলে— এর মধ্য দিয়ে আমি আমার সারা জীবনের যন্ত্রণার জল মুছেছি। তুমি এটা তোমার কাছে রেখে দাও। তোমাকে দেয়ার মতো আমার আর কিছু নেই। ঘণ্টা তিনেক পরেই আমার

ফ্লাইট... জুবায়ের উঠে এসে নিকুন্তিলার মুখটাকে দ্বিধাহীন আকুল তৃষ্ণায় নিজের বুকে চেপে ধরে, এরপর সস্নেহ হাতটা ওর মাথায় রেখে বলে— তোমার সন্তান হবে, এই খবর পেয়ে তোমাকে দেখার তৃষ্ণাটা কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারলাম না। একজন দার্শনিক, ধরা যাক, পৃথিবীর বহু তথ্য তার নখ দর্পণে, সে হয়তো বছরের পর পর বছর বিশ্লেষণ করছে, মানুষ কী ? তার আত্মা কী ? নারী কী ? তার গতি প্রকৃতি কোন পরিস্থিতিতে কী রূপ নেয় ? সেই দার্শনিকই হয়তো তার স্ত্রীর সামনে কোনো কোনো মুহূর্তের আচরণে চরম মূর্খে পরিণত হতে পারে। পরবর্তী সময়ে সে হয়তো সেইসব মুহূর্তের কথা স্মরণ করে বড় কিছু আবিষ্কার করতে পারবে। কিন্তু সে তত্ত্ব দিয়ে সে তার প্রতিদিনের জীবনকে শিল্পিত সৌন্দর্য করতে পারে না। নিকু, দাম্পত্য জীবনে কখনো তোমার মা, কখনো আমি সেই সংসারমুর্খ দার্শনিক। আমি এইসব চক্রের ফের থেকে পালিয়েছি, তোমার মা-ও পালিয়েছে। জেদ যে করে, যার ওপর করে, তার চাইতে শতগুণ কষ্ট হয় নিজের, তোমার মা'কে দেখো, নিজের সাথে জেদ করে তোমার বাবার সাথে সারা জীবনটা কেমন সুখে কাটিয়ে দিল।

নিকুন্তিলার মগ্ন চৈতন্যে রক্তাক্ত দাগ ফেলে ছায়া শীতের অন্ধকারে এক সময় হারিয়ে যায় এক জীবনের রহস্যময় মানুষটা।

নিকুন্তিলা তার সর্ব অস্তিত্ব দিয়ে চাইছিল— মেয়ে হোক! রেজওয়ান উদ্বিগ্ন— তোমার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, ছেলে হলে গলা টিপে মারবে। দুটোর জন্যই তোমার মানসিক প্রিপারেশন রাখা দরকার। এখন বুঝি— নিকুন্তিলা বলে, আমাকে জন্ম দিতে মা'র কত কষ্ট হয়েছে। হয়তো সেই জায়গাতেই আমার আহত হওয়ার কষ্ট বেশি... রেজওয়ান! আমার ইনটিউশন খুব মারাত্মক... আমার মেয়েই হবে। ছেলে যদি চাও— দ্বিতীয় বার চেষ্টা করা যাবে... রেজওয়ান... রেজো... আমার হাতটা একটু শক্ত করে ধরো! ছেলেতেও আমার আপত্তি থাকত না, কিন্তু আমি আমার মেয়ের নাম ঠিক করে রেখেছি।

কোকিলের ডাকের শব্দ ঢেকে যায় এক নবজাতকের চিৎকারে। শাদা ছাদ... এক গভীর মৃত্যুময় যন্ত্রণা থেকে চোখ মেলে নিকুন্তিলা নিজের নিঃসাড় চোখকে স্পন্দিত হতে দেখে। মা নিকুন্তিলার যন্ত্রণা চোখে সইতে পারছিল না বলে কোথায় যে লুকিয়ে আছে! তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। উচ্ছ্বসিত রেজওয়ান নিকুন্তিলার কোলের পাশে টাওয়ালে পেঁচানো নগ্ন শিশুটাকে শুইয়ে দেয়। প্রচণ্ড উত্তেজিত বাবা গেছে মা'র খোঁজে। মফস্বল থেকে শ্বশুর-শাশুড়ি ননদ দেবররা এসেছে। ক'দিন যাবত বাসায় আন্তরিক ভিড়। বসন্তের হিমেল

বাতাসে কী অপূর্ব সোঁদা গন্ধ!

মানুষের ভিড় ঠেলে মা শিশুটির কাছে এসে স্তম্ভিত! ওর পরনে সেই শাদা ঝালর দেয়া ফুলেল ফ্রকটি আর নিকুম্ভিলার ঠোঁটে ঝুলছে সেই ছেলেবেলার মতো দুষ্টু হাসি।

কাঁপতে কাঁপতে মা ছায়াআঁধার ঠেলে ওকে নতুন তৃষ্ণায় দেখে ফিসফিস কান্নায় চোখ ভেজায়— সোমেশ্বরী... সোমেশ্বরী! এরপর যেন মরে যাওয়া কোনো প্রাণেশ্বরকে জীবিত ফিরে পেয়েছে— এই বোধ নিয়ে মা শত বছর বাক্সে আটকে থাকা ফ্রকটার ঘ্রাণ শোঁকে... ওর প্রতিটি ঝালর স্পর্শ করে সদ্যচোখ ফিরে পাওয়া মানুষের মতো, মা ক্রন্দনরত শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরে। কালি বসে যাওয়া চোখেও যে এত অপূর্ব আনন্দের আলোঢেউ খেলতে পারে, নিকুম্ভিলা মা'র এই চোখ জীবনেও দেখে নি।